কীর্ত্তি-মন্দির

বা

রাজপুত-বীর-কীর্ত্তি।

(মহাত্মা টডের রাজস্থান অবলম্বন করিয়া)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ

কর্ত্তৃক রচিত।

২৩ নং কালিদাস সিংহের গলি হইতে

শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—*০০০*—

কলিকাতা

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্যযন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

মুখবন্ধ।

বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার বীরত্বকাহিনী কখন পুরাতন হয় না। রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় রাজপুতানার ইতিহাস যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই মন অমৃতরসে আপ্লুত হয়। আত্মবিসর্জ্জনের অনন্ত-জ্বলন্ত-দৃষ্টান্তে অতি কাপুরুষেরও মনে স্বদেশের ও স্বজাতির জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে অভিরুচি হয়। স্পার্টান্-রমণী প্রাণপুত্তলীকে রণস্থলে পাঠাইবার সময় তাহার হস্তে ঢাল দিয়া বলিতেন যে—'বৎস! রণে জয়ী হইয়া এই ঢাল লইয়া বিজয়োৎসাহে আমার নিকট ফিরিয়া আসিও, অথবা রণে হত হইয়া এই ঢাল-শয্যায় শায়িত হইয়া বরং জননীর নিকট আনীত হইও; কিন্তু কিছুতেই যেন রণে পরাজিত বা বিমুখ হইয়া আমার নিকট আসিওনা'। বীরা তেজস্বিনী স্পার্টান্ রমণীর এই বাক্যে, তাঁহারা আজও জগতে পূজিতা হইয়া আছেন। কিন্তু রাজপুতনারী পুত্রকে বা স্বামীকে রণস্থলে পাঠাইয়া নিজে বিলাস-ভবনে অবস্থিতি করিতেন না; স্বয়ং সমর-সাজে সাজিয়া অসি-হস্তে রণাঙ্গনে স্বামী বা পুত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে স্বদেশরক্ষাযজ্ঞে প্রাণাহুতি দিতেন। আর যখন স্বদেশ রক্ষা অসম্ভব মনে করিতেন, তখন সেই বিদ্যুল্লতিকাসকল সতীত্ব রক্ষার জন্য পরস্পর শৃঙ্খলিত-করে দলে দলে অকাতরে জহরানলে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতেন। সুতরাং ইঁহারা স্পার্টান্রমণীগণ-অপেক্ষায় শতগুণে অধিক পূজ্যা।

রাজপুতরমণীগণের ন্যায় রাজপুতবীরগণও বীরত্বে ও আত্মোৎসর্গে জগতে অতুলনীয়। এক লিয়োনিডাসের বীরত্বকাহিনীতে গ্রীশ প্রতি-ধ্বনিত! কিন্তু রাজপুতানায় কত শত লিয়োনিডাস্ অতি-মানুষ বীরত্ব-প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বদেশ-রক্ষা-ব্রতে জীবন আহুতি দিয়াছেন! মহাত্মা টড্ সত্যই বলিয়াছেন যে রাজপুতানার প্রতি গিরি-সঙ্কটই লিয়োনিডা-

শের বীরত্ব-বিলসন-ভূমি থার্ম্মোপিলি-সদৃশ। প্রত্যুতঃ এত অদ্ভুত বীরত্বের কার্য্য আর কোন দেশেই এরূপ ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না, এবং এত বীরপুরুষ ও এত বীরনারী কোন দেশেই এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

বাপ্পারাউল্ হইতে অমরসিংহ পর্য্যন্ত মিবারের স্বাধীন রাণাগণের জীবনী মাত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সময়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করা যদিও মাদৃশ মূঢ় জনের পক্ষে অসম্ভব, তথাপি সেই রাণাগণের ও তাঁহাদের অধীন সামন্তবর্গের গুণরাশি আমার কর্ণে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হওয়ায়, আমি এই চপলতায় প্রবৃত্ত হইয়াছি *। অথবা যেমন বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির অভ্যন্তরে অতি কোমল সূত্রেরও গতি সহজসাধ্য † সেইরূপ মহাত্মা টড্ কর্ত্তৃক প্রণীত সুবিখ্যাত রাজস্থানের ইতিহাস নামক অমূল্য গ্রন্থের সাহায্যে মাদৃশ ক্ষুদ্র জনেরও এরূপ মহিমান্বিত রাজবংশের অতুল কীর্ত্তিকলাপের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা সম্ভবপর হইতে পারে। সে মহিমা তাঁহার—আমার নহে।

টডের গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া এই ইতিহাসগ্রন্থ লিখিয়াছি বটে, কিন্তু অনুবাদকের ন্যায় তাঁহার নিরন্তর অনুবর্ত্তন করি নাই। প্রকৃত ঘটনা অবিকল রাখিয়া আমি নানা স্থানে ইচ্ছামত উচ্ছ্বাসরাজ্যে বিচরণ করিয়াছি। ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতে আমার প্রাণে যে ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে ত্রুটি করি নাই। রাজপুতানা অনন্ত-কীর্ত্তিময়ী। ইহার সেই অনন্ত কীর্ত্তির অধিকাংশই আবার রত্নভূমি মিবারেই অনুষ্ঠিত হয়। মিবারের সেই আবর্ত্তময়ী ঘটনারাশির আলোচনায় যাহার হৃদয়ে উদ্বেল তরঙ্গমালা উত্থিত না হয়, সে জন পাষাণ—নর নামের অযোগ্য।

এক রাণা প্রতাপের জীবনী পাঠ করিলেই জীবন সার্থক বলিয়া

* তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ॥' রঘুবংশম্।

† 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥' রঘুবংশম্।

বোধ হয়। সে জীবনের মহিমা বর্ণন করা সামান্য লেখকের কার্য্য নহে। কিন্তু এরূপ ঘটনাপূর্ণ জীবনী—এরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের অপূর্ব্ব কাহিনী—সামান্য লেখকের হস্তেও নিজ মাহাত্ম্যে অদ্ভুত আভিনয়িক ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। সে গৌরব সে চরিত্রের, লেখকের নহে।

বাপ্পারাউল্ হইতে রাণা অমরসিংহ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যবর্ত্তী মিবার-ইতিহাস হিন্দু-যবন-সংঘর্ষে পরিপূরিত। এই কালের মধ্যে যবনেরা অবিরাম ভারত আক্রমণ করিয়া পদে পদে প্রতিহত হইয়া অবশেষে ভারতে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হন। যে যে হিন্দুজাতি সেই অজস্র-বাহিনী যবন-স্রোতস্বিনীর গতি-রোধ-ব্রতে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মিবারের রাজপুতগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া মিবারের রাণাগণ অধীন সামন্তবর্গ সহ এই প্রবল স্রোতস্বিনীর গতি রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অতিমানুষ বীরত্বে ও অদ্ভুত রণ-কৌশলে বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা এই স্রোতস্বিনীর গতি মিবারের বহির্ভাগে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাপুরুষ রাণা উদয় সিংহ চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় না থাকিলে, বোধহয় চিতোর—রাজপুতকীর্ত্তিস্থলী রাজরাজেশ্বরী চিতোরনগরী—কখনই যবন-হস্তে পতিতা হইত না। বীর-সন্ন্যাসী প্রতাপ পিতৃ-কলঙ্ক ক্ষালণের জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত ও রণচতুর আক্‌বরের বুদ্ধি-কৌশলে ও বাহুবলে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। বীরবর প্রতাপতনয় অমরসিংহও হ্যানিবলের ন্যায় পিতা কর্ত্তৃক এই ব্রতে দীক্ষিত হইয়া মিবারের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও চিতোরের পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন নাই। অমরসিংহের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে মিবারের স্বাধীনতাসূর্য্যও অস্তমিত হইল! সেই স্বাধীনতাসূর্য্য ভারতগগণে আর কখন উদিত হইবে কি না—ভারতের অনন্ততিমিরময়ী নিশার কখন অবসান হইবে কি না—এ গভীর প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ দিতে পারেন না।

সেই স্বাধীনতা-সমরে—সেই ভীষণ-হিন্দু-যবন-সংঘর্ষে—যে কত

হিন্দু বীর বলি পড়িয়াছিলেন, ও কত হিন্দুদেবমন্দির ভূমিসাৎ হইয়াছিল—তাহার গণনা করে কাহার সাধ্য? আর কত আর্য্যললনা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্বরত্নের রক্ষার জন্য যে জহরানলে বা অসিহস্তে সমরাঙ্গণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে গেলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়?

তাই রাজপুতানার ইতিহাস লিখিতে গেলে স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির প্রাণে বড় ব্যাথা লাগে। হিন্দু-যবনের বহুদিন একত্র অবস্থিত নিবন্ধন, হিন্দুগাত্রের যে সকল ক্ষত শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, রাজপুতানার ইতিহাস পাঠ করিতে বা লিখিতে গেলে, সেই সকল ক্ষত আবার নবীভূত হইতে থাকে। যবনগণের অতীত অত্যাচার-কাহিনী পাঠ করিলে ক্রোধে ও ক্ষোভে সর্ব্ব শরীর অগ্নিময় হইয়া উঠে। কিন্তু ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য এ প্রজ্জ্বলিত অনল আবার তথনই নির্ব্বাপিত করিতে হয়। যেহেতু এ অনল আবার জ্বলিলে ভারত পুনরায় ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। এই জন্য রাজপুতানার ইতিহাস লিখিতে বা পড়িতে যমযন্ত্রণা উপস্থিত হয়! এই জন্যই আমি এতদিন বৈদেশিক মহাত্মাগণের জীবনী ও বৈদেশিক বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনা করিয়াই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ মিটাইতাম!

কিন্তু স্বদেশের বীরত্বকাহিনী ও স্বদেশের ইতিহাস বর্ণনা না করিলেও জীবন সার্থক বলিয়া মনে হয় না। যেন গুরুতর কর্ত্তব্যের ক্রুটী হইল বলিয়া মনে হয়। প্রাণের পিপাসা কেবল পরের কথায় মিটে না। তাই আমি আজ অক্ষয়কীর্ত্তি রাজপুতগণের বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনা করিতে বসিয়াছি। হৃদয়ের চিরলালিত ভাব-তরঙ্গের সহিত সমঞ্জসীভূত হওয়ায়, এই বিষয়টী আমার নিকট অতি মধুর লাগিয়াছে। এক্ষণে বিষয়ের মাহাত্ম্যে যদি আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট মধুর লাগে, তাহা হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—যদি ভাবোচ্ছ্বাসের বেগে অতীত যবনগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি কোন রূঢ় বচন বলিয়া থাকি, আশা করি বর্ত্তমান উদারমতি যবনভ্রাতৃগণ ঐতিহাসিকের সে অধিকার

ক্ষমাযোগ্য বলিয়া মনে করিবেন। কারণ যদিও তাঁহাদিগের সহিত আমাদের এক্ষণে পূর্ণ ভ্রাতৃ-ভাব, তথাপি সত্যের অনুরোধে ঐতিহাসিককে বলিতে হইবে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক সবিশেষ নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। সে পুরাতন কাহিনী তুলিয়া বর্ত্তমান যবন ভ্রাতৃগণকে তিরস্কার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কেবল বর্ত্তমান সময়ে অতীত কালের ঘটনাবলী হইতে উপদেশ গ্রহণ করাই আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দু-যবন-বিদ্বেষে ভারতের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এবং ইহা চিরস্থায়ী হইলে এই দুর্দ্দশা অনন্তকালস্থায়ী হইবে, ইহা প্রতিপন্ন করাই—এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। যদি কখন এ বিদ্বেষ অপনীত হইয়া ভারতে হিন্দু-যবন-সমন্বয় হয়, তাহা হইলেই ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য ভারতগগণে পুনরুদিত হইবে—নতুবা নহে! তাহা হইবে কি না, ভবিষ্য ইতিহাস ইহার উত্তর দিবে।

যবন-রাহু-গ্রস্ত, শ্রীভ্রষ্ট পতিত মিবারের কাহিনী লিখিতে লেখনী সরিল না বলিয়া অগত্যা আমাকে এবারকার মত অমরসিংহের জীবনী পর্য্যন্ত লিখিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে হইল। অলমতি-বিস্তরেণ।

শকাব্দা ১৮১১।
তারিখ ২৮শে আশ্বিন। } গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞাপন।

আমার বিদেশে অবস্থিতি-নিবন্ধন এই কীর্ত্তি-মন্দিরের মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য অপরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। সুতরাং স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কণের ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। পাঠকগণ নিজগুণে গ্রন্থকারের এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। যদি কাহারও চক্ষে কোন ভুল পড়ে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমায় লিখেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ বাধিত হইব। কীর্ত্তি-মন্দির রাজস্থানের ইতিহাসের সারসংগ্রহ ও প্রাণভূত। ইহাকে উপাদেয় করিতে আমি যত্নের ত্রুটী করি নাই। এক্ষণে ইহা সুধীগণের নিকট আদৃত হইলেই, পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

পাবনা।
২৮এ আশ্বিন।

নিবেদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

কীর্ত্তি-মন্দির।

বাপ্‌পারাউল্‌ ও তদ্বংশ।

৭৮৪ সম্বতে বা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে এই মহাপুরুষ চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে মোরিবংশীয় রাজগণ চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছিলেন। বাপ্পারাউল শেষ মোরিবংশীয় রাজার ভাগিনেয়। মোরিবংশীয় রাজা সামন্তবর্গের জায়গীর কাড়িয়া লওয়ায়, তাঁহারা সমবেত হইয়া মোরিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই শূন্য সিংহাসনে বাপ্পারাউলকে সমাবেশিত করেন। ইনিই মিবারের সিসোদিয়া বংশীয় রাজবৃন্দের আদিপুরুষ। বাপ্পারাউল ঘেলোট্‌বংশীয়। আমরা এই স্থলে সংক্ষেপে এই বংশের কাহিনী বর্ণন করিব। এই বংশ সূর্য্য-বংশ হইতে উৎপন্ন। রামপুত্র লব হইতে এই বংশের আবির্ভাব। লব লবকোট বা লাহোর নগরী প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তদীয় বংশধরগণ বহুদিন ধরিয়া তথায় রাজত্ব করেন। লব-বংশের যে শাখা হইতে মিবারের রাণাগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই শাখার অন্যতম রাজা কণকসেন তথা হইতে আসিয়া দ্বারকায় রাজ্য স্থাপন করেন। তৎকালে এই বংশ সেন বংশ নামে কথিত হয়। তাহার পর স্থান-পরিবর্ত্তনে বা অন্যান্য কারণে এই বংশ আদিত্যবংশ আখ্যা ধারণ করে। তাহার পর ইহা ঘেলোট্‌বংশ নামে আখ্যাত হইতে আরম্ভ হয়। ঘেলোট্‌বংশ প্রথমে অহর্য্যবংশ এবং পরে সিসোদিয়াবংশ আখ্যা ধারণ করে। বাপ্পারাউল

হইতে আরম্ভ করিয়া মিবারের রাণাগণ সকলে সিসোদিয়া বংশ হইতে সমুৎপন্ন।

কনকসেন লব-কোট বা লাহোর হইতে সৌরাষ্ট্র-প্রদেশে আসিয়া তথায় ১৪৪ খ্রীষ্ট শকে বীর-নগর নামে একটী নগরী সংস্থাপন করেন। তিনি প্রমরা-বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজ্য সৌরাষ্ট্র প্রদেশ নিজ করায়ত্ত করেন। চারি পুরুষ গত হইলে তদীয় বংশে বিজয় সেন বা নশীর্ব্বাণ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি আবির্ভূত হন। ইনি বিজয়পুর, বিদর্ভ ও বল্লভীপুর নামে তিনটী নগরী সংস্থাপিত করিয়া তন্মধ্যে বল্লভীপুরকেই নিজ রাজধানীতে পরিণত করেন। বল্লভীপুর বর্ত্তমান ভাওনগর বা ভগবান্ নগরের দশ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ইহা এখনও অতি দুরাবস্থাতেও প্রাচীন মাহাত্ম্যের কোন কোন চিহ্ন ধারণ করিতেছে। লোকে ইহাকে এখন শুদ্ধ বল্লভী বলিয়া জানে। 'শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য' নামক এক খানি জৈনগ্রন্থে এই নগরীর সমৃদ্ধি সবিশেষ কীর্ত্তিত আছে। বল্লভীর প্রাচীর-মালার ভগ্নাবশেষ এখনও ইহার অতীত মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতেছে। অন্যান্য জৈন গ্রন্থে ও 'রাণা রাজ-সিংহের রাজত্ব-বর্ণন' নামক ইতিহাসে বল্লভীপুরের উল্লেখ আছে। জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে ২০৫ বিক্রম শকে বা ৫২৪ খ্রীষ্ট শকে এই মহানগরী অসভ্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ও গৃহীত হয়। সেই সময় ইহার অধিবাসি-বৃন্দের অনেকেই নিহত হন, এবং হতাবশিষ্ট অধিবাসিগণ তথা হইতে পলাইয়া মরুদেশে গিয়া বল্লী, সন্দেবী, ও নাদোল—এই তিনটী নগরী সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। পুরাতত্ত্বে প্রথিত আছে ঐ সকল আক্রমণকারিগণ সিথিক বংশ হইতে সমুৎপন্ন; এবং পার্থিয়া-রাজ্য হইতে সমাগত। ইহারা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথমে সিন্ধু প্রদেশে আসিয়া যদুবংশীয় রাজগণ হইতে বলে শমিনগর অধিকার

করে, এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে আসিয়া বল্লভীপুর অবরুদ্ধ ও অধিকৃত করে। ঐ পথ দিয়া এসিয়ার উদীচ্য পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে অসংখ্য আর্য্য ও অনার্য্য জাতি আসিয়া ক্রমশঃ ভারত উপদ্বীপকে অধিবাসিত করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মানবস্রোতস্বিনী উত্তর হইতে প্রথমে দক্ষিণাভিমুখিনী ও পরে পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়া পঞ্চনদ, সৈন্ধব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশকে ক্রমশঃ প্লাবিত করে। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তে বিদ্যমান আছে। এই সকল জাতির মধ্যে জিৎ বা জেতী, শূন, কমরী, কটী, মক্ষহন, বল্ল, ও অশ্বরী প্রধান। কাহার কাহারও মতে বল্লভী নগরীর আক্রমণকারিগণ সিথিক বংশোদ্ভব নহেন, শূন-বংশোদ্ভব। তাঁহারা বলেন যে নামকারণ্যে বল্লভীপুর সম্ভবতঃ বল্লজাতীয় রাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত। বল্লজাতি সিথিকবংশের একটী শাখা। সুতরাং সিথিক্ জাতীয় আক্রমণকারী স্বজাতি-প্রতিষ্ঠাপিত নগরীর অধিবাসিবৃন্দের হনন-কার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে কখনই কলঙ্কিত করিতেন না।

সিথিক্ বংশোদ্ভবগণ সূর্য্য ও অগ্নির উপাসক ছিলেন, এবং বল্লভীপুরের রাজবৃন্দও সূর্য্য ও অগ্নির উপাসক ছিলেন। ইহা হইতেও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন বল্লভীপুরের রাজবৃন্দও সিথিক-বংশীয় বল্লজাতি হইতে সমুৎপন্ন। বল্লভীপুর এক সময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ যদিও বল্লভীপুর সৌরাষ্ট্র প্রদেশের রাজধানী ছিল, তথাপি ষ্ট্রাবো প্রভৃতি প্রতীচ্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যখন ভারতকে সৌর বা সূর্য্যের উপাসকগণের দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষে বল্লভীপুরের রাজবৃন্দের আধিপত্য থাকা সম্ভব। শিলাদিত্যের যেরূপ প্রতাপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

আদিত্য-বংশের প্রসিদ্ধ রাজা শিলাদিত্য। প্রবাদ আছে, যে তদীয় রাজধানী বল্লভীপুর-নাম্নী নগরীতে সূর্য্যকুণ্ড নামে একটী প্রস্রবণ ছিল। শিলাদিত্যের আদেশে সেই সূর্য্যকুণ্ড হইতে এক খানি সপ্তাশ্ব রথ সমুদিত হইত। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে সূর্য্যদেব সপ্তহয়বাহিত রথে আরোহণ করিয়া ধরামণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। সুতরাং লোকে তাঁহাকে সূর্য্যের অবতার বা তদ্বংশভূত বলিয়া মনে করিত। প্রবাদ আছে যে এই সপ্তাশ্বরথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিত না। কিন্তু ভারত চিরদিনই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা বিক্রীত হইয়া আসিতেছে। শিলাদিত্যের মন্ত্রী—শত্রুর নিকট সূর্য্যকুণ্ড কলুষিত করিবার উপায় প্রকাশ করিয়া দিলেন। তদনুসারে শত্রুগণ গোরক্তে সেই পবিত্র প্রস্রবণকে দূষিত করিল। আর শিলাদিত্যের আদেশে সে কুণ্ড হইতে সপ্তাশ্ব রথ সমুদিত হইল না। শিলাদিত্য বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে প্রার্থনা আর গ্রাহ্য হইল না। কোন্ জাতি এ গোহত্যাপাতকে লিপ্ত হইল তাহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। সে যে জাতিই হউক না কেন—ইহা স্থির যে সেই জাতি দ্বারাই বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইল।

এই যুদ্ধে শিলাদিত্য নিহত হইলে তদীয় পত্নীগণ তাঁহার সহিত সহমৃতা হইলেন। কেবল রাজমহিষী পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া চিতারোহণ করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ বল্লভীপুরের পতনের সময় তিনি পিতৃ-গৃহে ছিলেন। তিনি প্রমর-বংশীয় চন্দ্রাবতীশ্বরের দুহিতা। চন্দ্রাবতী-নগরে অম্বভবানী নামে এক জাগ্রত দেবতা ছিলেন। নিজ গর্ভে যাহাতে রাজা জন্মগ্রহণ করেন; এই উদ্দেশে অম্বভবানীর মন্দিরে ধন্যা দিবার জন্য তিনি তথায় গমন করেন। কিন্তু বল্লভীপুরের অবরোধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি দ্রুতপদে

স্বামিসকাশে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি বজ্রাহতার ন্যায় পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হই-লেন। অম্বভবানী—তাঁহার গর্ভজাত কুমার রাজা হইবে বলিয়া তাঁহাকে যে বর দিয়াছিলেন—এবং সেই বর পাইয়া তিনি মনে যে আশালতা পোষিত করিতেছিলেন—সে আশা-লতা এত দিনে সমূলে উৎপাটিত হইল। শোকে অভিভূতা হইয়া রাজমহিষী মল্লিয়া-গিরি-গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পাছে শত্রুগণ সন্ধান পাইয়া তদীয় পুত্রের প্রাণ সংহার করে, এই ভয়ে মহিষী পুষ্পবতী বীর নগরের কমলাবতী-নাম্নী কোন ব্রাহ্মণ-পত্নীর হস্তে ইহার লালন পালন ও শিক্ষার ভার দিয়া পতির উদ্দেশে অনলে আত্ম-আহুতি প্রদান করিলেন। ধন্যা পুষ্প-বতী! ধন্য তোমার স্বামি-ভক্তি! তুমি নবপ্রসূত কুমারের স্নেহ ভুলিয়াও অপার্থিব সুখের আশায় পার্থিব সুখে জলা-ঞ্জলি দিলে! পুত্র-স্নেহ পতি-ভক্তির নিকট পরাজিত হইল! পুষ্পবতী! তোমার ন্যায় সতী যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, সে দেশ পূত হইয়া যায়।

কমলাবতী বীর নগরীর কোন দেবালয়ের সেবিকা ছিলেন, এবং স্বয়ং পুত্রবতী ছিলেন। তথাপি তিনি এই রাজকুমারকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। "গুহাজাত" বলিয়া তিনি রাজকুমারের নাম "গোহা" রাখিলেন। শিশু গোহা পালিয়ত্রী ও তদ্বন্ধুবর্গের অনন্ত চিন্তা ও অসুখের উৎস-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। তিনি রাজপুত-পুত্রগণের সহিত পাখী মারিয়া ও বন্য জন্তু সকল শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগি-লেন। যখন ইহার বয়স একাদশ বৎসর মাত্র, তখনই গোহা সম্পূর্ণরূপে শাসনাতীত হইয়া উঠিলেন। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ কয় দিন ভস্মাচ্ছাদিত থাকে? সূর্য্য-রশ্মিকে কেহ কখন কি বালু-পুঞ্জে আবৃত করিতে পারে?

এই সময় ঈদর-নগরে মাণ্ডলিক নামে এক ভিল্-জাতীয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। বালক গোহা ভিল্ বালক-গণের সমভিব্যাহারে সেই আরণ্য প্রদেশে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। শান্তিময় ব্রাহ্মণকুমারগণ অপেক্ষা নির্ভীক ও অদীনসাহস ভিল্পুত্রগণের সহিত তাঁহার অধিকতর প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য ছিল। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনীভূত সখ্যভাব সংস্থাপিত হইল। তিনি সেই আরণ্যবালক-গণের ক্রমে অতি আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিলেন। তাহারা তাঁহাকে সেই আরণ্য প্রদেশের রাজ-স্বরূপ করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন সেই আরণ্য বালক-গণ তাঁহার অভিষেকচ্ছলে নিজের অঙ্গুলি কাটিয়া সেই রক্তে তাঁহার ললাটে রাজ-টীকা পরাইয়া দিল। এই সংবাদ বৃদ্ধ ভিল্ রাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং মহাসন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে মহাসমারোহে ঈদরের সিংহাসনে আরোহিত করিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে গোহা এই উপকর্ত্তার প্রাণবধ করিয়া নিজ নাম কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক্ এই গোহাই গোহা-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই গোহাবংশই ক্রমে শাব্দিক বিবর্ত্তনে প্রথমে গোহিলোট্, পরে গেহিলোট্, এবং শেষে গেহ্লোট্ নাম ধারণ করিয়াছিল।

গোহা হইতে ক্রমে, অষ্টজন গেহ্লোট-বংশীয় নরপতি নির্ব্বিবাদে ঈদরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। কিন্তু ক্রমেই ভিলেরা বৈদেশিক শাসনে বীত-শ্রদ্ধ ও স্খলিত-ধৈর্য্য হইয়া উঠিল। অবশেষে অষ্টম গেহ্লোট নরপতি নাগাদিত্য বা নাগদিৎ তাহাদিগের এই বৈদেশিক-শাসন-বিদ্বেষের নিকট বলি পড়িলেন। একদিন তিনি মৃগয়া-উপলক্ষে একাকী অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময় কোন নিষ্ঠুর ভিল্ তাঁহার প্রাণবধ করিল। তাঁহার সঙ্গে

সঙ্গে ঈদরে গেহ্লোট-রাজবংশের রাজত্ব-কালের অবসান হইল।

বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বংশধরগণই ঈদরস্থ গেহ্লোট-বংশীয় রাজগণের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা গোহার প্রাণরক্ষা করিয়া যেমন গেহ্লোট-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সঙ্কটকালে নাগাদিৎতনয়, তিন বৎসরের শিশু বাপ্পারাওএর জীবন রক্ষা করিয়া এই গেহ্লোট-বংশ অক্ষত রাখিলেন। তাঁহারা শিশু বাপ্পারাওকে লইয়া বর্ত্তমান জারোলের পোনের মাইল দূরে অবস্থিত ভান্দীয়ার নামক দুর্গে পলায়ন করিলেন। তথায় এক জন যদু-বংশীয় বীর তাঁহাকে শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু তথায় তাঁহার জীবনের আশঙ্কা আছে মনে করিয়া অবশেষে তাঁহাকে পরাশরারণ্যে লইয়া যাওয়া হয়। সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যভাগে ত্রিকুট নামে একটী পর্ব্বত আছে। সেই ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদদেশে তৎকালে নগেন্দ্র-নামে একটী নগরী ছিল। সেই নগরীর অধিষ্ঠাতা-দেব নগেন্দ্রের নামে নগরীর নাম-করণ হইয়াছিল। এই নগরী কেবল ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা নাগীন্দ্র দেবের পূজা করিয়া সেই নগরীর উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। গিরিগুহা-পরিবেষ্টিত এই পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ বলদেবকুঞ্জে বা দেব-মন্দিরে বাপ্পারাওএর শৈশব কাল অতিবাহিত হয়।

এখনও এই গৈরিক-প্রদেশে অতি প্রাচীন দেবমন্দির-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি অতি গভীর তমসাচ্ছন্ন গুহা মধ্যে প্রবেশ কর বা অতি বন্ধুর গিরি-শিখরে আরোহণ কর, অথবা অতি নিবিড় অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে অবগাহন কর, সর্ব্বত্র লতামণ্ডপাবৃত নিভৃত নিকুঞ্জপ্রদেশ, সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি দেবালয়, এবং অত্যুদাত্ত প্রাসাদা-

বলী—আজও তোমার নয়ন ও মন হরণ করিবে; এবং ভক্তি ও বিস্ময়ে তোমার চিত্তকে অভিভূত করিবে। এই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণ অতি পুরাকাল হইতেই দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসক।

ফণিফণাভূষিতকণ্ঠ ধবলবৃষভসমাসীন হরমূর্ত্তি এই গৈরিক প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্র অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। গেহ্লোট্-বংশীয় রাজগণ অদ্যাপি এই একলিঙ্গের উপাসক। বাপ্পারাও হইতে মিবারের বর্ত্তমান রাণা পর্য্যন্ত সকলেই শৈব। অদ্যাপি মিবারের রাজধানী উদয়পুরে বৎসরে নয় দিন করিয়া এক-লিঙ্গের পূজা ও তদুপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে জৈন ও বৈষ্ণবেরাও শৈবগণের সহিত মহানন্দে যোগ দিয়া থাকেন। রাণাগণ এক-লিঙ্গকে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠাতা দেব, ও আপনাদিগকে তাঁহার দাওয়ান বা প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যে সকল গিরিপথ বাহিয়া উদয়পুরে প্রবেশ করিতে হয়, তাহার একটীতে এক-লিঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত। এরূপ প্রকাণ্ড মন্দির প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার সমস্তই শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। সেই সকল শ্বেত প্রস্তরের গাত্রে বিবিধ চিত্র ও অলঙ্কার খোদিত রহিয়াছে। এই গিরি-পথ দিয়া ধর্ম্মদ্বেষী যবনেরা অনেকবার আক্রমণ করায়, সেই প্রকাণ্ড মন্দিরের অনেক শোভা বিনষ্ট হইয়াছে। শিববাহক বৃষভের জন্য একটী স্বতন্ত্র মন্দির নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ মন্দিরে পিত্তলময় বৃষভ অদ্যাপি দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইহা অতি সুন্দর, সুগঠিত, ও অতি-মার্জ্জিত। যে যে স্থানে যবনেরা কুঠারাঘাত করিয়াছিল, সেই সেই স্থান ব্যতীত ইহার গাত্রে একটী দাগও পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার উদরাভ্যন্তরে গুপ্ত ধন নিহিত আছে মনে করিয়া, যবনেরা বৃষভের শূন্য-গর্ভ উদর ফুটাইয়া দেখিয়াছিল। মিবারের অন্যান্য স্থানেও

এক-লিঙ্গের মন্দিরের পার্শ্বেই তদীয় বাহন বৃষভের মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত আছে। যাত্রিগণ এক-লিঙ্গের ন্যায় সেই বৃষভ-গণেরও পূজা করিয়া থাকে।

যাঁহারা কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাদিগের বাল্য-জীবনের অলৌকিক কার্য্যকলাপের কাহিনী অতি-যত্নে পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। বাপ্পারাও সিসোদিয়াবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং মিবারের রাণাগণ অতি যত্নে তাঁহার বাল্যজীবনের ক্রিয়াকলাপের কাহিনী পরিরক্ষিত করিয়াছেন। বাপ্পারাও শৈশবে ও বাল্যে গোচারণ করিতেন। এক দিন তিনি মাঠে গোরু ছাড়িয়া দিয়া এক নিকুঞ্জমধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময় সোলাঙ্কি-বংশীয় নগদা-রাজ্যের অধীশ্বরের দুহিতা গ্রামবাসিনী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ ঝুলন্ ঝুলনী-নামক উৎসবের দিন। প্রচলিত পদ্ধতিমতে এই দিনে স্ত্রীপুরুষ একত্র ঝুলনে ঝুলিতে হয়। তাঁহারা ঝুলনোপযোগী রশ্মি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বাপ্পারাওকে তাঁহাদিগের জন্য রশ্মি আনিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অগ্রে তাঁহার একটা অনুরোধ রক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি প্রথমে একটী বিবাহ-ক্রীড়া করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজনন্দিনী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ তাহাতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সম্মত হইলেন। এই বৈবাহিক আভিনয়ে বাপ্পারাও নায়ক ও সোলাঙ্কি-রাজনন্দিনী নায়িকা, এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণ সখী সাজিলেন। সখীগণ নায়িকার অঞ্চলের সহিত নায়কের উত্তরীয়াগ্রে গ্রন্থি বদ্ধ করিয়া দিলেন এবং উভয়কে করে করে মিলিত করিয়া এক প্রবীণ বৃক্ষ-মূলে দাঁড় করাইলেন। তৎ-পরে সকলে মিলিয়া সপ্তবার সেই তরুবরকে প্রদক্ষিণ করি-লেন। এইরূপে এক প্রকার শাস্ত্রমতেই ইহাঁদিগের পরিণয়-

কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সখীগণ সপ্তপদী-গমন-পূর্ব্বক নায়ককে বরণ করায় তাঁহারাও বাপ্পারাওএর এক প্রকার ভার্য্যা হইলেন।

এই ক্রীড়া-পরিণয়ের জন্য তাঁহাকে নাগদা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। এই পলায়নই তাঁহার কীর্ত্তিমান্ হইবার পক্ষে প্রধান কারণ হইল। তিনি পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে রাজ-নন্দিনীর সহিত সেই অসংখ্য গ্রাম্যবালিকাগণের পতিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। এ পরিণয়ের সংবাদ অপ্রচারিত রহিল না। ইহার অনতিকাল পরেই কোন যোগ্য স্থান হইতে রাজনন্দিনীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব আসিল। এই উপলক্ষে কুল-পুরোহিত সোলাঙ্কিনীর করতল পরীক্ষা করিতে বসিলেন। রেখাপর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পুরোহিত বলিলেন যে রাজনন্দিনী পূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়াছেন। পুরোহিতের এই বাক্যে সকলে প্রথমে স্তব্ধ ও বিস্মিত হইলেন। সমস্ত রাজ-পরিবারের ভিতর ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। বাপ্পা যদিও গুপ্ত বিষয় অপ্রকাশ রাখিবার জন্য সবিশেষ দক্ষ ছিলেন, তথাপি যে ব্যাপারে ছয় শত গ্রাম্য বালিকা ও রাজ-কুমারী সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সে ব্যাপার অধিক দিন গোপন থাকা অসম্ভব।

বাপ্পা তাঁহার সম্মুখে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া একখানি উপল-খণ্ড হস্তে করিয়া সহচরবৃন্দকে বলিতেন—"শপথ গ্রহণ কর, যে কি ভাল কি মন্দ—সকল অবস্থাতেই তোমরা আমার বশীভূত থাকিবে ও আমার গুপ্ত কথা অপ্রকাশ রাখিবে। যদি তদন্যথা হয় তোমাদের পিতৃপুরুষগণের পুণ্য-পুঞ্জ এই উপলখণ্ডের ন্যায় এই ধোপার গর্ত্তে পতিত হইল।" এই বলিয়া তিনি সেই উপলখণ্ড সেই গর্ত্তে প্রক্ষিপ্ত করিতেন। তাঁহার সহচরবৃন্দ তাহার নিকট এইরূপ-

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত বলিয়া তাহারা কখন তাঁহার অবাধ্যতা করিত না, বা কখন তাঁহার গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিত না। এতদূর সতর্কতা স্বত্ত্বেও এ গুপ্ত বিষয় অপ্রকাশিত রহিল না। সোলাঙ্কিরাজ তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া তাঁহার অপরাধের সমুচিত শাস্তি-বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বাপ্পার গুপ্ত-চরগণ তাঁহাকে এই সংবাদ দেওয়ায় তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি দুইজন বিশ্বস্ত ভিল্ সহচর সমভিব্যাহারে সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশের এক অতি নিভৃত স্থানে গিয়া অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। যে দুইজন সহচর তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের একজনের নাম বালেয়ো। ইনি ঔন্দ্রী গিরিগুহাবাসী। অন্যের নাম দেবা। ইনি সোলাঙ্কি-বংশীয় এবং ওগুণাপানোরা রাজ্যের অধিবাসী। মোরি-বংশীয় রাজার নিকট হইতে রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তৎ সিংহাসনাধিরোহণ কালে এই বালেয়োই নিজের অঙ্গুলি চিরিয়া তাহার রক্ত দিয়া বাপ্পার ললাটে রাজ-টীকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য তদীয় বংশধরগণ আজও অভিষেক-কালে রাজললাটে রাজটীকা পরাইবার অধিকার ভোগ করিতেছেন। আজও বাপ্পার নামের সহিত তদীয় প্রাণরক্ষক সহচরদ্বয়ের নাম পুরুষ-পরম্পরাক্রমে একত্র গীত হইয়া আসিতেছে।

ওগুণাপানোরা ভারতবর্ষের সুইজর্লণ্ড। এই ক্ষুদ্র রাজ্য চিরদিন প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বহিশ্চর রাজ্যসমূহের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় ইহা কখন কোন রাজ্যের অধীন হয় নাই। এই আরণ্য রাজ্য সহস্র-সংখ্যক গ্রাম ও নগরে গঠিত। এই সহস্র গ্রাম ও নগর হইতে প্রয়োজন হইলে পঞ্চ-সহস্র ধনুর্দ্ধর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। ওগুণাপানোরার অধিপতিগণ সোলাঙ্কিরাজপুতবংশ হইতে সমুদ্ভূত। দেবার সময় হইতে ইহাঁরা সকলেই মিবারের

রাণাগণের সামন্তত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সকল বিষয়েই স্বাধীন। কেবল অভিষেক-সময়ে তাঁহাদিগকে আসিয়া উক্ত সামন্তকে অঙ্গুলি চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্তে রাণার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিতে হয়, এবং রাণার ললাটে রাজ টীকা দিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া রাজসিংহাসনে বসাইতে হয়। অপর দিকে ঔন্দ্রী ভিল্ সামন্তকে অভিষেক-পাত্র ধরিয়া থাকিতে হয়। এই প্রথা বাপ্পারাওর সময় হইতে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

মিবারের অভিষেক-কার্য্য ক্রমে এত ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, যে পরবর্ত্তী রাণাগণ অসাধ্য মনে করিয়া এই অভিষেকের অনেক গুলি অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জগৎ সিংহই শেষ রাণা—যাঁহার অভিষেক-কার্য্য প্রাচীন-পদ্ধতি-অনুসারে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। প্রথিত আছে যে এই অভিষেক-কার্য্যে কোটী বা তদধিক সংখ্যক রজত মুদ্রা ব্যয়িত হয়। ইহা মিবারের এক বৎসরের রাজস্ব।

আমরা এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করিব। বাপ্পার সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের অতি নিভৃত স্থানে গোপনে অবস্থিতি-কালীন একটী অলৌকিক ঘটনায় তাঁহার ভবিষ্য সম্পদ্ সূচিত হয়। বাপ্পা গোচারণ করিয়া প্রতিদিন প্রভুগৃহে প্রত্যাগত হইতেন। গৃহ-স্বামীর একটী সুন্দর দুগ্ধবতী গাভী প্রতি সায়ংকালে শূন্য-গর্ভ আপীন লইয়া গুহা-প্রদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইত। গৃহ-স্বামী মনে করিলেন যে বাপ্পাই প্রতিদিন উহার দুগ্ধ দোহন করিয়া পান করিয়া থাকেন।

এই সন্দেহ তিনি বাপ্পাকে জানাইলেন। বাপ্পা প্রথমে অকারণ দোষারোপে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, এ সন্দেহ অমূলক নহে। কারণ তিনি দেখিলেন সত্য সত্যই ঐ দুগ্ধবতী গাভী প্রতিদিন শূন্য পালানে গৃহে প্রত্যাগত হয়। সকলের চক্ষু যেমন তাঁহার উপর রহিল, তাঁহারও চক্ষু অতঃপর সেই গাভীর উপর রহিল। তিনি প্রতিদিন অনন্য মনে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি দেখিলেন ঐ অলৌকিক ধেনু গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া বেত্রকুঞ্জোপরি স্বতঃ আপীন নির্ঝারণ করিতেছে। বাপ্পা দেখিলেন সেই বেত্রকুঞ্জাভ্যন্তরে এক জন মহাপুরুষ ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বাপ্পা চীৎকার করিয়া সেই মহাপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ করিলেন, এবং স্তুতি মিনতি করিয়া জানিতে পারিলেন যে তিনি প্রজাপতি হারীত। এতদিন তিনি তথায় ধ্যান-মগ্ন ছিলেন, অথচ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

বাপ্পা তাঁহার নিকট যতদূর জানিতেন আত্ম-পরিচয় দিলেন। তিনি প্রজাপতির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, এবং তাঁহার আশীর্ব্বচন শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তিনি প্রতিদিন সেই প্রজাপতির নিকট গমন করিতেন। গিরি-নির্ঝরিণীর পবিত্র উদকে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার সেবার জন্য পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ দোহন করিয়া দিতেন। প্রজাপতিও তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের উপদেশ দিতেন, এবং অবশেষে স্বয়ং তাঁহার ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক-টীকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে শৈব ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বে দীক্ষিত করিলেন। অধিক কি তিনি তাঁহাকে ভগবান্ একলিঙ্গের প্রতিনিধি বা দাওয়ান-পদে অভিষিক্ত করিলেন। ইহার বংশধর বলিয়া মিবারের রাণাগণ একে একে সকলেই এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। একলিঙ্গের পূজায় ও

প্রজাপতির সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সিংহবাহিনী ভবানী স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দেন। দেবী স্বহস্তে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মার হস্ত-বিনির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব কঞ্চুক উপহার প্রদান করেন। এই কঞ্চুক অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অনুরূপ কঞ্চুক আজও পৃথিবীর আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই। ভবানী স্বহস্তে তদীয় দেহ এই স্বর্গীয় বর্ম্মে আবৃত করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র-শস্ত্রে বিভূষিত করিয়া দিলেন। দেবীদত্ত বর্শা, ধনু, তূণাধার ও তূণাবলীতে এবং ঢাল ও তরবারিতে তাঁহার বীরদেহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ভবানী এই স্বর্গীয় অভিষেকের বিনি-ময়ে ভক্তের নিকট হইতে বিশ্বাস ও ভক্তির প্রতিশ্রুতিরূপ উপঢৌকন লইয়া কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে প্রজাপতি হারীতও শিষ্যকে নিজ অদৃষ্টের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া স্বয়ংও হরগৌরীশিখরে গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বাপ্পাকে পর দিন প্রত্যূষে তদীয় বেতসকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইতে বলিলেন। কিন্তু বাপ্পা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়া দেখেন যে অপ্সরোবাহিত স্বর্গীয় রথে চড়িয়া হারীত শূন্যমার্গে উঠিয়াছেন। তিনি গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না ভাবিয়া দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে চীৎকার করিতে লাগিলেন। বাপ্পার কণ্ঠরব শুনিতে পাইয়া হারীত রথের গতি মন্দা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং অবতরণ না করিয়া শিষ্যের দেহ বিশ হাত দীর্ঘ করিয়া দিলেন। তথাপিও বাপ্পা গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তখন তিনি শিষ্যকে মুখ ব্যাদান করিতে বলিলেন। শিষ্য মুখ ব্যাদান করিলে তিনি তাহাতে থুৎ-কার প্রক্ষেপ করিলেন। বাপ্পা ঘৃণায় মুখ পশ্চাদ্দিকে অব-হেলিত করায়, ঐ থুৎকার-বিন্দু তাঁহার মুখের ভিতর না

পড়িয়া পদের উপর পড়িল। প্রজাপতি বলিলেন 'শিষ্যবর! থুৎকার তোমার উদরস্থ হইলে তুমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিতে। কিন্তু যখন তোমার চরণের উপর পড়িয়াছে, তখন তুমি অস্ত্র দ্বারা অবধ্য হইলে।' এই বলিয়াই তিনি রথের গতি ঊর্দ্ধমুখিনী করিতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই স্বর্গীয় রথ প্রজাপতিকে লইয়া লোক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া পড়িল।

এইরূপে দৈববলে বলীয়ান হইয়া, এবং তিনি যে চিতোরের মোরিবংশীয় রাজার ভাগিনেয়—জননীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া, বাপ্পা গোচারকের আলস্যময় জীবন পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কতিপয় বিশ্বস্ত সহচর সমভিব্যাহারে সেই আরণ্য প্রদেশের গুপ্ত স্থান হইতে বিনির্গত হইয়া জীবনের সর্ব্বপ্রথমে সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আরণ্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অনতিপূর্ব্বে ত্রিগড় পাহাড়ে মহর্ষি * গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া মহর্ষি গোরক্ষনাথ তাঁহাকে এক খানি দ্বি-ফলক খড়্গ উপহার প্রদান করেন। যে মন্ত্রে এই খড়্গ মন্ত্রপূত করিয়া প্রহার করিলে গিরি বিদারণ করা যায়, গোরক্ষনাথ তাঁহাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। ভবানী ও গোরক্ষনাথের অস্ত্রে ও প্রজাপতি হারীতের বরে বলীয়ান্ হইয়া বাপ্পা সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে চিতোরে নিজ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিবার জন্য সেই নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

* "গুরু গোরক্ষনাথের নামে এবং সেই মহাদেব একলিঙ্গের নামে এবং সর্পরাজ তক্ষকের নামে, এবং মহাদেবী ভবানীর নামে কাট" আজও মিবারের লোকে ভক্তিভাবে বৎসরে একদিন ঐ খড়্গ পূজা করিয়া থাকে, এবং প্রতিদিন উক্ত মন্ত্র জপ করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই চিতোর নগরীতে তৎকালে প্রমর-বংশীয় মালওয়াধিপতির সগোত্রীয় মোরি-রাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। চিতোর তৎকালে সমস্ত ভারতের রাজধানী ছিল কিনা তাহার স্থিরতা নাই। তবে ইহার তৎকালীন সুন্দর প্রাসাদাবলী, রমণীয় জলাধার-সকল এবং সুদৃঢ় ও সুগঠিত দুর্গ-সকল সাক্ষ্য দিতেছে যে ইহা সেই পুরাকালেও অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল।

মোরিরাজের ভাগিনেয় বলিয়া বাপ্পা চিতোরে সাদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহাকে রাজ্যের সামন্ত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তদুপযুক্ত একটি জমিদারী তাঁহাকে প্রদান করা হইল। মিবারে তৎকালে সামন্ত-তন্ত্র রাজ্য-প্রণালী প্রচলিত ছিল। মোরিরাজ অসংখ্য সামন্তবর্গে পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য সাহায্য প্রদান করার নিয়মে এক একটী জমিদারী বা জায়গীর ভোগ করিতেন। বাপ্পারাউলের প্রতি মোরিরাজের সবিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়া ইহাঁরা সকলেই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় এক বৈদেশিক শত্রু আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিল। মোরিরাজ তদীয় সামন্তবর্গকে যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রদান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সে আদেশ পালন করিলেন না, বরং তৎপ্রদত্ত জায়গীর সকলেই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যে নবাগত সামন্ত-যুবকের উপর তাঁহার যখন এতাদৃশ অনুগ্রহ, তখন তাঁহাকেই যুদ্ধে প্রেরণ করুন।

সামন্তবর্গের এই বিদ্রূপোক্তিতে বিরক্ত হইয়া মোরিরাজ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব জায়গীর হইতে বঞ্চিত করিলেন, এবং বাপ্পাকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। তখন সামন্তবর্গ লজ্জায় অধোবদন হইয়া বাপ্পার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। বাপ্পা শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মিবাররাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন।

কিন্তু বাপ্পা শত্রু দমন করিয়াও চিতোরে প্রত্যাগমন করিলেন না। তিনি সেই বিজয়োৎসাহিত সৈন্য লইয়া নিজ পিতৃপুরুষগণের রাজধানী গজনী নগরে গমন করিলেন। তথায় তৎকালে সেলিম-নামে এক জন যবন বাস করিতেছিলেন। তিনি তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই শূন্য সিংহাসনে চাবুরা জাতীয় এক ক্ষত্রিয়কে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে বাপ্পা এই সময়ে উক্ত সিংসাসনচ্যুত যবনরাজের দুহিতার পাণি গ্রহণ করেন। যাহা হউক বাপ্পা পিতৃরাজ্যে একজন ক্ষত্রিয়কে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেই অসন্তুষ্ট সামন্তবর্গ-সমভিব্যাহারে চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন। সামন্তবর্গ রাজার নিকট সম্মান না পাইয়া ক্রোধে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজ-গুরু ও রাজার ধাত্রী-পুত্র তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া অ নিবার জন্য দূত-স্বরূপ প্রেরিত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা ফিরিলেন না। বরং তাঁহাদিগের দ্বারা সামন্তবর্গ রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহারা রাজার লবণ খাইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিবেন। সামন্তবর্গ বাপ্পার উদার চরিত্রে ও সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা বাপ্পাকে চিতোরের সিংহাসনে বসাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার নিকট গুপ্তচর পাঠাইলেন। রাজ্য-লোভে বাপ্পা গেহ্লোট্-বংশ-সুলভ কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলেন। বাপ্পা সামন্ত-বর্গের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সামন্তবর্গ সসৈন্য আসিয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। এদিকে বাপ্পারাউল্ সেনাপতি ছিলেন বলিয়া, চিতোরের সৈন্যগণও সামন্তবর্গের সহিত যোগ দিল। সুতরাং

সহজেই চিতোরের সিংহাসন বাপ্পারাউলের হস্তগত হইল। চিতোরের প্রজাবর্গ এক বাক্যে বাপ্পার সিংহাধিরোহণে অনুমোদন করিল। বাপ্পার হৃদয়-মাহাত্ম্যে ও রাজোচিত গুণে সকলেই এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে কেহই মোরিরাজের সিংহাসনচ্যুতিতে দুঃখ প্রকাশ করিল না—রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এক বাক্যে তাঁহাকে হিন্দু-সূর্য্য (হিন্দুকা সূরজ্) রাজ-গুরু, এবং রাজচক্রবর্ত্তী—এই উপাধিত্রিতয়ে বিভূষিত করিল। বাপ্পারাউলকে প্রজারা সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয় করিত, পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, এবং দেবতার ন্যায় পূজা করিত। তাঁহাকে প্রজাবর্গ আজও দেবতা-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিবারে "চিরঞ্জীব" বলিলে বাপ্পা ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝায় না।

বাপ্পা সিসোদিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা, এবং শত রাজার আদিপুরুষ। এরূপ সৌভাগ্য পৃথিবীর আর কোন দেশের রাজার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই।

বাপ্পার অসংখ্য পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল এবং তাঁহারা নানা স্থানে পরিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন।

তাঁহাদিগের অধিকাংশই সৌরাষ্ট্র প্রদেশের সামন্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। আইন্ আক্‌বরীতে লিখিত আছে যে আক্‌বরের সময় সৌরাষ্ট্র প্রদেশে পঞ্চাশৎ সহস্র গেহ্লোট-বংশীয় ক্ষত্রিয় বাস করিতেছিলেন। ইহাঁরা সকলেই বাপ্পার পুত্র পৌত্রাদি হইতে সমুৎপন্ন।

"শতং বৈ জীবেৎ" শাস্ত্রে লিখিত আছে মানুষ শত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিবে। বাপ্পা এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষকালে তিনি বিজয়িনী সেনা লইয়া প্রতীচ্য দেশ অধিকার করিতে গিয়াছিলেন। সেকন্দর সাহা যেরূপ স্বরাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া প্রাচ্য রাজ্য সকলের জায়োদ্দেশে বিনির্গত হইয়া পারস্যে আসিয়া পারস্যরাজ

দারাউস্‌কে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রবাদ আছে যে বাপ্পারাউল্ সেই প্রাচীন বয়সে প্রতীচ্য দেশ সকল জয় করিতে করিতে খোরাসানেরও পশ্চিমে গিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং রাজ্যচ্যুত যবন-রাজগণের কন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সকল যবন কন্যাগণের গর্ভে ও বাপ্পার ঔরসে অসংখ্য সন্ততি জন্মিয়াছিল। বাপ্পা এই দিগ্বিজয় হইতে আর চিতোরে প্রত্যাগত হন নাই। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে তিনি তুরুক্ষ (তুরুস্ক) প্রদেশ জয় করিয়া তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মিবারে এক খানি প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে বাপ্পা ইস্‌পাহান, গান্ধার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরান, তুরান, এবং কাফেরিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতীচ্য রাজ্য সকল অধিকৃত করিয়া সেই সেই রাজ্যের যবন-রাজগণের কন্যাগণকে বিবাহ করেন। সেই সকল স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ এক শত ত্রিশটী পুত্র সন্তান জন্মে। ইহাঁরা "নশেরা পাঠান" নামে প্রথিত হন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জননীর নামে এক এক জাতি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অন্যদিকে বাপ্পার হিন্দু স্ত্রীগণের গর্ভে সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূন-শত সন্তান জন্মে। তাঁহারা "অগ্নি-উপাসী সূর্য্যবংশী" নামে আখ্যাত হন। বাপ্পা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মেরু পর্ব্বতের পাদমূলে সমাধিমগ্ন হন। সেই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত দেহ লইয়া তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। হিন্দু প্রজাগণ তদীয় দেহকে চিতানলে ভস্মীভূত করিতে চাহেন। এদিকে যবনপ্রজাবৃন্দ ইহাকে সমাধিনিহিত করিতে ইচ্ছা করেন। যখন এই বিষয় লইয়া বাপ্পার প্রজাবৃন্দমধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় এক জন সহসা সেই দেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র উদ্‌ঘাটন করিল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে সে মৃত-দেহ আর

তথায় নাই, কেবল অসংখ্য পদ্মফুল তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সকলের বিবাদ মিটিয়া গেল। সেই সকল পদ্মের বীজ লইয়া তখন সকলে অদূরবর্ত্তী হ্রদে গিয়া নিক্ষিপ্ত করিল। এবং সকল বীজ হইতে অসংখ্য পদ্ম ফুলের গাছ উৎপন্ন হইল। পারস্যরাজ-নসীর্ব্বান সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। বাপ্পারাউল ৭৬৯ সম্বতে বা ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ৭৮৪ সম্বতে বা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি ৮২০ সম্বতে বা ৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিগ্বিজয় উপলক্ষে চিতোর হইতে বিনির্গত হন। তাঁহার রাজত্ব-কালের মধ্যে বোগদাদে ওয়ালিদ, দ্বিতীয় ওমার, হুসাম্ এবং আল্মান্সুর—এই চারি জন কালিফ্ রাজত্ব করেন।

৭৮৪ সম্বতে বা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্পার চিতোরাধিকারের পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে কালিফ্ ওয়ালিদের সেনাপতি কাসিম ভারত আক্রমণ করেন। তাঁহার বিজয়িনী সেনা অনুগাঙ্গ প্রদেশ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিজিত করেন। কিন্তু এ বিজয়ের ফল চিরস্থায়ী হয় নাই। কালিফ্ দ্বিতীয় ওমারের সেনাপতি কাসিম-পুত্র মহম্মদ ৭১৮ হইতে ৭২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চিতোরাধিপতি মোরিরাজকে আক্রমণ করেন। অবশেষে ৭৫৪ হইতে ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কালিফ্ আল্মান্ সুরের রাজত্বকালে সিন্ধু দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্পারাও চিতোর পরিত্যাগ করিয়া ইরাণাভিমুখে বিজয়োদ্দেশে বিনির্গত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যখন যবন সেনাপতিগণ ভারত বিজয়ের জন্য উন্মত্ত হন, সেই সময়েই বাপ্পার অন্তরে প্রতীচ্য দেশ সকল জয় করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, এবং সেই বলবতী ইচ্ছার বশীভূত হইয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হন। যখন কালিফের সেনাপতি সিন্ধুদেশের চরম পরাজয়ে লিপ্ত থাকেন, সেই সময়েই সমস্ত

পাশ্চাত্য যবন-রাজ্য সকল বাপ্পার নিকট অধীনতা স্বীকার করে।

যেমন সেকেন্দার সাহ প্রাচ্য যবন-রাজ্য-সকল জয় করিয়া যবন রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বাপ্পাও সেইরূপ প্রতীচ্য রাজ্য সকল জয় করিয়া পরাজিত যবন রাজগণের কন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেকেন্দার সাহ যেমন প্রজাবৃন্দকে জাতি-নির্ব্বিশেষে স্নেহভাবে দেখিতেন, বাপ্পাও সেইরূপ হিন্দু যবন প্রজাবৃন্দকে সমভাবে দেখিতেন। সেইজন্যই হিন্দু যবন উভয়বিধ প্রজাই তাঁহার মৃত দেহের জাতীয় প্রথা-অনুসারে সম্মাননা করিতে এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেকেন্দর সাহ যেমন দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়া আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই, বাপ্পাও সেইরূপ দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া আর চিতোরে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ক্রমাগত একাদশ শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার সিংহাসন তদীয় বংশধরগণ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন। কোন রাজবংশের ভাগ্যে কোনও দেশে ও কোনও কালে এত দীর্ঘকাল এতগৌরবের সহিত রাজত্ব করা ঘটিয়া উঠে নাই। ধন্য বাপ্পা! ধন্য তোমার বংশ! তোমার মত বীর, তোমার মত মহাপ্রাণ ও মহদাশয় রাজা তোমার পর ভারতে আর জন্মেন নাই। তুমিই সেই শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী, যাঁহার বিজয়কীর্ত্তি-স্তম্ভ ককেসস্ পর্ব্বতের পাদমূলে প্রোথিত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম-বিষয়ক ঔদার্য্যে তুমি মহামতি আক্‌বরেরও শ্রেষ্ঠ। আকবর রাজপুতকন্যা বিবাহ করিয়াও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে দিল্লীর সাম্রাজ্য দিতে পারেন নাই। কিন্তু তুমি সেলিমাদি যবন-রাজগণের কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া তাঁহাদিগের গর্ভজাত পুত্রগণকে ভারতের বহিশ্চর রাজ্য সকল প্রদান করিয়া গিয়াছিলে! ধন্য তোমার মহাপ্রাণতা! ধন্য তোমার সমদর্শন!!

অপরাজিত এবং অশীল।

চতুর্ব্বিংশতি গেহ্লোট্ জাতির মধ্যে অনেক গুলিই বাপ্পা হইতে সমুৎপন্ন। বাপ্পা চিতোরাধিকার করিয়াই সৌরাষ্ট্র প্রদেশের বিজয়ে বিনির্গত হন। তথায় বন্দর দ্বীপের * অধিপতি ঈশুপ্‌গোল নামক নরপতির কন্যাকে বিবাহ করেন; এবং এই নবোঢ়া রাজনন্দিনীর সহিত সেই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ব্যান্‌মাতাকেও চিতোরে লইয়া যান। সেই অবধি ব্যান্, এক লিঙ্গের সহিত চিতোরে সমপূজিত হইয়া আসিতেছেন। যে প্রকাণ্ড মন্দিরে বাপ্পা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, সেই গগন-স্পর্শী মন্দির আজও চিতোর-গিরির শিখরদেশ অলঙ্কৃত করিয়া বাপ্পা-প্রতিষ্ঠাপিত অন্যান্য মন্দিরের সহিত তদীয় দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তির স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নন্দিনীর গর্ভে অপরাজিত নামে বাপ্পার এক পুত্র সন্তান জন্মে। এই পুত্র চিতোরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া বাপ্পা তাঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া দিগ্‌বিজয়ে বিনির্গত হন। প্রমরবংশীয় রাজকুমারীর গর্ভে তাঁহার অশীল নামে পুত্র পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠাধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় পাছে তিনি ক্ষুণ্ণ হন বলিয়া বাপ্পা তাঁহাকে সৌরাষ্ট্র প্রদেশের অধিপতি করিয়া যান। ইহাঁ হইতেই অশীল গেহ্লোট্ বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বংশ ক্রমে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, যে আকবরের সময় এই এক বংশ হইতেই রণস্থলে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য উপস্থিত হইতে পারিত।

অপরাজিতের রাজত্বকালে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার কালভুজ বা কর্ণ এবং নন্দকুমার নামে দুইটী পুত্র জন্মে। কালভুজ তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সিংহাসনে

* বর্ত্তমান দেও। আলবুকার্কের সময় হইতে ইহা পর্টুগিজদিগের অধিকারে আছে।

আরোহণ করেন। নন্দকুমার ভীমসেন দোদাকে বধ করিয়া দাক্ষিণাত্যের দেবগড় অধিকার করেন।

কালভুজ।

কালভুজের সামরিক গুণাবলী নগদা গিরিগুহার জয়-স্তম্ভসকলে সবিশেষ বর্ণিত আছে। তিনি যে শুদ্ধ বীর ছিলেন এরূপ নহে। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনেও তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা ছিল। বিশেষতঃ শিল্প ও স্থপতি বিদ্যা তাঁহা দ্বারা সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। যে স্থানে বসিয়া প্রজা-পতি হারীত তপস্যা করিতেন, যেখানে বসিয়া পিতামহ বাপ্পা রাউল হারীতের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন, সেই পবিত্র তীর্থ স্থলের উপরে কালভুজ একপ্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাপিত করিয়া তাহাতে দেবাদিদেব একলিঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অদ্যাপি সেই মন্দির পূর্ব্ব গরিমায় অবস্থিত থাকিয়া কালভুজের কীর্ত্তির স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে পুরোহিত-বংশকে কালভুজ ভগবান্ এক-লিঙ্গের পূজায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন আজও সেই পুরোহিত-বংশ সেই মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। সেই আদি পুরোহিত হইতে প্রায় এক সপ্ততি পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে বেরৈল হ্রদ সর্ব্ব-প্রধান। কালভুজ হারুন অল রসিদের সমকালীন। উক্ত কালিফ ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কালভুজ ৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। কালভুজের মৃত্যুর পর তদীয় বিখ্যাত-নামা পুত্র খোমান্ চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খোমান্।

খোমান্ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। তিনি ৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব-ভার গ্রহণ করেন।

আল্‌মামুন--পিতা হারুন আলরসিদের রাজত্ব-কালেই তাঁহার নিকট হইতে জাবুলিস্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধু দেশ, ও ভারত-বর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিতার অধীনে শাসন-কর্ত্তারূপে উক্তদেশগুলিন শাসন করিয়া আসিতে ছিলেন। অবশেষে ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতার মৃত্যুর পর স্বয়ং কালিফ পদে বৃত হইলেন। আল্‌ মামুন কালিফ পদে বৃত হইয়াই চিতোর আক্রমণের জন্য জাবুলিস্থান হইতে এক মহতী সেনা লইয়া তদভিমুখে ধাবিত হন। চিতোরই তৎকালে হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র-স্বরূপ ছিল, এবং ইহার রাজগণই ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সেই মহতী যবন-সেনার অধিনায়ক হইয়া মামুন স্বয়ং আগমন করেন। এই সঙ্কট-কালে খোমান ভারতের সমস্ত রাজবৃন্দ ও সামন্তবর্গকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, এবং অসংখ্য আর্য্য ও অনার্য্য হিন্দুরাজা ও সামন্ত তদীয় আহ্বানে আহূত হইয়া চিতোরে আগমন করেন। এই সমবেত হিন্দু সেনা লইয়া খোমান সেই মহতী যবন-সেনাকে চিতোরের অবরোধ হইতে বিদূরিত করেন, এবং সেই পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেনাপতি মামুনকে ধৃত করিয়া লইয়া আসেন।* মামুন কিছু দিন চিতোরের কারা-গারে বন্দীভূত হইয়া থাকেন। তখন মামুন কালিফ্‌ হইয়া-ছিলেন কিনা জানিবার কোন উপায় নাই। তিনি চিতোরের ইতিহাসে কখন বা "খোরাসানের অধিপতি" কখন বা "খোরাসান-সুত" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালিফ হারুন্‌ অল রসিদ্‌ আপন পুত্রগণকে স্বরাজ্য ভাগ করিয়া দেওয়ায়, দ্বিতীয় পুত্র আল্‌মামুনকেই জাবুলি-স্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধুদেশ, ও হিন্দুস্থান এই চারিটী রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। আল্‌মামুন পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হিজিরা

৭৯৮ বা ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কালিফ-পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্ব-কাল খোমানের রাজত্ব-কালের অন্তর্নিবিষ্ট। এই জন্য অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে উক্ত "খোরাসান-সুত মামুদ" আল্‌মামুন ব্যতীত আর কেহ নহেন। লিপিকর-প্রমাদ-বশতঃ বোধ হয় "মামুন" "মামুদে" পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

এই পরাজয়ে ভীত হইয়া যবনেরা ইহার পর ২০ বিংশ বৎসর আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। এই সময়ে তাঁহাদিগের দৃষ্টি সিন্ধু-দেশের উপরেই সবিশেষ পতিত হয়।

খোমান-রস নামে একখানি কবিতা-গ্রন্থে এই চিতোর-রক্ষা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল রাজা ও সামন্ত হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষার জন্য খোমানের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদিগের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই তালিকা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে এক সময়ে হিন্দু-সমাজে এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে, অন্যান্য অঙ্গে সমবেদনা অনুভূত হইত। হায়! সে দিন কি আর আসিবে না? কে বলিতে পারে আর আসিবে না?

খোমান যবনগণের সহিত চতুর্ব্বিংশতি মহাসমরে জয়লাভ করেন। এই জন্য সীজারের ন্যায় খোমানের নাম একটী পারিবারিক গৌরব-সূচক উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার শুভ কার্য্যে খোমানের নাম আজও উল্লিখিত হইয়া থাকে। উদয়পুরে তুমি যদি হাঁচ, বা যদি তোমার পদস্খলন হয় অমনিই পার্শ্ববর্ত্তী লোক বলিয়া উঠিবে "খোমান্ তোমায় রক্ষা করুন্"। যেন খোমানের আত্মা আজও মিবারবাসিগণের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে খোমান্ রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক

সেই শূন্য সিংহাসনে কনীয়ান পুত্র যোগরাজকে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু অনতিপরেই তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পুত্রের নিকট হইতে সিংহাসন পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, এবং যে সকল ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বধ করেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণগণের এইরূপ নির্যাতন আরম্ভ করিলেন, যে অচিরকালমধ্যেই মিবার প্রায় নির্ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিল। কিন্তু খোমানকে অধিক দিন নিজ চিত্তকে এই গর্হিত ব্রাহ্মণ-হত্যার দ্বারা কলঙ্কিত করিতে হয় নাই। তাঁহার অন্যতর পুত্র মঙ্গল পিতৃ-হত্যা দ্বারা তাঁহাকে এই নৃশংস পাপাচরণ হইতে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু মোঙ্গল ও নিজ পিতৃ-হত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সামন্তগণ কর্ত্তৃক নিজরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হন। তিনি মিবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া উদীচ্য মরুভূমি-স্থিত গোতুর্ব্বানগর অধিকার করিয়া তথায় মঙ্গলিয়া গেহ্লোট্‌বংশ প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

ভর্ত্তৃভূত।

খোমান্ হত ও মঙ্গল নিষ্কাশিত হইলে ভর্ত্তৃভূত বা ভটো তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার ও তদীয় উত্তরাধিকারীর রাজত্ব-কালে চিতোর-রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভর্ত্তৃভূত মাহীনদীর তীর হইতে আবু-পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ অধিকৃত ও মিবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই নবাধিকৃত প্রদেশে তিনি অসংখ্য দুর্গ-নির্ম্মাপিত করেন, এবং তাহার মধ্যে ধোরনগড় ও উজ্জড়গড় অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তিনি কুলানগর, চম্পানর, চোর্ত্তা, ভোজপুর, লুনাড়া, নিমথোড়, সোদারু; রোধগড়, সান্দপুর আইৎপুর এবং গঙ্গাদেবপুর প্রভৃতি মালব ও গুর্জ্জর প্রদেশের

ত্রয়োদশটী রাজ্যে তদীয় ত্রয়োদশ পুত্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। ইহারা ও ইঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ—ভাটেওরা-গেহ্লোট নামে ইতিহাসে বিদিত আছেন।

ভর্ত্তৃভূত বা ভটের রাজত্বের পর পঞ্চদশ-পুরুষপরম্পরা ধরিয়া মিবারের ইতিহাসে কোন বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত নাই।

ভর্ত্তৃভূতের পরবর্ত্তী রাজগণ।

অতি পুরাকাল হইতেই আজমীরের চোহান্-বংশীয় নরপতিগণের সহিত চিতোরের গেহ্লোটবংশীয় রাজবৃন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাস্বত্বেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের মধ্যে মিত্রতাও সংঘটিত হইত। মিবারাধিপতি বর্ষারাউল্ কোয়ারিওর মহাসমরে বিখ্যাত-নামা আজমিরাধিপতি দুর্ল্লভ চোহানকে নিহত করেন। যখন বহিঃশত্রু না থাকিত, তখন ইহাঁরা এইরূপে সমরাঙ্গণে পরস্পরের সহিত বল পরীক্ষা করিতেন। আবার যখন বহিঃ-শত্রু যবনাদি আসিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যের শান্তি-ভঙ্গ করিত হিন্দুধর্ম্মের বক্ষে পদাঘাত করিত—তখন উভয় রাজ্য মিলিত হইয়া সেই সাধারণ অরির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার পরপুরুষের দুল্লভ-পুত্র প্রথিত-নামা বিশূলদেব চিতোরাধিপতি রাউল্ তেজশ্রীর সহিত মিলিত হইয়া মহতী সেনা লইয়া আক্রমণ-কারিণী যবনসেনার গতিরোধ করিবার জন্য গতিপথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এই সকল বৃত্তান্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ-সকলে ও খোদিত রহিয়াছে।

খোমান্ হইতে সমর সিংহের কাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পঞ্চ-দশ নরপতি চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ইহাঁদি-গের মধ্যে শক্তিকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভর্ত্তৃভূত বা ভর্ত্তৃভাটের পর সিংহজী, সিংহজীর পর উল্লূত, উল্লূতের পর নরবাহন, নর-

বাহনের পর শালবাহন, শালবাহনের পর শক্তিকুমার—মিবা-রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি ১০২৪ সম্বৎ বা ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। গজ্‌নীপতি আলে-প্‌তেগিন্‌ ৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং শক্তিকুমার ও আলেপ্‌তেগিন উভয়ে সমকালীন; আলে-প্‌তেগিনের সেনাপতি, সুবেক্‌তেগিন শক্তিকুমারের রাজত্ব-কালে ভারত আক্রমণ করেন। তদীয় রাজধানী আইৎপুর বা আদিত্যপুরের একখানি প্রস্তর-ফলকে এইরূপ লিখিত দৃষ্ট হয়। শক্তিকুমারের পর অম্বপোষ্য চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন; এবং তাঁহার পর নববর্ম্ম ও তাঁহার পর যশোবর্ম্ম— সেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুবেক্‌তেগিন ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গজ্‌নীর সিংহাসনে আরো-হণ করেন। গজ্‌নীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি আবার ভারত আক্রমণ করেন। ভারত আক্রমণ সুতরাং নববর্ম্মের সময় ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র মামুদই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সর্ব্বনাশ করেন। ইনি যশোবর্ম্মের সমকালীন। ইনি খ্রীষ্টীয় শকের ৯৯৭ হইতে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গজ্‌নীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

হিন্দু-যবন-সংঘর্ষ।

(সম্বৎ ৭৮৪) ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্পার সিংহাসনারোহণ হইতে (সম্বৎ ৮২০) ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময় ভারত-ইতিহাসে বিশেষ স্মরণ-যোগ্য। এই সময়ের মধ্যে যবনেরা হিন্দু-রাজ-বৃন্দের হস্ত হইতে ভারত-সিংহাসন কাড়িয়া লইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়াছেন। কুক্ষণে মহম্মদ বেন্‌কাশিম্‌ ৭৭৭ সম্বৎ বা ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুপতি ডাহির-দেশ-পতি-কে বধ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে হিন্দু-সৌভাগ্য-সূর্য্য অল্পে অল্পে যবন-রাহুগ্রস্ত হইতে আরম্ভ হয়, এবং সমর-

সিংহের সময়ে দৃশদ্বতী-নদীতীরে সেই হিন্দু-সৌভাগ্য-সূর্য্য যবন-রাহু-কবলে পূর্ণ-গ্রস্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে অষ্টাদশ নরপতি চিতোরের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এই চতুঃশতাব্দী কাল তাঁহারা ক্রমাগত যবনদলনে নিরত ছিলেন। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধে তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। ভারতের রাজ-মুকুট হিন্দুর মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া যবনের মস্তক সুশোভিত করিল। হায় রে! সে দিনের স্মৃতি হিন্দুর বক্ষে আজও শেলাঘাত করিতেছে।

৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্পারাউল ইরান্-বিজয়ে বিনির্গত হন। এই সময়ে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সমরশ্রীর রাজ্যারোহণ-কাল পর্য্যন্ত সময়ের ন্যায় ঘটনা-পূর্ণ সময়, হিন্দু-ইতিহাসে আর নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এই মহাযুগের সবিস্তার ইতিহাস পাওয়া দুর্ঘট। একখানি জৈন-হস্ত-লিখিত পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে যে উল্লূত ৯২২ সম্বৎ বা ৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন অধিরোহণ করেন। আইৎপুর বা আদিত্যপুরের প্রস্তরফলকে শক্তিকুমারের কাল নির্ণীত আছে। সুবেক্তেগীন, ও মামুদের আক্রমণ কাল দ্বারা নববর্ম্মের ও যশোবর্ম্মের কাল নির্ণীত হইয়াছে।

যশোবর্ম্মের রাজত্ব-কালেই মামুদ দ্বাদশ বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ভারতের রত্নরাজি সমস্তই লুটিয়া লইয়া যান, ও ভারতের দেবমন্দিরসকলকে ভূমিসাৎ করেন। প্রবাদ আছে যে তিনি ভারতের পরাজিত রাজপত্নীগণের সতীত্ব-রত্ন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া চলিয়া যান। চিতোর ও গির্ণারের অপূর্ব্ব দেব-মন্দির-সকল ও সোমনাথের অতুল্য মন্দির তাঁহার ভীষণ হস্তে শ্রীভ্রষ্ট ও অপহৃত-রত্নরাজি হয়। সুবেক্তেগীন আদিত্যপুরের ধ্বংস বিধান করেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার পুত্র ভারতের যাহা কিছু অমূল্য ছিল সমস্তই নষ্ট করিয়া যান। তিনি ও অনেক পরে নাদের সাহা ভারতের যে রূপ দুর্দ্দশা

করিয়া ছিলেন এরূপ আর কেহ কখনও করে নাই, করিতে পারিবে কি না জানি না।

যশোবর্ম্মের পর সমরসিংহ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে পঞ্চজন রাজা চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বর্ষা রাউল ও তেজশ্রী রাউল ভিন্ন আর কাহার ও নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নাই বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল। আমরা এক্ষণে যোগীন্দ্র রাজ-শ্রেষ্ঠ সমর সিংহের রাজত্ব-কালের বর্ণনায় অবতীর্ণ হইব।

রাজ-পূত-কীর্ত্তি সমরসিংহ।

দিল্লীর পতন।

বিলম্বিত জটাজুটে যাঁহার মস্তকে যেন বিজলী খেলি-তেছে, রুদ্রামালায় যাঁহার করকমল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করি-য়াছে, ও পদ্মবীজ-মালা যাঁহার কণ্ঠ-দেশকে আলিঙ্গন করিয়া আছে ঐ মহাপুরুষ কে? যাঁহার এক নয়ন হইতে ব্রহ্মতেজ ও অপর নয়ন হইতে ক্ষত্র-তেজ উদ্গীরিত হইতেছে ঐ রাজর্ষি কে? রুদ্র ও শান্ত ভাবের যাঁহাতে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে, ঐ মানব-রূপী দেবতা কে? গভীর চিন্তায় যাঁহার উজ্জ্বল মুখ-চন্দ্র রাহু-গ্রস্তের ন্যায় হইয়াছে, ঐ নরোত্তম কে? যিনি রাজ-সিংহাসনে আসীন হইয়াও সেই দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া আছেন ঐ মহাযোগী কে? মিবারের সিংহাসনে সহসা ত্রিশূলীর আবির্ভাব কেন? আবার কি সেই মহাযোগী মহাদেব দানব-দলন-মানসে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন? না পাঠক! উনি দেবাদিদেব মহাদেব নহেন, কিন্তু সেই মহা-যোগীর উপাসক যোগীন্দ্র রাণা সমর সিংহ। সেই মহাযোগীর ন্যায় ইঁহাতেও শান্ত ও ধীর ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। মরি, মরি, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! ইঁহার

আবির্ভাবে,মিবাররাজ্য পূত ও বলিষ্ঠ হইয়াছে! আজ্ এ গভীর চিন্তা কেন? আজ দিল্লীর মহারণে যাইতে হইবে বলিয়া কি যোগীন্দ্র ভারতের ভবিষ্যৎ-ভাবনায় নিমগ্ন আছেন?

সমরসিংহ ১২০৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দই তাঁহার আবির্ভাব-কাল বলিতে হইবে। ইনি দিল্লীশ্বর পৃথ্বী-রাজের ভগিনী বিখ্যাত-নাম্নী পৃথা-দেবীকে বিবাহ করিয়া দিল্লীরাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বীলনদেব ইন্দ্রপ্রস্থের একজন সমৃদ্ধিশালী ঠাকুর ছিলেন। এই সময়ের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজ-উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্র-প্রস্থে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। উত্তরাধিকারক্রমে ঊনবিংশতি জন রাজা তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তদীয় বংশের মহিমা বিস্তার করেন। তিনি অনঙ্গপাল নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশধরগণ সকলেই এই পারিবারিক নামে অভিহিত হইতেন। এই বংশের শেষ রাজা বিখ্যাত-নামা অনঙ্গ পাল সমস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্রী রাজা হইয়াছিলেন। সমস্ত-হিন্দু-নর-পতিগণ তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী ছিলেন।*

"পত্তনের, চালুক-বংশোদ্ভব লৌহ-কায় ভোলা ভীম; আবুপর্ব্বতের সমরে ধ্রুব-তারা-সম, অচলজাতবংশোদ্ভব,প্রেম রায়; মিবারের, প্রবল হইতে করগ্রাহী, দিল্লীর প্রধান সহায় সমরসিংহ; মণ্ডোর, নাগোর, সিন্ধু, জলবাত, পেশাবর, কঙ্গ্র, কাশী, প্রয়াগ, দেওগির, সীমর, জশল্মীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ সকলেই অনঙ্গপালের আদেশ বহন করিয়া থাকেন"। আজমীরের চোহান্ বংশের নরপতিগণও শেষে অনঙ্গপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই বংশের চতুর্থ নরপতি সমরেশ্বরও কান্যকুব্জাধিরাজ বিজয়পাল এই দুই জনে অনঙ্গপালের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথম দম্পতীর পুত্র

* চাঁদ-কবি-লিখিত এই সময়ের ইতিহাস দেখ।

প্রখ্যাতনামা পৃথ্বীরাজ, এবং দ্বিতীয় দম্পতীর পুত্র জয়চন্দ্র। বিজয়পাল শ্বশুরের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনঙ্গপাল আজমীরাধিপতি সমরেশ্বরের সাহায্যে তাঁহাকে দমিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং সেই সাহায্যের পুরস্কার-স্বরূপ সমরেশ্বরকে কনিষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করেন। অনঙ্গপাল অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি অষ্টমবর্ষীয় দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে নিজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। এইরূপে চোহান-বংশে ও রাঠোর বংশে ঘোরতর শত্রুতা বাধিয়া উঠিল। যখন পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তখন জয়চন্দ্র তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলেন, এবং অনঙ্গপালের জ্যেষ্ঠা কন্যার পুত্র বলিয়া দিল্লীর সিংহাসনে তাঁহার অধিকতর অধিকার প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই চেষ্টায় তিনি চোহান বংশের চিরশত্রু পত্তনরাজ অহ্লবর ও মুণ্ডোরাধিপতি পুরীহরের বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন।

একটি ঘটনায় উভয় পক্ষের অভ্যন্তরস্থ ধূমায়মান বহ্নি অচিরাৎ প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইল, এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে উভয় পক্ষই পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইলেন। আর সেই ভস্ম-স্তূপে ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন বহুকালের জন্য সমাধি-নিহিত হইল।

পৃথ্বীরাজ মুণ্ডোরাধিপতির দুহিতার পাণি-গ্রহণার্থী হইলেন। মুণ্ডোরাধিপতি ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং দিল্লীশ্বরের সহিত তাঁহার সমর বাধিয়া উঠিল। কান্যকুব্জাধিপতি ও পত্তনেশ্বর উভয়েই মুণ্ডোরাধিপতির সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইহাঁরা আপনাদের দলের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া তাতার-বংশোদ্ভব গজনীর অধিপতি সাহাবুদ্দীনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাহাবুদ্দীন এ সুবিধা ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ

একদল পাঠানসেনা প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বর সমরসিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থ অসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাই-লেন। এদিকে সাহাবুদ্দীন্ ও সমরসিংহকে হস্তগত করিবার জন্য লাহোরের সামন্ত চাঁদপুণ্ডীরকে তাঁহার নিকট দূত-স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। সমরসিংহ তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কোন সুবিধা হইল না। সমরসিংহ নিজের দেশ ও স্বজাতিকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাসিতেন। যে দেহ ও প্রাণ তিনি দেশের জন্য উৎসর্গ করিবেন বলিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন, কোন্ প্রাণে তিনি সেই দেহ ও প্রাণ বৈদেশিকের কার্য্যে ব্যয়িত করিবেন? কোন্ প্রাণে নিজ হস্ত স্বদেশীয়ের রুধিরে কলঙ্কিত করিবেন? না—মহাপুরু-ষের জন্ম স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য—স্বদেশের অধঃপাত-সাধনের জন্য নহে। তাই আজ সমরসিংহ সাহাবুদ্দীনের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন? তাঁহার স্বদেশানু-রাগে দূতবর চাদপুণ্ডীর মুগ্ধ হইলেন। এখন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিলেন। সেই রাভীতীরে, যেখানে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অনন্ত-কালের জন্য রাহুগ্রস্ত করিবার জন্য, যবন-রাহু সাহাবু-দ্দীন প্রথমে আবির্ভূত হন—সেই রাভীতীরে চাঁদপুণ্ডীর সেই যবন-রাহুর গতি রোধ করিতে গিয়া এই মরণ-শীল দেহের বিনিময়ে অমরত্ব লাভ করেন। অহো! মহাপুরুষের উদার দৃষ্টা-ন্তের কি অপূর্ব্ব মহিমা! বৈদেশিকের দৌত্য-কার্য্যে আসিয়া সমরসিংহের চরিত্রের মোহিনী-শক্তি-বলে চাঁদপুণ্ডীর আজ জননী জন্মভূমির চরণে আত্মপ্রাণ অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ধন্য গুরু! ধন্য শিষ্য! এইজন্য স্বদেশানুরাগ-বশতঃ সমর-সিংহ স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে অসি ধারণ না করিয়া পাঠান-সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হইলেন। পৃথ্বীরাজ

যৎকালে হিন্দুরাজগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময় সমরেশ্বর পাঠান সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগের গতিরোধ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে পাঠানদিগের সহিত তাঁহার অনেক গুলি যুদ্ধ হয়। জয় পরাজয় কোন পক্ষেই নিশ্চিত হয় নাই। ইত্যবসরে পৃথ্বীরাজ গুজরাটের যুদ্ধ অবসান করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মিলিত আর্য্য-সেনা ভীষণ রণোন্মাদের সহিত যবনসেনাকে আক্রমণ করিল। আক্রমণ-কারিণী যবনসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল ও যবন সেনাপতি বন্দীকৃত হইলেন। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই নাগিরে সাত লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। পৃথ্বীরাজ ভগিনীপতি সমরসিংহকে ইহার অংশ দিতে চাহিলেন। কিন্তু যোগীন্দ্র সমরসিংহ সামান্য পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি আবিষ্কৃত ধনের অংশ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু তিনি নিজ সামন্তবর্গকে সম্রাট্-প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন। পৃথ্বীরাজকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সমরসিংহ নিজ রাজধানী চিতোর নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজ রাজচক্রবর্ত্তী-রূপে ভারত শাসন করিতে লাগিলেন। উপর্য্যুপরি বিজয়ে তিনি এতদূর দৃপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে যবনদিগের অবশ্যম্ভাবি ভবিষ্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। বহু বৎসর গত হইল, তথাপি যবনেরা আর আক্রমণ করিল না দেখিয়া পৃথ্বীরাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। কিন্তু গিজনীরাজ নিদ্রিত ছিলেন না। তিনি কৃত-অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কেবল অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। তিনি পৃথ্বীরাজকে প্রমত্ত ও অনবহিত দেখিয়া এই সুযোগে মহতী সেনা লইয়া স্বয়ং দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পৃথ্বী-রাজ ইহার জন্য বিন্দুমাত্রও

প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া সমর-সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ও তাঁহাকে অবিলম্বে সসৈন্য দিল্লী রক্ষার্থ আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পত্তন, কান্যকুব্জ ও ধারানগরীর অধিপতি-ত্রয় অন্তর্নিগূহিত হর্ষের সহিত উদাসীনভাবে এই জাতীয় সমরের পরিণাম দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে এই মহারণে পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহাদিগের—অধিক কি সমস্ত ভারতবাসীর—অদৃষ্ট পরীক্ষিত হইবে।

শেষে জানিলেন এই জাতীয় কার্য্যে অবহেলারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদিগকেও অচিরাৎ করিতে হইবে। যে পাপিষ্ঠ সহর্ষে আশ্রয়-তরুর মূলচ্ছেদ অবলোকন করে, বিধাতার অলৌকিক কৌশলে ছিন্ন তরুর স্কন্ধ তাহার মস্তকে অব্যর্থ-রূপে পতিত হয়! এই পাপেই ভারতের মানচিত্র হইতে এ তিন রাজ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! ধন্য বিধাতঃ! ধন্য তোমার কৌশল!

সমরসিংহ এবার যেন বুঝিতে পারিলেন যে আর তাঁহাকে চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না। বুঝিয়াই যেন তিনি প্রিয়তম কনিষ্ঠ কুমার কর্ণ-হস্তে রাজধানী রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া দিল্লীর রক্ষার্থ গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠাধিকার লঙ্ঘন করায় জ্যেষ্ঠ-পুত্র বিরক্ত হইয়া বিদর্ভাধিপতি ছুবদী পাসার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও তৎকর্ত্তৃক তথায় মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। অন্যতর পুত্র নেপালে পলায়ন করিয়া তথায় ঘেলোট-বংশ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

এদিকে সমরসিংহের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সমস্ত দিল্লীবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দ-গীত গাইতে লাগিল ও আনন্দোৎসবে প্রমত্ত হইল। সকলেই যেন তাঁহাকে ত্রাণ-কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। দিল্লীশ্বর

পৃথ্বীরাজ ও তদীয় সভাসদ্‌গণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সাত মাইল অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সমর-মহিষী পৃথ্বী-রাজ-ভগিনী পৃথার সহিত পৃথ্বী-রাজের উদ্দীপনা-পূর্ণ স্নেহালাপ হইল, এবং উভয় পক্ষের সামন্তবর্গের মধ্যে পরিচিতে পরিচিতে পরস্পর গাঢ়তর আত্মীয়তার বিনিময় হইল। সমরসিংহ পৃথ্বীরাজকে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকার জন্য সবিশেষ তিরস্কার করিলেন। পৃথ্বীরাজ অবনত মস্তকে হিতাকাঙ্ক্ষী ভগিনী-পতির সেই তিরস্কার বহন করিলেন।

কি প্রণালীতে উপস্থিত সমর চালাইতে হইবে এবং দৃশদ্বতী নদীতীরে কিরূপে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে, এ সকল বিষয়ে পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের মত গ্রহণ করিলেন, এবং তদনুসারে কার্য্যও করিতে লাগিলেন। ট্রয়-অভিযান-কালে, গ্রীক্‌সৈন্যগণ ইউলিসিস্‌কে যে ভাবে দেখিতেন, আজ এই মিলিত-সেনা সমরসিংহকে সেই ভাবে দেখিতে লাগিলেন। সমরসিংহ যুদ্ধে সৎসাহসী, ধীর, অবিচলিত, ও সুদক্ষ, মন্ত্র ভবনে সদ্বিবেচক, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, সৎবক্তা এবং সর্ব্ব সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত, বিনীত ও সংযত-বাক্ বলিয়া উভয় পক্ষের সামন্ত ও অধীন ভূম্যধিকারিগণের সবিশেষ ভক্তি-ভাজন ছিলেন। তিনি যাহারই সহিত সংস্রবে আসিতেন, নিজ চরিত্র-গৌরবে তাহাকে মুগ্ধ করিতেন। তিনি সর্ব্ব গুণের আধার ও সর্ব্ব কর্ম্ম ও জ্ঞানের আকর ছিলেন। অভিযান-কালে শাকুনিক লক্ষণ দ্বারা ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে তাঁহার মত, কোন শাকুনিক-শাস্ত্রবিশারদ পারিতেন না। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে অস্ত্রে শস্ত্রে সাজাইয়া দিতে তাঁহার মত কেহ পারিতেন না। রণস্থলে অস্ত্রচালনা বা অশ্বচলনা বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন ভারতে এরূপ বীর তৎকালে কেহ ছিলেন না। কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি অভিযান-কালে, অথবা যুদ্ধের আয়োজন-সময়ে—সামরিক নেতৃ-বৃন্দ সকলেই যেন

এক নয়নে উপদেশ প্রতীক্ষায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহার বাগ্মিকতায় প্রীত ও তদীয় জ্ঞানগর্ভ উপদেশে উপকৃত হইতেন। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি, সকলশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কি কি লক্ষণ দ্বারা দূত নির্ব্বাচন করিতে হইবে, কিরূপ গুণাক্রান্ত লোককে মন্ত্রি-পদে অভিষিক্ত করিতে হইবে, এবং রাজা ও প্রজা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন—এ সমস্ত উপদেশ লইতে হইলে সকলে তাঁহারই নিকটে উপস্থিত হইতেন।

কিন্তু এই মহা-পুরুষের জীবিত-কাল অন্ত্য সীমায় উপনীত হইয়াছে। তিন দিন ঘোরতর রণের পর এই মহাপুরুষ দৃশদ্বতী-নদী-তীরে প্রিয় পুত্র কন্যাগণের সহিত রণক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। হায়! ভারতের চন্দ্র আজ অস্তমিত হইলেন। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারত-গগণে অনন্ত অমাবস্যা বিরাজ করিতেছে! হিন্দুগণ! একবার নয়ন ভরিয়া দেখ তোমাদের গগণ-শশী ভূতল-শায়ী হইয়াছেন! আর ঐ দেখ তোমাদের শেষ সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ যবন-রাহু-কবলে পতিত হইয়াছেন! হিন্দুগণ! একবার ক্রন্দন-রোলে ও বক্ষঃতাড়নে গগণ বিদারিয়া এই যবন-রাহু-কবলিত রবির ও এই গগণ-চ্যুত শশীর জন্য কাঁদ! আর এই দিনে প্রতি বৎসর এক দিন করিয়া কাঁদিতে থাক! হায় রে! সে দিন কবে আসিবে যে দিনে ঐ রবিশশী আবার ভারত-গগণে উদিত হইবে?

দিল্লী-অধিকার।

হিন্দুর দুর্দ্দশা।

এই মহারণে শুদ্ধ যে সমরসিংহ ও তদীয় পুত্র নিহত এবং পৃথ্বীরাজ শত্রু-হস্তে বন্দী হইলেন এরূপ নহে, দিল্লী ও মিবা-

রের সামন্তবর্গের ও সৈন্যগণের প্রধান প্রধান প্রায় সকলেই সমরশায়ী হইলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে এই নরমেধ যজ্ঞে শুদ্ধ মিবারেরই সৈন্য ও সামন্তে ত্রয়োদশ সহস্র ক্ষত্রবীর বলি পড়িলেন। ঐ দেখ! ক্ষত্র-শোণিতে দৃশদ্বতী নদী স্ফীতা-বয়বা হইয়া দ্রুততর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখ! শকুনি গৃধিনীতে রণস্থল যেন মেঘাবৃত হইয়া আছে! কি ভীষণ দৃশ্য! ভারতবাসির হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু—ভারতের বীরমণ্ডলী—আজ ভূমিতলে গড়াগড়ী যাইতেছেন! তাঁহাদের এই পবিত্র দেহের সৎকার করে এমন লোক কেহ নাই! আজ অগণ্য হিন্দু সন্তানের মধ্যে সাহসে হৃদয় বান্ধিয়া যবন-রাহু-কবল হইতে এই পবিত্র শব গুলি উদ্ধার করে এমন কেহ নাই! হায় রে আমরা কেন বাঁচিয়াছি? আর ঐ দৃপ্ত যবনেরা আজ বিজয়-উল্লাসে মত্ত হইয়া হিন্দুর শেষ দাঁড়াইবার স্থল হস্তিনাপুরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। আজ সমরসিংহ হত ও পৃথ্বীরাজ বন্দীকৃত—কে তবে এ বিপদে হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবে? আজ ভারতের বীরমণ্ডলী জননীক্রোড়ে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, আজ কে তবে জননীর গৌরবরক্ষা করিবে? হায় হায় সব গেল! ঐ দেখ যবনেরা বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে দিল্লী অধিকার করিল। ঐ শুন! আবালবৃদ্ধবনি-তার ক্রন্দন-রোলে আজ দিল্লী ফাটিয়া যাইতেছে! যবনের "আল্লা আল্লা" রবে আজ কর্ণ বধির হইতেছে! ঐ দেখ সমরপ্রিয়া পৃথাদেবী প্রিয়তম পতির ও প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যু ও ভ্রাতার বন্দীভূত হওয়ার সংবাদ-শ্রবণে শোকে অধীর হইয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিতেছেন! ঐ দেখ! পাগলিনী-বেশে চিতোর-রাজমহিষী পতির মৃত দেহের পার্শ্বে শয়ন-করিয়া ও পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অনলে আত্ম-আহুতি দিতে-ছেন! হায় কি হইল? ভারত-শশী-সহ ভারত-রোহিণী দেখিতে দেখিতে পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেলেন!

দিল্লীর ধ্বংস।

আর পাঠক! ঐ হিন্দু-কীর্ত্তি-স্তম্ভ হস্তিনাপুরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ! অহো! কি লোম-হর্ষণ দৃশ্য! ঐ দেখ! বিজয়োন্মত্ত যবনেরা সতীর সতীত্ব নাশ করিতেছে! যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে তাহাকে সমর-সদনে প্রেরিত করিতেছে! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই ইহাদের করাল অসির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতেছে না! ধ্বংস, লুণ্ঠন, ও হত্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়ন গোচর হইতেছে না! অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-মন্দির,—বিচিত্র সৌধরাজী,—ধর্ম্মের চক্ষে যাহা অতি পবিত্র, শিল্প বিজ্ঞানে যাহা অতুলনীয়—সমস্তই এই নির্দ্দয় ও অসভ্য তাতারগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল! ঐ দেখ! হিন্দুর হৃদয়ের প্রিয় বস্তু হস্তিনাপুর নিমেষ-মধ্যে শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল! এই পূত রাজধানীর প্রতি বিন্দু হিন্দুর পবিত্র রুধিরে কলঙ্কিত হইল! প্রত্যেক গমনপথ হিন্দুর মৃত দেহে সমাচ্ছন্ন হইল! হিন্দুর আনন্দপুরী আজ যম-পুরীতে পরিণত হইল! হায় কি হইল? কোন্ পাপে হিন্দুর আজ এই দুর্দ্দশা ঘটিল?

সমরসিংহ ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ।

রাণা ভীমসিংহ ও তদীয় পত্নী পদ্মিনী।

(সম্রাট্ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর-আক্রমণ।)

মহামতি সমরসিংহ দৃশদ্বতী-নদীতীরে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিলে, তদীয় পুত্র কর্ণ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তৎকালে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন বলিয়া তদীয় জননী পত্তন-রাজ-তনয়া বিখ্যাত-নাম্নী কর্ম্মদেবী তাঁহার অভিভাবিকা-স্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যা-

লোচনা করিতে লাগিলেন। ১২৪৯ শক বা ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কুতবুদ্দীন রাজপুতানা আক্রমণ করেন। কর্ম্মদেবী রাজপুত-সৈন্য লইয়া এই আক্রমণকারিণী যবন-সেনার প্রতিরোধ করেন। তিনি অম্বর নগরে আসিয়া ইহাদিগকে যুদ্ধ দেন। এই যুদ্ধে কুতবুদ্দীন পরাজিত ও আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন।

এই যুদ্ধে নয় জন রাজা ও একাদশ জন সামন্ত কর্ম্মদেবীর অনুবর্ত্তন করেন। সমরসিংহ ও সূরজমল দুই সহোদর ছিলেন, সূরজমলের পুত্র ভারত। ভারতের পুত্র রাহুপ। কর্ণের মৃত্যুর পর রাহুপই (১১৫৭ শকে—১২০১ খ্রীষ্টাব্দে) চিতোরের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। রাহুপের সময়েই মিবার-রাজ-বংশ সিসোদিয়া বংশ নামে আখ্যাত হয় ও রাজা রাণা উপাধি ধারণ করেন। এখন হইতেই আমরা মিবারাধি-পতিগণকে রাণা উপাধিতে ভূষিত করিব। কর্ণের মাহুপ নামে এক পুত্র ছিল, কিন্তু তাঁহার অযোগ্যতা নিবন্ধন, কর্ণ ভারতকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ভারত তাঁহার অগ্রেই পরলোক-গত হন বলিয়া তদীয় পুত্র রাহুপই কর্ণ-পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাণা রাহুপ ও রাণা লক্ষীর রাজত্ব-কালের ব্যবধান অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র। এই অল্প সময়ের মধ্যে নয় জন রাণা মিবারের রাজ-সিংহা-সন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্ব-কালের ব্যবধান প্রায়ই সমান। এই নয় জন রাণার প্রত্যেকেই পবিত্র গয়া নগরীকে যবনাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া রণ-ক্ষেত্রে যবন-হস্তে প্রাণ হারান। এই রাজ-শ্রেণীর শেষ রাজা রাণা পৃথ্বীমল। উপর্য্যুপরি নয় জন রাজা এই পবিত্র তীর্থ-স্থলের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করায় যবন-রাজ ভীত ও বিস্মিত হইয়া কিছুকাল এই নগরীর আক্রমণ

হইতে বিরত থাকেন। ধর্ম্মান্ধ আলাউদ্দীনের সময়েই এই আক্রমণ পুনরারব্ধ হয়।

রাণা লক্ষী—৩৩১ শকে (১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) পিতৃ-পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে চিতোরনগরী—ভারতের যাহা কিছু বহুমূল্য বা অমূল্য মণিমুক্তা হীরক প্রবাল প্রস্তরাদি—তদ্দ্বারা খচিত ও নির্ম্মিত, যে কিছু মনোমোহন কারু কর্ম্মাদি, তদ্দ্বারা সুশোভিত; যে চিতোর নগরী অপবিত্র করস্পর্শে আজও দূষিত হয় নাই; সেই অপূর্ব্ব রাজধানী চিতোর নগরী এই রাণার সময়েই পাঠান সম্রাট্ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি দুইবার আক্রান্ত, অবরুদ্ধ ও অবশেষে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। প্রথমাক্রমণ চিতোরের বীরবৃন্দের রুধিরে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয় আক্রমণে চিতোর শ্মশানে পরিণত হয়।

রাণা লক্ষীর খুল্লতাত রাণা ভীমসিংহ তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তদীয় অভিভাবক-স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সিংহল-রাজ চোহানবংশীয় হামীরশঙ্কের কন্যা বিখ্যাতনাম্না পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। এই পদ্মিনীই সিসোদীয়া বংশের অগণ্য ও অসীম দুঃখের মূল হইলেন। পদ্মিনী সৌন্দর্য্যে ও গুণে জগতে অতুলনীয়া ছিলেন। বংশ-মর্য্যাদায়, চরিত্র-গৌরবে ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে পারেন তৎকালে জগতে এরূপ ললনা শ্রুতিগোচর হয় নাই।

চিতোর আক্রমণ।

কিন্তু পদ্মিনীর এই অলৌকিক সৌন্দর্য্যই চিতোরের ধ্বংসের কারণ হইল। কামাতুর যবন-রাজ আলাউদ্দীন পদ্মিনীর রূপলাবণ্য-বার্ত্তা শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া পদ্মিনী-লাভার্থ চিতোর আক্রমণ করিলেন। রাজপুতগণের অসাধারণ বীরত্বে তাঁহার প্রথম

আক্রমণ প্রতিহত হইল। কিন্তু বিক্রমকেশরী আলাউদ্দীন কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহেন। তিনি মহতী সেনা লইয়া দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করিলেন। তিনি বলে নগর অধিকার করিতে অক্ষম হইয়া দীর্ঘকাল নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু চিতোর কিছুতেই অবনমিত হইল না। তখন তিনি যবন-সুলভ চাতুরী অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রথমে বলিয়া পাঠাইলেন যে পদ্মিনীকে পাইলেই তিনি নগরের অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু রাজপুতেরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তথাপি কুলকামিনীকে শত্রু-হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং আলাউদ্দী-নের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তিনি পদ্মিনীকে একবারমাত্র দেখিতে চাহিলেন কিন্তু রাজপুতেরা তাহাতেও অস্বীকৃত হইলেন। অবশেষে উভয় পক্ষের সম্মতি-ক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে আলাউদ্দীন দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্বমাত্র দেখিয়া যাইবেন। রাজপুতগণের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিয়া আলাউদ্দীন অল্প-সংখ্যক দেহ-রক্ষক সঙ্গে লইয়া পদ্মিনী-মহলে গমন করিলেন। তথায় দর্পণে সেই জগল্ললামভূতা রমণীরত্নের প্রতিবিম্ব দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিয়া আলাউদ্দীন নিজ শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাসবিষয়ে যবনের নিকট পরাস্ত হইতে ইচ্ছুক না হইয়া ভীমসিংহ নির্ভীক চিত্তে সম্রাট্ সঙ্গে দুর্গপাদ-মূল পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আলাউদ্দীন জানিতেন পবিত্র-চরিত আতিথ্য-জীবন হিন্দুরা কখনই বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না। তিনি আরও জানি-তেন যে তিনি যখন নির্ভয়ে ভীমসিংহের আলয়ে গমন করি-লেন তখন ভীমসিংহও অন্ততঃ দুর্গ-দ্বার-পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাখিয়া যাইবেন। হিন্দুর চরিত্র-মহিমার উপর নির্ভর করিয়া কপটী যবন-সম্রাট্ ভীমসিংহকে ধরিবার জন্য দুর্গ দ্বারের নিকট লুক্কায়িতভাবে অনেক গুলি সৈন্য রাখিয়াছিলেন। তিনি

বিদায় গ্রহণ-কালে চিতোরের উপর অত্যাচার করার জন্য ভীমসিংহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলেন এমন সময় সেই গুপ্ত-স্থান হইতে যবন-সৈন্য বহির্গত হইয়া ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া যবন-শিবিরে লইয়া গেল। আলাউদ্দীন পদ্মিনীর নিষ্ক্রয়-স্বরূপ ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

এই সংবাদ চিতোরে আসিবামাত্র চিতোরবাসিগণের হৃদয় গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইল। চিতোরের রক্ষক ও অভিভাবক রাণা ভীমসিংহ যবন-শিবিরে বন্দীভূত! এখন চিতোর রক্ষা কে করে কে? এই ভাবনায় সকলেই নিরতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিষ্ক্রয়-স্বরূপ পদ্মিনীকে পাঠান হইবে কি না এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন হইতে লাগিল। এই সংবাদ পদ্মিনী সতীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি স্বামীর উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বামীকে উদ্ধার করিয়া আত্ম-ধ্বংস করিবেন সঙ্কল্প করিয়া পরিচ্ছদ-মধ্যে অস্ত্র লুক্কায়িত করিলেন, করিয়া নিজ খুল্লতাত গোরা ও তদায় ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবর বাদলকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভীমসিংহের উদ্ধার ও পদ্মিনীর সম্মানরক্ষা উভয় দিক্ রক্ষা করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" 'শঠের সহিত শঠতা করিতে হইবে' চাণক্যের এই নীতি অবলম্বন করিয়া আলাউদ্দীনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে—যে দিন তিনি চিতোরের অবরোধ উত্তোলন করিবেন, সেই দিনই তাঁহারা পদ্মিনীকে তাঁহার শিবিরে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু রাজনন্দিনী ও রাজমহিষীর অবস্থানুরূপ লোকজনসহ তাঁহাকে পাঠান হইবে। যে সকল ধাত্রী ও সহচরীগণ তাঁহার সহিত দিল্লী গমন করিবেন, শুদ্ধ যে কেবল তাঁহারাই সম্রাটের শিবিরে যাইবেন এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল রাজপুত-রমণী তাঁহার সহিত শেষ দেখা করিতে যাইবেন তাঁহাদিগকেও যাইতে দিতে হইবে। আর

কঠিন আদেশ প্রচার করিতে হইবে যে কেহ যেন কৌতূহলো-দ্দীপ্ত হইয়া সেই কুলকামিনীগণের শিবিকার বস্ত্র উত্তোলন করিয়া কুলকামিনীর লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত সম্পাদন না করে। কামোন্মত্ত আলাউদ্দীন এই বাগুরায় পতিত হইলেন। তিনি রাজপুতগণের সমস্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সপ্ত শত শিবিকা সম্রাটের শিবিরাভিমুখে প্রবাহিত হইল। প্রত্যেক শিবিকায় মিবারের এক একটী বীররত্ন শায়িত হইলেন। প্রত্যেক শিবিকা ছয় জন করিয়া গুপ্তাস্ত্র-বীর-পুরুষ-কর্ত্তৃক প্রবাহিত হইল। শিবিকারোহী বীরবৃন্দ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত রহিলেন। এইরূপ অবস্থায় সেই শিবিকা-মালা যবন-সম্রাটের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি রাজ-শিবির কানাত বা শ্বেত-বস্ত্র-নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইল। বাহকেরা শিবিকা রাখিয়া স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইল। রাণা ভীমসিংহকে পদ্মিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টাকালমাত্র সময় প্রদত্ত হইল। ভীমসিংহ শিবিকা আরোহণে সেই কানাত-পরিবেষ্টিত শিবিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরস্পর কথোপকথনে রাণার অল্প বিলম্ব হওয়ায় আলাউদ্দীন ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অব-শেষে ভীমসিংহ শিবির হইতে বিনির্গত হইয়া চিতোরাভি-মুখে ধাবিত হইলেন। অদূরে বেগগামী অশ্ববর প্রস্তুত ছিল, রাণা তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক চিতোরাভিমুখে পলায়ন করি-লেন। রাণার শিবির হইতে নিষ্ক্রামণের পরই অস্ত্রধারী বীর-পুরুষগণ নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিমেষমধ্যে প্রত্যেক শিবিকারোহী ও প্রত্যেক শিবিকাবাহী যেন এক এক যম-দূতের মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। আলাউদ্দীন পূর্ব্ব হই-তেই সতর্ক না হইলে বোধ হয় আজ সসৈন্যে নির্ম্মূল হইতেন। তিনি এরূপ ঘটনা সম্ভব-পর মনে করিয়া সৈন্যগণকে রণ-সজ্জায় সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সঙ্কেত পাইবামাত্র

সমস্ত যবনসৈন্য সেই সেই ছদ্মবেশী বীরবৃন্দকে আক্রমণ করিল। সেই অনন্ত যবন-সৈন্য-সাগরে ক্ষত্রবীরবৃন্দ একে একে বিলীন হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। ভীমসিংহ পরিত্রাণ পাইলেন, এবং পদ্মিনী সতীর সতীত্ব রক্ষা হইল। রাজার জীবন ও রাজপুত-রমণীর সতীত্ব রক্ষার জন্যই যেন রাজপুত বীরবৃন্দের জন্ম পরিগ্রহ। এরূপ রাজভক্তি ও এরূপ রমণী-সম্মান-রক্ষা আর কোন দেশে আছে কি না, হইতে পারে কি না, ইতিহাস আজও তাহা লিখে নাই। স্ত্রীজাতির সম্মান-রক্ষা যদি সভ্যতার নিকর্ষ স্থল হয় তাহা হইলে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে হইবে যে রাজপুত জাতির ন্যায় সভ্যজাতি জগতে আর জন্মে নাই। এরূপ আত্মোৎসর্গ ও এরূপ স্বজাতিপ্রেমও আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই। ধন্য বীরবৃন্দ! ধন্য তোমাদের জীবন!

ভীমসিংহ সেই বেগ-গামী অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুত-বেগে চিতোর দুর্গোপরি আরোহণ করিলেন। তিনি দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল। চিতোরের বীর চূড়ামণিগণ দুর্গদ্বারের বাহিরে গিয়া অনুসরণকারিণী যবন-সেনার গতিরোধ করিলেন। বীরবর গোরা ও তদীয় ভ্রাতুস্পুত্র বীরচূড়ামণি বাদল এই ক্ষত্রবীরবৃন্দের অধিনেতা হইয়া অদ্ভুত রণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ রাণা ভীমসিংহের উদ্ধার ও রাজ্ঞী পদ্মিনার সম্মান রক্ষা—তাঁহাদের হৃদয়ের প্রিয়তম সঙ্কল্পদ্বয় সাধিত হইয়াছে। এখন আর জীবনে তাঁহাদের মমতা নাই। যাঁহার জীবনে মমতা নাই, যাঁহার প্রাণ স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাঁহার গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? আজ এই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীরবৃন্দের করাল অসিমুখে অসংখ্য যবনসৈন্য নিহত হইতে লাগিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত রণোন্মত্ত যবনসৈন্য কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে। একদল নিহত হইল, অমনি আর এক

দল যবন সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থল অধিকার করিল। এইরূপ নিরন্তর আক্রমণে রাজপুত-সৈন্য ক্রমেই ক্ষীণ বল হইতে লাগিল। রাজপুত-সৈন্য ক্রমেই ক্ষীণবল হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রাজপুততেজ কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এক প্রবয়া গোরা ও এক দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদলের অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া আলাউদ্দীন চমকিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন একটি রাজপুত জীবিত থাকিতে, তাঁহাকে সহজে দুর্গ দখল দিবে না। সুতরাং আর স্ববল ক্ষয় করা উচিত নয় মনে করিয়া তিনি প্রত্যাভিযানের অনুমতি প্রদান করিলেন। আজ গোরা ও বাদল এবং তাঁহাদের অনুগামী রাজপুতগণের অতি-মানুষ-আত্মোৎসর্গে রাণার উদ্ধার ও রাণী পদ্মিনীর সতীত্ব রক্ষা হইল! আজ মিবারের বীরচূড়ামণিকুলের অর্দ্ধেকের রুধিরে চিতোরের স্বাধীনতা ক্রীত হইল। আজ রাজপুত-বীর্য্যে আর্য্য-গৌরব-রবি যবন-রাহুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল!

দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদল রণ-জয়ী হইয়া ক্ষত দেহে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তদীয় খুল্লতাত গোরা, নিজের জীবনের বিনিময়ে ভ্রাতষ্পুত্রীর সম্মান রক্ষা ও ভ্রাতৃ-জামাতার উদ্ধার সাধন করিয়া রণস্থলে শায়িত রহিলেন। বাদল গৃহে একাকী ফিরিয়া আসিলে তদীয় খুল্লতাত-পত্নী উন্মত্তার ন্যায় হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রাণাধিক বাদল! বল বল তোমার খুল্লতাত কেমন যুদ্ধ করিলেন"!

রাজপুত-রমণী স্বামীর জীবনাপেক্ষা তাঁহার গৌরবকে অধিকতর আদর করিতেন; তাই আজ গোরা-পত্নী স্বামীর মৃত্যু-শোকে অধীরা না হইয়া রণস্থলে তিনি বীরোচিত আচরণ করিয়াছিলেন কিনা কেবল তাহাই জানিতে চাহিলেন। বীর বালক বাদলও তাঁহার আশানুরূপ উত্তর প্রদান করিলেন—বলিলেন "মাতঃ! এ যুদ্ধক্ষেত্রের শস্যরাজির তিনিই প্রধান কর্ত্তনকারী। তদীয় করাল অসি যাহা কাটিতে লাগিল, আমি

কেবল তদনুগামী হইয়া তাহা কুড়াইতে কুড়াইতে চলিলাম। সেই রুধিরময় গৌরবশয্যার উপর তিনি শত্রু-দেহ-রূপ বিচিত্র আস্তরণ বিস্তারিত করিলেন। এক যবনরাজকে সেইশয্যার উপাধান করিবার জন্য তিনি নিজে তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন এবং শত্রু-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই গৌরবশয্যায় শয়ন করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।" গোরাপত্নী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "বল বাদল! আমার প্রাণপ্রিয় রণস্থলে আর কি কি করিলেন।" বাদল আবার উত্তর করিলেন "জননী গো! তাঁহার বীরত্বের আর অধিক কি পরিচয় দিব? তিনি যুদ্ধস্থলে তাঁহার এমন এক জন শত্রু রাখিয়া যান নাই, যে সে তাঁহার ভয়ে ভীত হইবে, বা তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিবে।" রাজপুতসতী তখন তৃপ্ত হইলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া বাদলের নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন—"বাদল! আমি চলিলাম, আর বিলম্ব করিলে আমার প্রভু আমায় তিরস্কার করিবেন"। এই বলিয়া বাদলের নিকট বিদায় লইয়া সেই স্বর্ণ-প্রতিমা রণস্থলে গিয়া স্বামীর মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। সেই অনলে পুড়িয়া সতী পতি-সহ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন! আর সেই পবিত্র চিতাভস্মে ভারত-বক্ষ পূত হইল! কি অদ্ভুত সতীত্ব ও অলৌকিক আত্মোৎসর্গ!

পুনর্ব্বার চিতোর-আক্রমণ।

নরাধম আলাউদ্দীনের পদ্মিনী-পিপাসা নিবৃত্ত হইবার নহে। যবন-সম্রাট্ উপচিত-বল হইয়া আবার (১৩৪৬ শকে—১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে) চিতোর আক্রমণ করিলেন। মিবারবাসিগণ এখনও পূর্ব্বের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। মিবারের বীরবৃন্দের অর্দ্ধেক পূর্ব্ব সমরে নিহত হইয়াছিলেন। এখনও মিবার সেই শোকাভিভূতি হইতে সম্যক্ উঠিতে পারে নাই।

সুতরাং আলাউদ্দীনের পুনরাগমনে রাজপুতগণ ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বিষাদ-মেঘে মিবারগগণ সহসা সমাচ্ছন্ন হইল। এই স্তম্ভিত অবস্থায় অল্প বাধায় আলাউদ্দীন চিতোর-গিরির দক্ষিণ কেন্দ্র দখল করিয়া ফেলিলেন ও পরিখা খনন দ্বারা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সমস্ত দিবস সংগ্রামের পর ক্লান্ত হইয়া রাণা লক্ষী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। গভীর চিন্তায় নিদ্রা পরিহৃত হইল। তিনি এই আসন্ন বিপদে তদীয় দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে অন্ততঃ এক জনকে কিরূপে রক্ষা করিবেন ইহাই ভাবিতে লাগিলেন—এমন সময় "মীন্ ভুখা হো!" (আমি ক্ষুধাতুরা হইয়াছি) এই শব্দ সহসা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। দীপ-শিখা মিটি মিটি জ্বলিতেছিল,—তিনি সেই ক্ষীণ দীপালোকে দেখিতে পাইলেন যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি স্তম্ভদ্বয়ের মধ্য দিয়া তদীয় পর্য্যঙ্কাভিমুখে আসিতেছেন। রাণা ভীত না হইয়া উত্তর করিলেন। "মা! আমার আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে প্রায় অষ্ট সহস্র জন গত সমরে আপনার নিকট বলি পড়িয়াছে, তথাপিও কি আপনার রুধির-পিপাসা মিটে নাই?" দেবী উত্তর করিলেন—"আমি রাজবলির প্রার্থিনী,—যদি দ্বাদশ জন মুকুটধারী রাজা চিতোর রক্ষার জন্য বলি না পড়েন, তাহা হইলে মিবার রাজ্য অদ্য অন্য রাজবংশে গত হইবে," দেবীমূর্ত্তি এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন।

চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

প্রত্যূষে রাণা লক্ষী উঠিয়াই সামন্ত-সভা আহ্বান করিলেন, এবং সামন্তবর্গকে গত রাত্রির দেবী-আবির্ভাব-বৃত্তান্ত জানাইলেন। সামন্তবর্গ বলিলেন যে "ইহা চিন্তাকুলিত ব্যক্তির বিপর্য্যস্ত কল্পনায় স্বপ্ন-দর্শনমাত্র।" কিন্তু রাণা এই কথায় পরিতৃপ্ত হইলেন না। তিনি সামন্তবর্গকে রজনীতে তদীয়

শয়নাগারে উপস্থিত হইতে বলিলেন। তাঁহারা যথা সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেবী মূর্ত্তিও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার আবির্ভূতা হইলেন। আবার তিনি পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত কথা পুনরুক্ত করিলেন, বলিলেন তাঁহার আদেশ প্রতি-পালিত না হইলে, তিনি কখনই তাঁহাদিগের মধ্যে থাকি-বেন না। আরও বলিলেন—"যদিও সহস্র সহস্র যবনদেহে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয় তাহাতে আমার কি? আমি ক্ষত্রিয় রাজার রক্ত পান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব প্রতি-দিন এক এক জন রাজকুমারকে রাজসিংহাসনে আসীন কর। সুবর্ণ-সূর্য্য-মণ্ডল-পরিশোভিত-ছত্রে তাঁহার মস্তক সুশোভিত হউক; চামর দ্বারা তদীয় অঙ্গের ব্যজন-কার্য্য সম্পন্ন হউক; রাজদণ্ড তাঁহার হস্তের শোভা বর্দ্ধন করুক্ এবং তিন দিন তাঁহার আদেশ দুর্লঙ্ঘ্য হউক্। চতুর্থ দিবসে তাঁহাকে শত্রু-সঙ্গে রণে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাহা হইলেই কেবল আমি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া থাকিতে পারি"।

সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দেবীর এই কঠোর আদেশ শুনিলেন। এতক্ষণে সকলের সন্দেহ-ভঞ্জন হইল। সামন্ত-বর্গ—সকলেই রাজকুমারগণের সহিত আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সকলেই এক বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দেহে প্রাণ থাকিতে তাঁহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন না।

আত্মোৎসর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এদিকে রাজকুমারগণের মধ্যে কে অগ্রে যাইবেন বলিয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। উর্শী জ্যেষ্ঠাধিকারক্রমে সর্ব্বাগ্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দাবী ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই রাজা করা হইল।

তিনি তিন দিবস কাল রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। সুবর্ণ-সূর্য্য তিন দিন সুবর্ণময় কিরণ মালায় তাঁহার অঙ্গ ভূষিত করিল, তিন দিন তদঙ্গোপরি রাজচামর ব্যজিত হইল। তিন দিন রাজদণ্ড তাঁহার দক্ষিণ করকে ভূষিত করিল। তিন দিন সকলেই অবনত মস্তকে তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিল। চতুর্থ দিবসে তিনি সদলে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া রাজসম্মানের সহিত জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। দ্বিতীয় রাজকুমার অজেয়শ্রী জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইবার অধিকার চাহিলেন। কিন্তু তিনি পিতার সবিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। সুতরাং তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে অগ্রগামী হইতে অনুমতি দিলেন। এইরূপে একে একে একাদশ রাজকুমার দেবীর প্রীতিবিধান মানসে তিন দিন রাজত্ব করিয়া চতুর্থ দিবসে রণস্থলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন। দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ-করণ-মানসে রাণা লক্ষ্মী চিতোর-রক্ষার্থ আপনাকে বলি দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সামন্তবর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে আত্ম-মনোরথ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু রাজার প্রাণোৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে সেই ভীষণ জহুর প্রথার অনুষ্ঠান চাই। চিতোরের মহিলাকুল জীবিত থাকিতে রাজার আত্ম-আহুতি দিবার অধিকার নাই। অগ্রে চিতোরের সম্ভ্রান্ত ললনাগণ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্ম-সম্মান রক্ষা করিবেন, তাহার পর রাজা সামন্তবর্গসহ আত্ম-আহুতি দিতে পাইবেন।

পদ্মিনী-সহ চিতোরের মহিলাগণের অগ্নি-প্রবেশ।

ঐ দেখ! ভূমধ্যস্থ অসূর্য্যম্পশ্য গৃহে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছে। ঐ দেখ! একে একে চিতোরের

সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ঐ যে মুকুটে শোভিত-শির সোণার প্রতিমা খানি আগে আগে চলিতেছেন, উনিই চিতোরের রাজমহিষী রাণা লক্ষ্মীর সহ-ধর্ম্মিণী। আর ঐ যে রূপে জগৎ আলোকিত করিয়া সঞ্চারিণী সৌদামিনীর ন্যায় রমণীরত্ন সর্ব্ব পশ্চাতে যাইতেছেন, উনিই সেই পদ্মিনী সতী, যাঁহার রূপে পাগল হইয়া যবন সম্রাট্ আলাউদ্দীন আজ্ চিতোরের পূর্ণ-ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। জগতে যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু কমনীয়, যাহা কিছু অতুলনীয়, যাহা কিছু মাধুর্য্য-ময়—সেই সমস্তের আধার এই চিতোর-সুন্দরীগণ সেই ভূগর্ভস্থ গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ডের উপরিতন আচ্ছাদন উদ্ঘাটিত হইল। অমনি সেই সতী-কুল সেই উদ্ঘাটিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন। সেই উদ্ঘাটিত ঢাকন নিমেষ মধ্যে তাঁহাদিগের উপর পতিত হইল্। তাঁহারা সর্ব্ব-সংহারী বিশ্বাবসুর ক্রোড়ে গিয়া যবনের অত্যাচার হইতে আত্ম-সম্মান রক্ষা করিলেন। ঐ দেখ! সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ হইতে ভস্ম রাশি ও ধূমপুঞ্জ উদ্গীরিত হইয়া জগতের অসা-রতা জানাইতেছে। আলাউদ্দীন! তুমি যাঁহার সৌন্দর্য্যে অন্ধ হইয়া আজ স্বর্ণপুরী চিতোরনগরীকে ভস্ম-স্তূপে পরিণত করিলে, ঐ দেখ! সেই সৌন্দর্য্যময়ী তোমায় ফাঁকী দিয়া আজ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ঐ দেখ! দীন-বন্ধু হরি স্বয়ং সারথি হইয়া অগ্নিময় রথে তুলিয়া চিতোর-সুন্দরীকে সঙ্গিনীগণ-সহ বৈজয়ন্ত-ধামে লইয়া গেলেন। ঐ শুন! তাঁহাদের সম্মাননার্থ তথায় দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে!

অজেয়শ্রীর প্রস্থান ও রাণার আত্ম-বিসর্জ্জন।

এক্ষণে একমাত্র জীবিত পুত্র অজেয়শ্রীর সহিত পিতার আত্ম-বিসর্জ্জন লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। শেষে পুত্রকে

পিতার আগ্রহাতিশয়ের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইল। অজেয়শ্রী পিতার আদেশানুসারে বীরবৃন্দসহ যবনব্যূহ ভেদ করিয়া অক্ষত শরীরে কৈলবারা নগরে নিরাপদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। বংশ রক্ষা হইল দেখিয়া, রাণা এক্ষণে নিশ্চিন্ত-মনে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইলেন। পত্নী, ভগিনী ও কন্যাগণের মৃত্যুতে তদীয় সামন্তবর্গও জীবনে মমতা-শূন্য হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও রাণার সহিত প্রাণোৎ-সর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সেই বীর দল দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সমতলক্ষেত্রে আসিয়া অব-তীর্ণ হইলেন। তাঁহাদিগের করাল অসির সম্মুখে যে আসিতে লাগিল, সেই শমন সদনে প্রেরিত হইতে লাগিল। যেমন মত্ত মাতঙ্গকুল বনস্পতিগণকে বিদলিত, উৎপাটিত ও উন্মূ-লিত করে, সেইরূপ সেই রণোন্মত্ত বীরবৃন্দ যবনকুল উন্মূ-লিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অকূল সেনাসাগরকে বিশোষিত করা এই নগণ্য বীর দলের পক্ষে অসম্ভব। এই ক্ষীণা ক্ষত্রস্রোতস্বিনী সেই যবনসেনাসাগরকে তরঙ্গতাড়িত করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে বিলীন হইয়া গেল। ক্ষত্রবহ্নি যবনসাগরের জলে নির্ব্বাপিত হইল! এত দিনে চিতোর নিষ্প্রদীপ হইল! চিতোর নগরীতে একটী বাতি জ্বালিবার জন্যও একটী লোক রহিল না। যবন সম্রাট্ সেই অচেতন-পুরী দখল করিলেন। যে সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই লোম-হর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত করিলেন, সেই সৌন্দর্য্যময়ীর চিতাভস্ম হইতে এখনও ধূমপুঞ্জ উদ্গীরিত হইতেছে। তাঁহার কাম-নার বিষয় এখন ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে।

আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর গ্রহণ

সে ভীষণ স্থানে এখন যায় কাহার সাধ্য? মানবচক্ষু আজও পর্য্যন্ত সে গহ্বরে প্রবেশ করে নাই। এক প্রকাণ্ড

অজাগর সেই স্থানের প্রহরী হইয়া আজও দর্শকগণের গতিরোধ করিয়া আছে। যদি কোন নির্ভীক ভ্রমণকারী আলোক লইয়া সেই প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন সতীকুণ্ডে গমন করিতে উদ্যত হন, অমনি সেই অজাগর ফুৎকার দ্বারা সেই আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। সুতরাং সেই অবধি এই সতীকুণ্ড মানব-পদ-দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই।

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিখ্যাত নগরী আলাউদ্দীনের করতলস্থ হয়। যবনরাজ চিতোরের প্রতিবিন্দুতে রাজপুতের মৃতদেহ বিদলিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অভীপ্সিত বিষয়ে বিফল-মনোরথ হইয়া তিনি আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাণিজগৎ কুক্ষিগত করিয়া তাঁহার পিপাসা মিটে নাই। তিনি এক্ষণে জড় জগতের উপর তাঁহার প্রতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চিতোরের অপূর্ব্ব মন্দির ও শিল্প-কীর্ত্তি-স্তম্ভ সকল তাঁহার আদেশে উন্মূলিত হইতে লাগিল। জড় জগতে ও শিল্প রাজ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর—সে সমস্তই তাঁহার আদেশে বিনষ্ট হইল। কেবল রাণা ভীম ও তদীয় পত্নী পদ্মিনী সতীর প্রাসাদ অক্ষুণ্ণ রহিল! সে পাষাণে এ কোমল ভাবের আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল জানি না! অবশেষে তিনি সেই ভগ্নপুরী যালোরপতি মল্ল-দেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া সসৈন্য নিজ রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন। আজ অমরপুরী শ্মশানপুরীতে পরিণত হইল!

রাণা অজেয়শ্রী ও রাণা হাম্মীর।

চিতোরের পুনরুদ্ধার।

রাণা অজেয়শ্রী কৈলবারা নগরে গিয়া পৌঁছিলেন। এই পার্ব্বত্য নগর আরাবলী গিরিমালার মধ্যভাগে অবস্থিত। আরাবলী গিরিমালা মিবারের পশ্চিম সীমা।—এই গিরিমালার

সাহায্যেই মিবারের রাণাগণ দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে গিরি-মালা-পরিবেষ্টিত মধ্যে গিরিনির্ঝরণীবৃন্দ-বিধৌত-ফলপুষ্প-পরিশোভিত শস্য শ্যামল ও শাদ্বল—এই অধিত্যকা প্রদেশ যেন ইন্দ্রের নন্দন কানন বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করে। কাশ্মীরের নিম্নে ভারতের আর কোন স্থান এরূপ রমণীয় নহে। অজেয়শ্রী এই রম্য গুহাপ্রদেশে অনুগত সামন্তবর্গসহ ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রাজ্যাধিকারী করিয়া পিতা তাঁহাকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তিনি শত বর্ষকাল রাজ্যভোগ করিয়া মৃত্যু-কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে যেন রাজ-সিংহাসন দিয়া যান। অজেয়শ্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উর্শীর পুত্রের নাম হামীর। অজেয়শ্রীর নিজ পুত্রগণ নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন। এদিকে হামীর বীর্য্যে ও মহাপ্রাণতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে অজেয়শ্রী তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। এই হামীরই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্যই যেন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদ্বারাই পিতৃপৈতামহিক রাজধানী চিতোর নগরী ও তদীয় বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধৃত হইবে। ইহাঁর জন্ম ও আদি জীবন বিচিত্র ঘটনাজালে পরিপূর্ণ। পাঠক! তোমার কৌতূহল নিবারিত করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিতেছি। হামীরের পিতা উর্শী একদা কতিপয় যুবা সামন্ত-তনয় সমভিব্যাহারে ওন্দবা অরণ্যে মৃগয়ায় বিনির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহারা একটী বন্য বরাহের অনুসরণ করিতে করিতে এক শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বরাহকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এক বীরা রমণী তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি উক্ত শস্যের একটী ডাঁটা কাটিয়া তাহার

অগ্রভাগ দ্বারা শস্যক্ষেত্রমধ্যে বরাহের গতি নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। এই শস্য প্রায় আট নয় হাত উচ্চ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি শস্য-রক্ষণ-মঞ্চের* উপর দণ্ডায়মান হইয়া বরাহের আবর্ত্তন স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি সম্ভ্রান্ত শিকারিগণ বরাহ বিদ্ধ করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি স্বয়ং উহাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ঠেলিয়া লইয়া গেলেন, এবং বিদ্ধ বরাহকে রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়াই সহসা অন্তর্হিতা হইলেন। যেন বিদ্যুল্লতা সহসা নয়ন ঝলসিয়া গগণে বিলীন হইয়া গেল। যদিও রাজপুতগণ আপনাদের রমণীগণের এরূপ বীরত্ব সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন, তথাপি রাজকুমার ও তৎসহচরবৃন্দ সেই রমণীর এই অদীন পরাক্রমে বিস্মিত হইলেন। রমণীর শৌর্য্য, বীর্য্য ও রূপলাবণ্যে উর্শীর চিত্ত সবিশেষ আকৃষ্ট হইল। তিনি মনে মনে তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন। আপাততঃ তাঁহার কোন উদ্দেশ না পাওয়ায় তাঁহারা সেই বন্যবরাহমাংস সমীপবর্ত্তিনী নির্ঝরিণীর তীরে লইয়া গিয়া পাক করিলেন, এবং পাক সমাপনান্তে সেই পূত মাংস ভক্ষণ করিলেন। আহারান্তে তাঁহারা সেই বীরা রমণীর শৌর্য্য বীর্য্যের প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময় সহসা ধনুঃপ্রক্ষিপ্ত একটী মৃণ্ময় গুলি আসিয়া যুবরাজের অশ্বের এক খানি পা ভগ্ন করিয়া ফেলিল। সকলে বিস্মিত ও চকিত হইয়া প্রথমে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে যে দিক হইতে গুলি আসিল, সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, সেই বীরা রমণীই

* ক্ষেত্রের মধ্যভাগে চারিটী খোঁটা পুতিয়া তাহার উপর একটী মাঁচা বাঁধা হয়। এই মাঁচার উপর দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রস্বামী বা তৎপুত্র বা তৎকন্যা বা তদীয় ভৃত্য ধনুঃহস্তে খেচর ও ভূচর জীবজন্তু হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া থাকেন।

সেই ক্ষেত্র-রক্ষণ-মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ধনুকে গুলি যোজনা করিয়া বিহঙ্গম-কুলের অত্যাচার হইতে সেই শস্য-ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতেছেন। রমণী সেই সম্ভ্রান্ত যুবকগণের মুখ-ভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার গুলিতে তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি সেই উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ক্ষতি করণ জন্য ক্ষমা চাহিলেন। ক্ষমা চাহিয়াই রমণী দ্রুতপদে আবার সেই উচ্চ স্থানে উঠিয়া নিজ কার্য্যে রত হইলেন। সম্ভ্রান্ত যুবকবৃন্দ ও আবার মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত দিবস মৃগয়া করিয়া তাঁহারা যখন গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন, তখন আবার সেই রমণী তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এবার অন্য মূর্ত্তিতে। তাঁহার মস্তকে দুগ্ধ-পূর্ণ ভাণ্ড, ও দুই হস্তে দুই মহিষতাড়নদণ্ড, এবং সেই তাড়ন-যষ্টিদ্বয়ের সম্মুখে দুই নবীন নধর মহিষ গম্যমান। যুবকবৃন্দের মনে সহসা একটী কৌতুক করিবার ইচ্ছা উদিত হইল। ইচ্ছা হইল যে তাঁহারা দুগ্ধ ভাণ্ডটী ফেলিয়া দেন। এই অভিপ্রায়ে সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বেগে অশ্ব চালিত করিয়া রমণীর গাত্রে গিয়া ধাক্কা দিলেন। দুগ্ধ-ভাণ্ড বিচালিত হওয়ায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পড়িয়া গেল। কিন্তু রমণী কোন প্রকার বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ না করিয়া একটী মহিষকে সঙ্কেত করিলেন। সুশিক্ষিত মহিষ সঙ্কেতমাত্রে শৃঙ্গে অশ্বের পা বাধাইয়া আরোহীকে ভূপাতিত করিল। রমণীর নির্ভীকতা, অবিচলিততা, শিক্ষাকৌশল, ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া যুবক-দল বিস্মিত হইলেন। যুবরাজ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে রমণী চন্দনবংশীয় কোন দরিদ্র রাজপুতের কন্যা। চন্দনবংশ চোহানবংশের একটী শাখা। সুতরাং যুবরাজ বুঝিলেন উক্ত কন্যা তাঁহার বিবাহযোগ্যা। এই পর্য্যন্ত জানিয়াই যুবরাজ সেদিন রাজধানী চলিয়া গেলেন।

পরদিন তিনি মৃগয়া-ব্যপদেশে আবার সেই প্রদেশে আগমন করিলেন, এবং আসিয়া উক্ত রমনীর পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্ষত্রবর আসিয়া নির্ভীকচিত্তে ও স্বাধীনভাবে যুবরাজের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যুবরাজের সহচরবৃন্দ ইহা দেখিয়া সবিশেষ কৌতুক করিতে লাগিলেন। যুবরাজ এই সুযোগে রমণীর পিতার নিকট তদীয় কন্যার পাণিগ্রহ-ণের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন প্রবয়াঃ রাজপুত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে সকলে আরও বিস্মিত হইলেন। আজ মিবারের যুবরাজ একজন দরিদ্র রাজপুতের কন্যার পাণি-গ্রহণাভিলাষী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? সকলেই এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় সেই বৃদ্ধ রাজপুত আবার ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বাটীতে গিয়া গৃহিণীকে সবিশেষ জ্ঞাত করায় তাঁহার নিকট অত্যন্ত তির-স্কৃত হইয়াছিলেন। "কত শত রাজকুমারী যাঁহার পাণিগ্রহণা-ভিলাষিণী হইয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন আজ সেই মিবা-রের যুবরাজ স্বয়ং দরিদ্র রাজপুতের কন্যার পাণিগ্রহণাভি-লাষী হইয়া দণ্ডায়মান, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তুমি এখনই গিয়া যুবরাজের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির কর। আমি তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব"— বুদ্ধিমতী পত্নীর এই তিরস্কারবাক্যে রাজপুতের চৈতন্য হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া যুবরাজকে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। উভয় পক্ষের সম্মতির পর যুবক যুবতী সেইখানেই পরিণীত হইলেন। নব দম্পতী কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেন। পিতার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করায় যুবরাজ নবপরিণীতা ভার্য্যাকে

পিতৃ-সদনে লইয়া যাইতে সাহস করিলেন না। তিনি তাঁহাকে তদীয় পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিলেন।

উভয়ের এই প্রেম-মিলনের ফল হামীর। হামীর জননী-সহ মাতামহালয়েই লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। রাণা লক্ষ্মী ঈষৎ বিরক্ত হইয়া হামীর ও তদীয় জননীকে একেবারেই চিতোরে আনিলেন না। সুতরাং হামীর বীরা জননীর আদর্শেই গঠিত হইতে লাগিলেন। পিতা মাতা যাঁহার বীরত্বের আদর্শ, তিনি যে বীর হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যৎকালে চিতোর আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়, তখন হামীরের বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

রাণা হামীর।

মুণ্ডামুণ্ডরক্তে তদীয় রাজটীকা।

চিতোরের পতনের পর মিবারের সমস্ত দুর্গগুলি ক্রমে ক্রমে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যে পরিপূরিত হইল। অজেয়শ্রী সুতরাং সেই গুহা প্রদেশেই অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন। এদিকে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের সামন্তগণের সহিত ও তাঁহার বিবাদ বাধিয়া উঠিল। এই পার্ব্বত্য শত্রুগণের মধ্যে মুঞ্জাবলৈচা স্বয়ং সসৈন্য সেই গুহা প্রদেশে গিয়া রাণা অজেয়শ্রীর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন, এই যুদ্ধে সেই অসুরবরের বর্শাঘাতে রাণার মস্তক ক্ষত বিক্ষত হয়। রাণার দুই পুত্র—সুজনশ্রী ও অজিনশ্রী—যদিও ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি এই সঙ্কটকালে ক্ষত্রিয়োচিত বলবীর্য্য দেখাইতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং এই বিপদকালে রাণা অজেয়শ্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরবর হামীরকে মাতামহালয় হইতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। দ্বাদশ-বর্ষীয় ক্ষত্রিয় বালক আসিয়া খুল্লতাতের চরণ বন্দন করিলেন, এবং

তাঁহার শক্রর দর্প চূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। খুল্লতা-তের নিকট বৈরনির্য্যাতনে প্রতিশ্রুত হইয়া বীরবর হামীর শক্র-রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই অশ্বপার্শ্বে মুঞ্জার মস্তক ঝুলাইতে ঝুলাইতে রাণার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই মুঞ্জামুণ্ড রাণার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন—এবং বলিলেন "পিতঃ! এই আপনার শক্র মস্তক কিনা চিনিয়া লউন্।" রাণা অজেয়শ্রী আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া নীরবে ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখ-চুম্বন করিলেন, এবং বুঝিলেন বিধাতা তাঁহাকেই তদীয় উত্তরাধি-কারী এবং মিবারের উদ্ধারকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহা বুঝিয়া তিনি সেই রুধিরাক্ত শক্র-মুণ্ড হইতে রক্ত লইয়া হামী-রের ললাটে অঙ্গুলি দ্বারা রাজচিহ্নস্বরূপ টীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। এই কার্য্য দ্বারাই তিনি হামীরকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিলেন। এই ঘটনায় অজিনশ্রী ভগ্নহৃদয় হইয়া কৈল-বারা নগরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। পাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুজনশ্রী কোন এক অন্তর্ব্বিপ্লব উত্থাপিত করেন, এই ভয়ে রাণা অজে-য়শ্রী তাঁহাকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিলেন*।

---

* এই সুজনশ্রীই প্রখ্যাতনামা সেতারা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবজীর আদি পুরুষ।

	১। অজেয়শ্রী।	৭। উগ্রসেন।	১৩। শিবজী মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা।
পুত্র	২। সুজনশ্রী।	৮। মাহলজী।	
	৩। দলীপজী।	৯। খৈলুজী।	১৪। শাম্ভজী।
	৪। শিবজী।	১০। জুঙ্কোজী।	১৫। রামরাজা—ইঁহার পর এই রাজ্য পেশওয়া বংশে সংক্রামিত হয়।
	৫। ভোরাজী।	১১। সত্যজী।	
	৬। দেবরাজ।	১২। শাম্ভজী।	

রাণা হামীরের অলৌকিক বীরত্ব।

১৩৫৭ শক বা ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে হামীর মিবারের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি চতুঃষষ্টী বৎসর এই সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার এই সুবিস্তৃত রাজত্বকাল নিরন্তর শত্রু বিমর্দ্দে অতিবাহিত হয়। তাঁহার অবিরাম যত্নে তদীয় দেশ অতীত শতাব্দীর ধ্বংস হইতে পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। যে চিতোরনগরী হইতে তাঁহার খুল্লতাত তাড়িত হইয়া গিরিগুহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে চিতোর নগরীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নরমেধযজ্ঞে বলি পড়িয়াছিলেন, সেই চিতোর নগরীতে তদীয় পতাকা আবার সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইয়াছিল। যে মিবার রাজ্যের সমস্ত দুর্গ শত্রু হস্তগত হইয়াছিল, একে একে মিবারের সেই সমস্ত দুর্গ তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল। তাঁহার আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, বিরাম ছিল না—এক স্বদেশের উদ্ধার চিন্তায় তাঁহার দিন যামিনী অতিবাহিত হইত। প্রবল যবন-শক্তির সম্মুখে এই মহাপুরুষ কিরূপে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন তাহার সবিস্তর নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মিবারের রাজপুত জাতির মধ্যে টীকা-যৌতুক নামে একটী প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। এই প্রথা অনুসারে রাজটীকা পরার দিন নব রাণাকে টীকা ধারণের পর কোন শত্রু-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন অসাধারণ বীরত্বের কার্য্য করিতে হয়। যদি সীমান্ত প্রদেশে কোন শত্রু না থাকে, তাহা হইলে কোন উদাসীন রাজার সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়াও কোন শৌর্য্য বীর্য্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত করিতে হয়। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া মিবারের রাণারা রাজ্যাভিষেক দিবসে সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রু-দুর্গ অধিকার বা শত্রু নগর লুণ্ঠন করিয়া বিজয়-লব্ধ দ্রব্যাদি সমভিব্যাহারে নিজ রাজধানীতে

প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। আজ নব রাণা হামীর ও এই প্রথানুসারে রাজচিহ্নস্বরূপ টীকাধারণের পর অনুযাত্রিক সহ বালৈচ নামক অত্যাচারী রাজার রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পসালিয়ো নামক গৈরিক দুর্গ অধিকার করিয়া নিজ ভবিষ্য জীবনের নমুনা দেখাইলেন। সেই বালকের এই বীরত্ব দেখিয়া শত্রুমণ্ডলীর হৃদয় ভয়ে অভিভূত ও বন্ধুবর্গের মন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। শত্রু মিত্র সকলের নয়ন সেই নবোদিত সূর্য্যের দিকে যুগপৎ নিপতিত হইল।

হামীরের গরিলা যুদ্ধ-প্রণালী।

অজেয়শ্রীর স্বর্গারোহণের পর হইতেই বীরবর হামীরকে যে অসি নিস্কোশিত করিতে হইয়াছিল, তাঁহার জীবিত কালে সে অসি আর স্বকোশে প্রবিষ্ট হয় নাই। মল্লদেব এই সময় চিতোরের দুর্গেই অবস্থিত আছেন; এবং মিবারের অন্যান্য দুর্গে যবন সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। হামীর দেখিলেন পিতৃপৈতামহিক রাজ্যের ভিতরে পদার্পণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু স্বদেশের উদ্ধারব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীরের হৃদয়ে কখন ভয়ের সঞ্চার হয় না। তিনি এই আপাত-দর্শনে অসম্ভব কার্য্যে নির্ভীকচিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মুখ সংগ্রামে যবন সেনার সম্মুখীন হইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই দেখিয়া, তিনি গরিলা বা অনিয়মিত যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিলেন। তাঁহারই আদর্শে ভবিষ্যতে প্রতাপও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া মিবারের সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিয়া ঝটিতি অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। যবন-সৈন্য সাজিয়া গুজিয়া রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি

তাহাদের গ্রাস হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি মিবারের প্রজাবৃন্দকে সমতল ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক প্রদেশে গিয়া বসতি করিতে আদেশ দিলেন। যাহারা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইতে লাগিল, তাহা-দিগকে শত্রুসঙ্গে ধ্বংসপুরীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তদীয় সৈন্যগণ অসংখ্য ক্ষুদ্রদলে বিভক্ত হইয়া গুপ্তি স্থান হইতে সহসা বিনির্গত হইয়া সম্মুখে যাহা পাইতে লাগিল তাহাই লুটপাট করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এই-রূপে মিবারের পথ ঘাট মাট পথিকগণের অগম্য হইয়া উঠিল। উক্ত সৈন্যদলগুলি আরাবলী গিরিমালার নিভৃত গুহাপ্রদেশ হইতে বহির্গত, এবং মিবারের সমতল ক্ষেত্রে ধ্বংস বিস্তার করিয়া তীরবেগে আবার সেই সূর্য্যের ও অগম্য স্থানে আসিয়া লুক্কায়িত হইয়া থাকিত। যবন সেনা এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের নিরন্তর অনুসরণে ক্রমে ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহারা অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে লাগিল এবং অবশেষে হঠাৎ আক্রমণকারীদিগের ভয়ে তাহারা দুর্গের বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিল। প্রজাবৃন্দ অবশেষে নিরু-পায় হইয়া গৃহ ও ক্ষেত্রের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সপরিবারে সেই আরাবলীর গুহা প্রদেশে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। কৈলবারা নগরী ক্রমে ইন্দ্রের অমরাবতীতে পরিণত হইল। এদিকে স্বর্ণ রাজ্য মিবার ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইল। আজ হামীর নিজ রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রজাবৃন্দ-সহ যেমন দুর্গম-গিরি-গুহায় আশ্রয় লইলেন, এবং তথা হইতে সুবিধা-মত সমতলক্ষেত্রে নামিয়া যেমন শত্রুগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এইরূপ গেরিলা যুদ্ধ-প্রণালী দশম শতা-ব্দীতে গজনীপতি মামুদের ভারত-আক্রমণ হইতে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেষ দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ পর্য্যন্ত—সমস্ত যাবনিক কালে হিন্দুরাজগণকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়া আসিতেছিল,

যাঁহারা যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা মহারত্নে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহারা এক প্রকার আপাত-সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু যাঁহারা স্বাধীনতা ধনকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বোধ করিলেন, তাঁহাদিগের জীবন এইরূপে নিরন্তর শত্রু সংঘর্ষে অতিবাহিত হইতে লাগিল। স্বাধীনতার কণ্টক-বিকীর্ণ পথ তাঁহাদিগের নিকট পুষ্প-বিকীরিত বলিয়া বোধ হইল। নিরন্তর সমর তাঁহাদিগের নিকট প্রমোদ-নৃত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

ভারতের মহাশক্তি চতুষ্টয়।

এই নিরন্তর শব-সাধনার ফলে ভারতে ক্রমে ক্রমে চারিটী মহাশক্তি প্রাদুর্ভূত হয়। প্রথম, রাজপুতনায় আর্য্য-শক্তি, দ্বিতীয়, আর্য্য ও অনার্য্য শক্তিদ্বিতয়সমবেত মহারাষ্ট্রে মহাশক্তি, তৃতীয়, আর্য্য অনার্য্য ও যবন শক্তি ত্রিতয়সমুদ্ভূত পঞ্চনদে মহামহিম শিখ শক্তি, এবং চতুর্থ, পূর্ব্বতন শক্তিত্রিতয়-সমবেত মহামহিমান্বিত সিপাহিশক্তি। রাজপুতানায় যে শক্তি যবন-শক্তিকে দমিত করে, তাহা অবিমিশ্রিত আর্য্যশক্তি। কিন্তু মহারাষ্ট্রে ক্ষত্রিয়প্রবর শিবজী যে শক্তি লইয়া যবন-শক্তি রবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন তাহা আর্য্য ও অনার্য্য উভয় শক্তির সমবায়ে গঠিত এক মহাশক্তি। কারণ শিবজী স্বয়ং মিবারের রাজবংশসমুদ্ভূত ছিলেন বটে এবং তদীয় বংশের চিরন্তন মন্ত্রীগণ প্রখ্যাতনামা পেশোওয়াগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু তদীয় ও তদ্বংশের বিখ্যাত সেনাপতিগণ অনেকেই অনার্য্য-বংশসম্ভূত বা আর্য্য ও অনার্য্য উভয়-বংশসম্ভূত ছিলেন। তৃতীয় মহা-শক্তির স্রষ্টা গুরুগোবিন্দ সিংহ। তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয়-বংশ সম্ভূত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি যে প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহা আর্য্য অনার্য্য ও যবন শক্তির সংমিশ্রণে গঠিত এক বিরাট্

শক্তি। এই মহাশক্তি একদিন যবন-শক্তিকে কুক্ষিগত করিয়া বিরাট মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক ব্রিটন্ শক্তিকেও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যে বিশ্বাস ঘাতকতার কুহকজালে পড়িয়া আর্য্য-শক্তি-মীন একদিন যবনজালুকের হস্তগত হইয়াছিল, সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার জালে বিদ্ধ হইয়া শিখমহাশক্তি-মীন ও আজ ভারতের ভাগ্য-দোষে শ্বেত জালুকের করতলস্থ হইয়াছে। আবার আর্য্য অনার্য্য ও যবন শক্তি সমবেত হইয়া যে সিপাহী রূপ মহাশক্তি উদ্ভূত হইল, বিধির নির্ব্বন্ধে সে শক্তিও ব্রিটন্ শক্তির কুক্ষিগত হইল। সেই শক্তির অভাবে ভারত এখন প্রাণহারা হইয়া পড়িয়া আছে! ইন্দ্রপুরী যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে!! বিদ্যুদ্দণ্ড যেন বেগ-শূন্য হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছে!!! সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবানই জানেন, কবে তিনি এই অচেতনে চেতনা সঞ্চারিত করিবেন? কবে তিনি এই নির্জ্জীব ভারতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন?

মিবারের দুরবস্থা।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক্। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হামীর কৈলবারা নগরীতেই নিজ রাজধানী স্থাপন করিলেন। ক্রমে মিবারের সমতল ভূভাগ হইতে প্রজাবৃন্দ উঠিয়া আসিয়া এই রাজধানীতে বসতি করিতে লাগিল। কৈলবারার অবস্থান সর্ব্বাংশেই অতি সুন্দর। চতুর্দ্দিকে আরাবলী গিরিমালা ইহাকে যেন প্রাকার-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। যে গুহাপথ দিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা এত সংকীর্ণ যে শত্রুসৈন্য তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সাহস করে না। কারণ সেখানে সৈন্যের সংখ্যাবাহুল্যে কোন ফলোদয় হইবে না। কৈলবারা উক্ত গিরিমালার পাদদেশে অবস্থিত। এই পাদদেশ ধরিয়া আর একটী অতি দুর্গম গুহাপ্রদেশে প্রবেশ করা যায়। এই দুর্গমতর গুহাপ্রদেশে

কমলমীর নগর অবস্থিত। এই দুই গুহাপ্রদেশের মধ্য দিয়া নির্ম্মল-সলিলা নির্ঝরিণীসকল প্রবাহিত হইতেছে। ফল-ভরে অবনত বনস্পতিগণ ইহাদের সুষমা বর্দ্ধিত করিতেছে। সুন্দর শাদ্বল ক্ষেত্র সকলে গোমেষাদি চতুস্পদগণ তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। আরণ্য মহীরুহসকল গৃহস্থগণকে ইন্ধন সংযোজিত করিতেছে। উর্ব্বর ও হলকৃষ্ট ক্ষেত্রসকল শস্য ও মূলে অধিবাসি-বৃন্দের আহার যোজনা করিতেছে। গুহাপ্রদেশের বিস্তার পঞ্চাশ মাইলের অধিক। ইহা মিবারের সমতল-ক্ষেত্র হইতে দুই শত পাদ এবং সাগর বক্ষ হইতে ত্রিসহস্র পাদ উচ্চে অবস্থিত। ইহাতে কর্ষণোপযোগী ভূমি যথেষ্ট আছে। তাহা হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন মিবারের সমতল-ক্ষেত্র, গুজরাট দেশ, ও ভিলদিগের রাজ্য হইতে শস্যাদি আমদানী করিবার সুগম পথ আছে। সুতরাং অধিবাসিবৃন্দের কোন প্রকারই কষ্ট ছিল না। এদিকে অনুকূল বন্ধু ভিলগণ হামীরকে যুদ্ধের সময় পঞ্চ সহস্র ধনুর্ধর ও অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী সংযোজন করিত। এবং তাঁহারা যখন যুদ্ধার্থ সসৈন্য সমতল-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তাহারা তাঁহাদিগের পরিবার-বর্গের রক্ষক হইয়া থাকিত। এদিকে প্রাচ্য অরণ্যানীমধ্যেও অনেক নিভৃত স্থান আছে যথায় তাঁহারা বিপদকালে আশ্রয় লইতে পারেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের অনুসরণের বিরাম নাই। তিনি প্রতিনিয়তই হামীরের অনুসরণে ফিরিতেন। প্রত্যেক গিরিগুহা ও প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গ এবং প্রত্যেক অরণ্যানী তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার গুপ্তিস্থান আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মল্লদেব কর্ত্তৃক বিধবা কন্যা সম্প্রদান।

এদিকে মিবারের সমস্ত সমতল-ক্ষেত্র কর্ষণাভাবে নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইল। সমস্ত গৃহ অধিবাসি-বিরহে হিংস্র জন্তুগণের আবাসভূমি হইয়া উঠিল। হামীরের সৈন্যগণের লুণ্ঠনভয়ে শিল্পবাণিজ্য পরিত্যক্ত হইল। মিবারের এই ঘোর দুর্দ্দশার সময় চিতোরের শাসনকর্ত্তা মল্লদেবের কন্যার সহিত হামীরের বিবাহের প্রস্তাব আসিল। হামীরের অমাত্য ও সামন্তবর্গ এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন হামীরকে কোন বিপদজালে জড়িত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা তাঁহাকে চিতোরে লইয়া গিয়া কোন প্রকারে অপমানিত করিবার উদ্দেশে এই ষড়যন্ত্র হইয়াছে। ইহা বুঝিয়া তাঁহারা রাণাকে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বীরের হৃদয় ভীতির অগম্য। চিতোরের নামে হামীরের মন নৃত্য করিত। তিনি এই উপলক্ষে সেই পিতৃপৈতামহিক রাজধানীতে একবার পদার্পণ করিয়া জীবনের সাধ মিটাইবেন, এবং যদি সুবিধা করিতে পারেন ইহা পুনরাধিকার করিতে চেষ্টা করিবেন, এই আশায় সমস্ত বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। বিবাহের প্রস্তাব করিয়া সম্বন্ধের যৌতুকস্বরূপ যে নারিকেল প্রেরিত হইয়াছিল তিনি তাহা রাখিতে আদেশ দিলেন। দূতেরা প্রস্তাব গৃহীত হইল জানিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর হামীর অমাত্য ও সামন্তবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে—"চিতোরে যে প্রস্তরময় সোপানাবলী আমার পূর্ব্বপুরুষগণের চরণরেণুতে পূত হইয়াছিল, আমি জীবনের মধ্যে একবার অন্ততঃ সেই সোপানাবলীতে পদার্পণ করিব। রাজপুত মাত্রেরই বিপদের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। একদিন বা তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত শরীরে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে; আবার আর একদিন হয়ত

তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় রাজসিংহাসনে বসিয়া মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিতে হইবে”। অমাত্য ও সামন্ত-বর্গ হামীরের এই সার-গর্ভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নীরব হইলেন, এবং প্রস্তাবিত বিবাহে আর বাধা দিলেন না।

মল্লদেব প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে পঞ্চশত অশ্বা-রোহী-সহ রাণাকে চিতোরে প্রবেশ করিতে হইবে। সেই প্রস্তাব অনুসারে হামীর পঞ্চশতমাত্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া চিতোর যাত্রা করিলেন। তিনি চিতোর দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলে মল্লদেবের পঞ্চপুত্র তাঁহার সম্মানার্থ অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হামীর দুর্গদ্বারের সম্মুখে বিবাহচিহ্নস্বরূপ কোন তোরণ দ্বার নির্ম্মিত হয় নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ও মল্লদেবের পুত্রগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহাতে হামীরের তৃপ্তিকর প্রতীতি জন্মিলনা। ইহার অভ্যন্তরে কোন প্রকার বিশ্বাস-ঘাতকতা বিদ্যমান আছে অনুমান করিয়াও হামীর পশ্চাদ্‌পাদ হইলেন না। তিনি জীবনের মধ্যে এই প্রথম চিতোরদুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কত কত ভাবতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে আজ তাঁহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। যে রত্নময় দালানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণ রাজদরবার করিতেন, সেই বিচিত্র ও প্রকাণ্ড দালানে আজ রাও মল্লদেব, তদীয় পুত্র বনবীর, ও অন্যান্য সামন্তগণ তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। একে একে সকলেই তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পর অভিবা-দনের পর পাত্রী বিবাহসভায় আনীতা হইলেন। কোন প্রকার সম্প্রদানিক মন্ত্রপাঠ বা কোন প্রকার বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠিত হইলনা। কেবল মল্লদেব বরকন্যার গ্রন্থিবন্ধন * ও

* গ্রন্থি বন্ধনের সাধারণ নাম গাঁইটছাড়া বাঁধা। অর্থাৎ কন্যার বস্ত্রের কোণের সহিত পাত্রের উত্তরীয়ের কোণ বাঁধিয়া দেওয়া।

পাণিসংযোজন * করিয়া পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কুলপুরোহিত উভয়কে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। নবদম্পতী বিবাহের পর এক নিভৃত ও নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে গমন করিলেন। বিবাহ সভাও ভঙ্গ হইল। হামীর সেই নিভৃত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নবপরিণীতাভার্য্যার নিকট অবগত হইলেন যে তিনি মল্লদেবের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। হামীর এই সংবাদে ক্রোধে ও অবমানে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পত্নীর কাতর বচনে ও আত্মোৎসর্গে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। এই পতিপ্রাণা রমণী অতি শৈশবে ভট্টিজাতীয় এক সামন্তের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরে তাঁহার স্বামী যুদ্ধে গিয়া প্রাণ হারান। সুতরাং সেই পূর্ব্বস্বামীর স্মৃতি পর্য্যন্ত ও তাঁহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ তিনি প্রাণ মন ও জীবন সমস্তই হামীরের চরণে উৎসর্গ করিলেন। আজ তিনি পতির জন্য পিতৃকুল বিসর্জ্জন দিলেন।

এই পরিণয়ের ফল।

পিতা তাঁহার পতির সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছেন বলিয়া তিনি পতির নিকট লজ্জিতা হইলেন, ও তাহার জন্য ক্ষমা চাহিলেন। তিনি কিরূপে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে হইবে স্বামীকে তাহার উপদেশ দিয়া স্বামীর অন্তর হইতে সমস্ত দুঃখ দূর করিলেন। তিনি বলিলেন এই বিবাহ হইতেই তিনি ভবিষ্যতে-চিতোর ও মিবাররাজ্য লাভ করিতে পারিবেন। পত্নীর এই সান্তনাবাক্যে

* পাণি সংযোজন—কন্যার পাণির সহিত বরের পাণি মিলিত করা।

হামীর পরম প্রীতি লাভ করিলেন। পরিণয়ের যৌতুক-স্বরূপ কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করায় অধিকার আছে। আজ পত্নীর উপদেশমত হামীর শ্বশুরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে মেহতাবংশীয় জল নামক কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের সহিত পাঠাইতে হইবে। শ্বশুর জামাতার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; নব দম্পতী এই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ-সহ কৈলবারা পুরীতে গমন করিলেন। যুবক যুবতীর প্রেম সম্মিলনের ফল-স্বরূপ কায়স্থী নামে এক পুত্র সন্তান জন্মিল। মল্লদেব এই শুভ ঘটনায় প্রীত হইয়া সমস্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশ হামীরকে প্রত্যর্পণ করিলেন। পুত্র এক বৎসর বয়স্ক হইলে রাজমহিষী পিতা মাতার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি পুত্রের দুর্দ্দৈব শান্তির জন্য চিতোরে গিয়া পুত্রকে দেবী-মন্দিরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। পিতামাতার অনুমতি-ক্রমে রাজমহিষী সেই শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া পিতা-মাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত অল্পসংখ্যক অনুযাত্রিকসহ চিতোর যাত্রা করিলেন। এই সময় মল্লদেব সসৈন্য মদীরা প্রদেশের অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। যে সকল সৈন্যের উপর নগর রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল চিতোরপ্রবেশ করিয়াই রাজনন্দিনী পূর্ব্বোক্ত মেহতা কর্ম্মচারীর সাহায্যে তাহাদিগকে হস্তগত করিলেন। এদিকে হামীর ও সসৈন্য বাগোর নগরে সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে—পত্নীর নিকট হইতে এই সংবাদ আসিবামাত্র তিনি সসৈন্যে চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনি চিতোরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং চিতোরদুর্গদ্বারে তাঁহার গতি প্রতিহত হইল। কিন্তু সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? হামীর-বাহিত সেই ক্ষুদ্র সেনা প্রচণ্ডবেগে চিতোর-দুর্গ মধ্যে লব্ধ-প্রবেশ হইল। বহুদিন পরে আবার সেই

সুবর্ণ সূর্য্য-মণ্ডল-পরিশোভিনী মিবারের রক্তধ্বজা চিতোরের দুর্গচূড়া হইতে উড়িতে লাগিল! সমস্ত বাধা সমস্ত বিপত্তি যেন কোথায় উড়িয়া গেল! আজ সমস্ত মিবারবাসী আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিল! ক্রমে ক্রমে সামন্তগণ সকলেই আসিয়া রাণার নিকটে বশ্যতাসূচক শপথ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হামীরের অনুগত প্রজাবৃন্দ এই শুভ সংবাদ শ্রবণমাত্র সেই গৈরিক আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন পরিত্যক্ত ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কমলমীর ও কৈলবারা নগরদ্বয় এবং আরাবলী গিরিমালার অধি-ত্যকা প্রদেশ হইতে জনস্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মিবারের পরিত্যক্ত সমতল-ভূমি কণ্ঠে ধনজনপূর্ণনগরমালা ধারণ করিল। মরুভূমি যেন স্বর্ণপুরীতে পরিণত হইল! যে সকল পথ ঘাট এতদিন লুণ্ঠনকারী সৈন্যগণের উপদ্রবে দিবসেও পথিকগণের অগম্য ছিল এখন সে সকল পথ ঘাট রজনীতেও লোক জনের সুগম্য হইয়া উঠিল। যে সকল পরিত্যক্ত গৃহমণ্ডলী এত দিন হিংস্রজন্তুদিগের আবাস গৃহ হইয়া ছিল, আবার সেই সকল গৃহ জনতায় পরিপূর্ণ হইল। প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয় যব-নের দাসত্ব হইতে উন্মুক্ত হওয়ার এই সুযোগে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এইভাব সমস্ত মিবারবাসীর অন্তরে যেন তাড়িতবেগে সংক্রামিত হইল। প্রজাবৃন্দ হামীরের প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে মল্লদেব প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আর স্বনগরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি নগরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র প্রজাবৃন্দ গগণ বিদারিয়া হামীরের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন মল্লদেব গত্যন্তর না দেখিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট এই বার্ত্তার বাহক হইয়া চলি-লেন। আলাউদ্দীন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে মামুদ তদীয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন।

মামুদ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে হামীর চিতোর দখল করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। ক্রমে ক্রমে মিবারের সমস্ত দুর্গগুলিও তাঁহার হস্তগত হইতেছে। এই সংবাদে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া হামীরের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিতেছিলেন। এক্ষণে মল্লদেবের মুখে এই সংবাদ পাইয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। এবং ত্বরিতগতিতে মিবারাভিমুখে ধাবিত হইলেন। দিল্লীশ্বর অজ্ঞতাবশতঃ মিবারের পূর্ব্ব-সীমা ধরিয়া মিবাররাজ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া গমন করিতে হয়। তথায় সৈন্যের সংখ্যাবাহুল্যে কোন ফলোদয় হয় না। এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া দিল্লীশ্বর সিঙ্গোলী নামক স্থানে গিয়া সৈন্যাবাস সংস্থাপিত করিলেন। হামীর এই সংবাদ পাইবামাত্র স্বসৈন্যে তথায় গিয়া উত্তীর্ণ হইয়া মামুদকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। মামুদ এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তিনি পরাজিত ও বন্দীভূত হইলেন। এই যুদ্ধে হামীর বনবীরের ভ্রাতা হরিসিংহকে দ্বন্দযুদ্ধে হত করেন। হামীর মামুদকে বন্দী করিয়া চিতোরে আনয়ন করিলেন। সমস্ত মিবারবাসী আজ মহানন্দে বিজয়োৎসব করিতে লাগিল। সকলেই সমস্বরে হামীরের যশোগান করিতে লাগিল। আজ যবনরাজ চিতোরে বন্দী! আজ সমস্ত মিবার যবনের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত! ইহা অপেক্ষা হিন্দুর অধিকতর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে?

মামুদ তিনমাসকাল চিতোরের দুর্গে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তিনি আত্মনিষ্ক্রয় স্বরূপ হামীরকে আজমীর, রিনুথম্বোর, নাগোর, ও সুশোপুর, ছাড়িয়া দিলেন, এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও একশত হস্তী প্রদান করিলেন। মামুদ ভবিষ্যতে আর যাহাতে চিতোর আক্রমণ না করেন তদ্বিষয়ে হামীর কোন প্রতিশ্রুতি লই-

লেন না। বরং গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে যদি তাহা ঘটে, ত তিনি চিতোর রক্ষা করিতে পারিবেন। আরও বলিলেন এবার চিতোর দুর্গের বাহিরে উভয়সৈন্যে যুদ্ধ ঘটিবে।

হামীর ভারতের একমাত্র রাজচক্রবর্ত্তী।

মল্লদেবের পুত্র বনবীর সিংহ হামীরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহার ও রাজ-মহিষীর পিতৃকুলের অন্যান্য সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণের জন্য হামীর নীমুচ, জীরম্, রতনপুর ও কৈরর—এই চারিটী জেলা জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিলেন। এই জায়গীর দান-কালে হামীর নিম্নলিখিত গুরুগম্ভীরবাক্যগুলি বলি-লেন। "এই সম্পত্তি ভোগ কর, রাজার প্রয়োজন হইলে তাঁহার কার্য্য নিজজ্ঞানে সাধন কর, এবং রাজসংসারের অনুগত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইয়া থাক। এত দিন তোমরা এক জন তুর্কের ভৃত্য ছিলে, কিন্তু এক্ষণে তোমরা এক জন সধর্ম্মী হিন্দুর ভৃত্য হইলে। মনে করিও না যে আমি তোমাদের সম্পত্তিতে রাজা হইলাম। যাহা আমার প্রকৃত প্রাপ্য, এবং যাহা হইতে আমি এত দিন অধিকারচ্যুত ছিলাম আমি কেবল তাহাই পুনরধিকার করিয়াছি। যে চিতোরের প্রতি উপল-খণ্ড আমার পূর্ব্বপুরুষগণের রুধিরে বিধৌত হইয়াছে, চিতো-রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট হইতেই আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা পাইয়াছিলেন। সেই দেবীর আমরা সতত আরাধনা করিয়া থাকি, তিনিই আমাদের সেই আরাধনায় প্রীত হইয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। তিনিই আমায় ইহাতে প্রতিষ্ঠা-পিত রাখিবেন। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ বরাননার আরাধনায় এই অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন আমি আর সেরূপ করিতেছি না"। তদীয় পত্নীর বন্ধুবর্গ রাণার জলদগম্ভীরস্বরে অভিভূত হইয়া তাঁহার বদন-বিনির্গত এই

সারগর্ভ পদাবলী শ্রবণ করিলেন, এবং নীরবে অন্তরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে রাণার অনুগত হইয়া চলিবেন। তাঁহারা এই অন্তরের প্রতিজ্ঞা কখন ভঙ্গ করেন নাই।

মিবার রাজ্যের সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি।

বনবীর অল্পদিনের মধ্যেই ভীনস্রোর আক্রমণ করিয়া ইহা বলে গ্রহণ করিলেন। তিনি চম্বল-প্রবাহিত এই রমণীয় জনপদ দখল করিয়া মিবার রাজ্যের অঙ্গহীনতা দূর করিলেন। রাজস্থানের অন্যান্য রাজগণ হিন্দুর অধিনায়কত্বে উল্লাসিত হইয়া প্রফুল্ল-চিত্তে হামীরকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া সম্মান প্রদান করিলেন, এবং যুদ্ধের সময় সৈন্যাদি দ্বারা তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন।

হিন্দুরাজবৃন্দের মধ্যে কেবল একমাত্র হামীরই এক্ষণে ভারতের প্রকৃত শক্তিশালী। প্রাচীন রাজবংশ সকল প্রায় সকলেই যবন-পদদলিত হইয়া স্বাধীনতাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই প্রফুল্লচিত্তে হামীরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সকলেই তাঁহার আদেশানুসারে কর ও সৈন্য দিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। মাড়ওয়ার, জয়পুর, বুন্দী, গোয়ালীয়র, চন্দেরী, রৈসীন্, সিক্রী, কাল্পী, ও আবু প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ একে একে সকলেই চিতোরের রাজচক্রবর্ত্তীর চরণে সামন্তোচিত অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

তাতারগণকর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্বেও মিবারের রাজশক্তি প্রভূত বলশালিনী ছিল বটে, কিন্তু সে শক্তি ও হামীরের চিতোরাধিকারের পর হইতে দুই শতাব্দীকাল-ব্যাপিনী মিবারের প্রভুশক্তির নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এই দুই শতাব্দী মিবারের গৌরবরবির মধ্যাহ্নকাল। এই সময়ে যে কয় জন রাজচক্রবর্ত্তী মিবারের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসজগতে তাঁহাদিগের নাম আজও

ঘোষণা করিতেছে। কীর্ত্তিমন্দিরে স্থান পাইবার এমন সকল উজ্জ্বল রত্ন ভারত ইতিহাসেও অনেক পাওয়া যায় না। কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধের সময় ভারতে যে বীর-বৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রতিরূপ কেবল এই ভীষণ হিন্দু-যবন- সংঘর্ষকালে পাওয়া যায়। এই জন্যই কুরুক্ষেত্রের নিম্নেই রাজপুতানা তীর্থ স্থল হইয়া রহিয়াছে। বহুদিন অতীত হইতে না হইতে মালওয়া, গুজরাট ও দিল্লীতে আবার যাবনিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হইল বটে, কিন্তু হামীর ও তদ্বংশধরগণের অপ্রমেয় প্রতাপে সে শক্তি মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের শক্তির ন্যায় প্রতিহত ও অভিভূত হইয়াছিল। বিশেষতঃ খিলজী, লোদী, এবং সুরবংশ ক্রমান্বয়ে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করায় দিল্লীর রাজশক্তি অন্তঃসারশূন্যা হইয়া পড়ে। এই যাবনিক শক্তির অন্তঃদৌর্ব্বল্যের সময়ে মিবাররাজ্যের বিস্তৃতি ও দৃঢ়তা সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত হয়। মিবার যে এক্ষণে শুদ্ধ অন্তরাক্রমণ প্রতিহত করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল এরূপ নহে। মিবারের বিজয়িনী সেনা এক্ষণে পররাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া নব নব বিজয়-চিহ্ন ধারণ করিতে লাগিল। এই দিগ্বিজয়িনী সেনা নাগোরও সৌরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ রণ-ক্ষেত্রে বিজয়দ্যোতক কীর্ত্তিস্তম্ভ নিখাত করিয়া আসিল। অধিক কি ইহা দিল্লীর প্রাচীর পর্য্যন্ত গিয়া দিল্লীশ্বরকেও রণে পরাজিত করিল।

শিল্প ও স্থপতি বিদ্যার উন্নতি।

মিবার যে দীর্ঘকাল সমৃদ্ধি ও শান্তি ভোগ করিয়াছিল— তাহার নিদর্শন ইহার সৌন্দর্য্যময়ী ও মহতী প্রাসাদাবলী ও অতুলনীয় দেব-মন্দির-নিচয় ও কীর্ত্তি-স্তম্ভমালা। এক একটী কীর্ত্তি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে এক রাজ্যের এক বৎসরের সমস্ত আয় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। মিবারের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ-কীয় ভূমির দশ বৎসরের আয়েও এরূপ একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ

নির্ম্মিত হইতে পারে না। • চিতোরের ধ্বংসের পূর্ব্বের একটী মাত্র প্রাসাদ—ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর বিলাস-গৃহ কেবল আলাউদ্দিন নষ্ট করেন নাই। ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ও লোকসাধারণে চাঁদা করিয়া ইহার জীর্ণ সংস্কারাদি করিয়া থাকেন।

মিবারের রাণাগণ শিল্প ও স্থপতি বিদ্যার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিরূপে তাঁহারা শুদ্ধ জমির উপস্বত্বে এরূপ বহু-ব্যয়-সাধ্য শিল্প ও স্থপতি বিদ্যার কীর্ত্তি-স্তম্ভ-সকল বিনির্ম্মিত করিয়াও মহতী সেনা সকলের ব্যয়-ভার বহন করিতেন ইহা ভাবিলে বিস্ময়-রসে অভিভূত হইতে হয়। দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং কমনীয় প্রজা-বৎসলতা গুণ ব্যতিরেকে কখন এরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। প্রজারা রাণাগণকে পিতৃসম মনে করিত বলিয়াই সামান্য মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া এই অতুলনীয় কীর্ত্তিমালা বিনির্ম্মিত করিয়া দিয়া গিয়াছিল। এই সকল সুরম্য হর্ম্ম্য, সুন্দর দেবালয় ও অতুলনীয় বিজয়-স্তম্ভ-সকল মিবারের সর্ব্বত্র অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া রাজভক্ত প্রজা ও প্রজাবৎসল রাজা উভয়েরই মহিমা ঘোষণা করিতেছে। প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত্র মহামতি মহাবীর হামীর পরিণত বয়সে সকলের পূজ্য হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ১২৪১ শক বা ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সমস্ত মিবারবাসী আজ শোকে অভিভূত হইলেন। হিন্দু-জগৎ আজ শোক-তিমিরে নিমগ্ন হইল। সর্ব্বত্র হাহাকারধ্বনি উত্থিত। বিশ্ব-ব্যাপী আর্ত্তনাদে ভারত-গগণ বিদীর্ণ হইল! স্বদেশ-হিতৈষণা ও স্বজাতি-প্রেমে হামীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন প্রতাপ ব্যতীত রাজস্থানে এমন রাজা আর জন্মে নাই। বীরত্বে ও বিচক্ষণতায় বোধ হয় প্রতাপ ও ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য নহেন। আজও মিবারবাসিগণ ইঁহাকেই

মিবারের রাণাগণের মধ্যে বীরত্বে ও বিজ্ঞতায় অদ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হামীর পুত্রপ্রবর কায়স্থীর হস্তে অতি বিশাল, সমৃদ্ধিশালী, ও সুগঠিত রাজ্য অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

কায়স্থীর সিংহাসনাধিরোহণ।

১৪২১ শকে (১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) কায়স্থী পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রভু-শক্তি-সম্পন্ন ও অত্যুদাত্ত-চরিত ছিলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করায় প্রজাবৃন্দের অনুশোচনার আর কোন কারণ রহিল না। কায়স্থী সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই অভিযানে বহির্গত হইলেন। বীর কখন শান্তি-প্রয়াসী নহেন। অভিযানে বহির্গত হইয়াই তিনি আজমীর ও জেহাজ্‌পুর লীল্লা পাঠানের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন; এবং মণ্ডলগড়, ডুসোরী ও সমস্ত চম্পন-প্রদেশ মিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি পিতার সুশিক্ষিত সেনা লইয়া বাকুরোলে দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের গতিরোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে রণে পরাজিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু বিধাতা এই বীরকুলচূড়ামণিকে অধিক দিন মিবারসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে দিলেন না। তদীয় অধীন সমস্ত বুনাওদা প্রদেশের অধিপতি হরসিংহের কন্যার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থির হয়। সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে তাঁহার সহিত কায়স্থীর মনান্তর উপস্থিত হয়। বিশ্বাস-ঘাতক হরসিংহ গুপ্ত হত্যার দ্বারা ভাবী জামাতার প্রাণ সংহার করে। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে মিবার শোকানলে দগ্ধ হইল। কায়স্থীর শোচনীয় মৃত্যুতে মিবার-বাসিগণ নিরতিশয় ব্যথিত-হৃদয় হইলেন।

লক্ষ-রাণা।

কায়স্থী গুপ্ত হত্যায় হত হইলে লক্ষ-রাণা ১৪৩৯ শকে (১৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) মিবারের রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। লক্ষ রাণাও মিবার-সিংহাসনে আরোহণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। তাহা না হইলে এ কীর্ত্তিমন্দিরে তিনি স্থান পাইতেন না। তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই সর্ব্ব প্রথমেই মাড়ওয়ারা পার্ব্বত্য প্রদেশকে মিবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন; এবং ইহার সর্ব্বপ্রধান দুর্গ বিরাট্‌গড়কে সমভূমি করিয়া তদুপরি বেডনৌর নগর প্রতিষ্ঠাপিত করেন। কিন্তু রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি ভিন্নও আর একটী ঘটনায় তাঁহার নাম মিবারে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কায়স্থী চম্পনের ভিল্‌গণের নিকট হইতে যে প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া নিজরাজ্যভুক্ত করেন, তথায় জাবুরা নামক একটী স্থান আছে। লক্ষরাণার সূক্ষ্ম দৃষ্টি তথায় সপ্ত ধাতুর একটী খনি আবিষ্কৃত করিল। এই খনিতে স্বর্ণ, রজত, পারদ, তাম্র, সুরমা, সীসা, ও টিন, এই সপ্ত ধাতু পাওয়া গেল। রাণা এই খনি খোদিত করার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই খনি হইতে যে ধাতু উঠিতে লাগিল, তাহাতে মিবারের সমৃদ্ধি অত্যন্ত বাড়িতে লাগিল। যদিও এখন ইহাতে সকল ধাতু পাওয়া যায় না, তথাপি এখনও পর্য্যন্ত এই খনি বিদ্যমান রহিয়াছে।

লক্ষরাণা বীরত্বেও হামীর ও তৎপুত্রের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য ছিলেন। তিনি অম্বরের যুদ্ধে নাগর চলের * রাজপুতদিগকে পরাজিত করিলেন।

তিনি দিল্লীর সম্রাট লোদীকেও আক্রমণ করিতে ভীত হন নাই। তিনি সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া গয়া পর্য্যন্ত গমন

* ঝুনঝুনু, সিংগানা, ও নর্বানা—এই তিনটী স্থান লইয়া নাগরচল রাজ্য সংগঠিত ছিল।

করিলেন, এবং সেই পবিত্র তীর্থকে যবনশূন্য করিয়া, সেই মহাতীর্থে ও মহাব্রতে আত্মবলি প্রদান করিলেন। রাণা এই পবিত্র যুদ্ধে হত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অনন্ত কালের জন্য রহিয়া গেল।

তিনি শিল্প ও স্থপতি বিদ্যার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। স্বদেশের উপকার সাধন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। অনেক বৃহৎ জলাধার ও হ্রদ তাঁহার আদেশে খনন করা হইয়াছিল। যে সকল পর্ব্বতসম মৃত্তিকা-স্তূপে তিনি তাহাদের তীর বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন সে সকল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনেক নব নব দুর্গ তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। জাবুরা খানির সমস্ত উপস্বত্ব তিনি আলাউদ্দীন-বিধ্বস্ত চিতোর নগরীর সৌধমালার পুনর্নির্ম্মাণে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তদীয় প্রাসাদের কিয়দংশ অদ্যাপি দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই প্রাসাদ, প্রাচীন জৈন-রত্নমন্দির ও পদ্মিনী-মহলের আদর্শে গঠিত। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের নামে একটী মন্দির তুলিয়াছিলেন। এরূপ সুবিশাল ও বহুব্যয়সাধ্য মন্দির জগতে অতি বিরল। ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

রাণা-লক্ষের পুত্রগণ।

রাণা লক্ষের অনেক গুলি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে চন্দ, রঘুদেব, লুন,ও দূল, এবং মুকুলজি প্রধান। চন্দ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। চন্দ, হইতে চন্দাবত, লুন হইতে লুনাবত, এবং দুল হইতে দুলাবত —এই তিনটী রাজপুতবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। একটী অদ্ভুত ঘটনায় চন্দ নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার হইতে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হন। হৃদয়ের মাহাত্ম্যে চন্দ ভীষ্মদেব ও রামচন্দ্রের শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য ছিলেন। যে ঘটনায় তিনি আপন ইচ্ছায় চিতোরের রাজসিংহাসনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পিতৃভক্তি

ও আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। স্ত্রীজাতির সম্মানরক্ষা যদি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হয়, তাহাহইলে এবিষয়ে রাজপুতগণ সভ্যতামঞ্চের সর্ব্বোচ্চ সোপান অধিকার করিবার যোগ্য। স্ত্রীলোকের যাহাতে লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত হয়, স্ত্রীলোকের যাহাতে মান হানি হয়, রাজপুত কখন এমন কার্য্য করিবেন না; এবং কেহ করিলে রাজপুতের নিকট তাহা মার্জ্জনীয় নহে। অধিক কি কোন রাজপুত রমণী লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ সামান্য পরিহাস বিদ্রূপ করেন তাহাও রাজপুতের অসহনীয়। এই রমণী-সম্মান অক্ষত রাখিতে গিয়া রাজপুতবংশসকল পরস্পর-সংঘর্ষে আত্মঘাতী হইয়াই মোগল বা মহারাষ্ট্রীয়গণের রাজ-পুতনা আক্রমণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়।

যুবরাজ চন্দ।

রাণা লক্ষ বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছেন, এমন সময়ে একদিন মাড়ওয়া-রাধিপতি বিন্‌মুলের কন্যার সহিত যুবরাজ চন্দের বিবাহের সম্বন্ধ-সূচক নারিকেল লইয়া এক দূত উপস্থিত হইলেন। রাণা লক্ষ পাত্রমিত্রপরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে দূতবরের আগমন-বার্ত্তা রাজ-সকাশে বিজ্ঞাপিত হইল। রাজাদেশে দূত রাজসমীপে নীত হইলে রাজা তাঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজ চন্দ তৎকালে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সুতরাং রাণা বলিলেন— "দূতবর! যুবরাজ এখনই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাড়ওয়ারাধি-পতি-প্রেরিত নারিকেল গ্রহণ করিবেন।" রাণা অঙ্গুলিনিচয় শ্মশ্রুরাজিমধ্যে প্রবেশিত করিয়া আর ও বলিলেন "দূতবর! বোধ হয় তোমার রাজা আমার মত ধবলিত-শ্মশ্রু প্রবয়াঃ নরপতির জন্য এরূপ ক্রীড়নক প্রেরণ করেন নাই"! রাজার

এই পরিহাসোক্তিতে পাত্র মিত্র ও দূত সকলেই হাঁসিয়া উঠিলেন, এবং সকলেই ইহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবরাজ চন্দ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন এরূপ পরিহাসোক্তি শুনিলেন, তখন পিতার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যে, বিবাহ-যৌতুকের জন্য পরিহাসচ্ছলেও পিতা লালসা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এ বিবাহ-যৌতুক ফিরাইয়া দিলে মাড়য়ারাধিপতি বিন্‌মুল অতিশয় অপমানিত হইবেন এবং তাঁহার সহিত সমর অনিবার্য্য হইবে এই বলিয়া বৃদ্ধ রাণা যুবরাজকে সেই বিবাহ-যৌতুক গ্রহণ করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু চন্দ কিছুতেই সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তখন বৃদ্ধ রাণা ক্রোধে ও অপমানে আত্মহারা হইয়া সেই বিবাহ-যৌতুক স্বয়ং গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে তিনি যুবরাজ চন্দের নিকট এই প্রতিশ্রুতি চাহিলেন যে এ বিবাহে যদি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের অনুকূলে যুবরাজকে জ্যেষ্ঠাধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। মহামতি চন্দ পিতার এই প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ 'তথাস্তু' বলিলেন। রাণা আরও অনুরোধ করিলেন যে তাঁহাকে কনিষ্ঠের সর্ব্বপ্রধান প্রজা হইয়া থাকিতে হইবে। প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত্র চন্দ পিতার এ প্রার্থনাও পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি ভগবান একলিঙ্গের নামে শপথ গ্রহণ করিলেন যে তিনি পিতার এই উভয় মনোরথই পূর্ণ করিবেন। দশরথ রামচন্দ্রকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকতর কঠোর নহে। ধন্য যুবরাজ চন্দ! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ! তুমি পিতৃ-তৃপ্তির জন্য আপনি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মিবারের রাজ-সিংহাসন হইতে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইলে! তোমারি দৃষ্টান্তে তোমার বংশধরগণ আত্মোৎসর্গে মিবারের সামন্তমণ্ডলীর মধ্যে আজও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন।

পিতা যাঁহাকে তাঁহার পরিণয়যোগ্য বলিয়া একবার মনে করিয়াছেন, তিনি মাতৃসমা, সুতরাং তাঁহার বিবাহের অযোগ্যা—এ সূক্ষ্ম নৈতিক ভাব যাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে পারে, তাঁহার নৈতিক উৎকর্ষ আধুনিক সভ্য জগতের বিস্ময়ের কারণ। চন্দ যে সৌন্দর্য্যময়ী পত্নীলাভে শুদ্ধ বঞ্চিত হইলেন এরূপ নহে, রাজ্যশাসনোপযোগী সমস্ত গুণের আধার হইয়াও আজ তিনি পুত্রপরম্পরায় রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইলেন।

মুকুল্‌জি ও যুবরাজ চন্দের অলৌকিক আত্মত্যাগ।

চন্দের নিকট প্রতিশ্রুতি লইয়া রাণা লক্ষ মাড়ওয়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। প্রবয়াঃ রাণার ঔরসে ও যুবতী মাড়ওয়াররাজকুমারীর গর্ভে মুকুলজি নামক পুত্র জন্মিল। নবজাত কুমার পিতামাতার নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে জীবনের পঞ্চম সোপানে আরোহণ করিলেন। এই সময় রাণা গয়ার পবিত্র ক্ষেত্র হইতে যবনদিগকে বিদূরিত করিবার উদ্দেশে তাহাদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-রণ বিঘোষিত করিলেন। 'বনং পঞ্চাশতো ব্রজেৎ' শাস্ত্রের এই অনুশাসন অনুসারে ক্ষত্রিয় নরপতিগণ পঞ্চাশৎ বর্ষের পর উপযুক্ত পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিঃসঙ্গ যোগতাপস হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবানের চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আজ প্রবয়াঃ রাণা লক্ষ সেই ধর্ম্মানুশাসন স্মরণ করিয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আত্মবলি দিবার এরূপ সুযোগ জুটে না বলিয়া রাণা আর কাল বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু যাহার জন্য মিবারের রাজ-সিংহাসন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সেই রাজকুমার মুকুল্‌জি এক্ষণে নিতান্ত শিশু। সুতরাং রাজ্য-রক্ষণে সম্পূর্ণ অক্ষম।

বিশেষতঃ প্রকৃত সিংহাসনাধিকারী মহামতি চন্দ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলে, শিশু রাজকুমার তাঁহার সহিত সংগ্রামে অপারগ হইবেন, এবং রাজ্যও অন্তর্ব্বিদ্রোহে ছারখার হইয়া যাইবে। রাণা এই সকল ভাবিয়া চন্দের মন পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইলেন। যুবরাজ সম্মুখে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! মুকুল্‌জিকে কোন্ কোন্ প্রদেশ দিবে?" চন্দ না ভাবিয়া চিন্তিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"কেন সেত স্থির হইয়াই আছে—মুকুল্‌জি মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবে"। রাণা পুত্রের আত্ম-ত্যাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। চন্দ পিতার মন হইতে সর্ব্ব প্রকার সন্দেহ ও আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন যে তাঁহার গয়া যাত্রার পূর্ব্বেই অভিষেক-কার্য্য সমাপন করিতে হইবে। চন্দের আগ্রহাতিশয়ে অভিষেককার্য্য অবিলম্বেই সমাপিত হইল। চন্দই সর্ব্বাগ্রে শিশুরাজার নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। তিনি আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে মন্ত্রিসভায় প্রধান আসন চাহিলেন, এবং দ্বিতীয় অনুরোধ এই করিলেন যে যাবদীয় রাজকীয় জায়গীর-দান-পত্রে তদীয় বর্ষালাঞ্ছন রাজকীয় নাম মুদ্রার পূর্ব্বে অঙ্কিত করিতে হইবে। তাঁহার এই সামান্য প্রার্থনাদ্বয় গ্রাহ্য হইল। সেলুম্ব্রা নগর তাঁহার বসতির জন্য তাঁহাকে অর্পণ করা হইল। অদ্যাপি তদীয় বংশধরগণ ঐ নগরে আধিপত্য করিতেছেন। চন্দের অলৌকিক আত্মত্যাগ ঘোষণা করিবার জন্যই যেন তদীয় বর্ষালাঞ্ছন অদ্যাপি মিবারের রাজনাম মুদ্রার পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

চন্দের অধ্যক্ষতা ত্যাগ।

পিতার অনুরোধে পিতার গয়া যাত্রার পর হইতে চন্দ সমস্ত রাজকার্য্য শিশুরাজার নামে ও তদুপকারার্থ নির্ব্বাহ

করিতে লাগিলেন। বীরোচিত সাহসিকতায়, তাপসোচিত সরলতায়, ও রাজোচিত প্রজাপালন-ক্ষমতায় তৎকালে মিবারে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিলনা। সুতরাং আপামর-সাধারণ সকলেই তাঁহার অধ্যক্ষতায় সন্তুষ্ট হইল। প্রজাবৃন্দ রাজার অভাব একদিনও অনুভব করিল না। কিন্তু বিমাতার চক্ষে অমৃতও গরল বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। যে সকল গুণে আবালবৃদ্ধবনিতা চন্দের নামে মুগ্ধ ছিলেন, সেই সকল গুণেই চন্দ রাজমাতার চক্ষে বিষতুল্য হইলেন। তিনি চন্দের সমস্ত কার্য্য ঈর্ষানয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিলেন যে চন্দ রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ-করণ-ব্যপদেশে মিবারের প্রকৃত রাজত্বই ক্রমে হস্তগত করিয়া লইতেছেন। যে চন্দের ঔদার্য্যেই তিনি রাজমাতা হইতে পারিয়াছেন, আজ তিনি সেই নিষ্কাম যোগীর অভিপ্রায়ের বিমলতায় মলিনতার ছবি প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে যদিও চন্দ রাণা উপাধি ধারণ করিলেন না বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত রাণাকে নাম মাত্রে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু অচল অচলের ন্যায় চন্দ বিমাতার এই সকল বাক্যবাণ সহিতে লাগিলেন। তিনি নিজের অভিপ্রায়ের বিমলতা জানিতেন বলিয়া এই সকল কথায় বিচলিত হইলেন না। বরং বিমাতার এই স্বাভাবিক ব্যাকুলতা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তথাপি তিনি বিমাতার সন্দেহ নিবারণের জন্য রাজকার্য্যের ভার বিমাতার হস্তে দিয়া নিজে মণ্ডুর অধিপতির নিকট গমন করিলেন। যাইবার সময় বিমাতাকে কেবল এই বলিয়া গেলেন যে "অকারণে আপনি প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর অভিপ্রায়ে ও কার্য্যে সন্দেহ করিয়াছেন, যাহা হউক এক্ষণে দেখিবেন যেন সিসোদিয়া বংশের গৌরব ও স্বত্ব সকল নষ্ট না হয়"। মণ্ডুরাজ্যেশ্বর মহা সমাদরে রাণা লক্ষের জ্যেষ্ঠ কুমারকে গ্রহণ করিলেন। চন্দের গুণগরিমা

সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় মণ্ডুকেশ্বর তাঁহাকে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য হল্লর নামক জেলা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। নিষ্কাম যোগীর ন্যায় চন্দ প্রজাবর্গের মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই এই জায়-গীর গ্রহণ করিলেন।

রাণা-মুকুলজি।

রাণা মুকুলজি ১৪৫৪ শক বা ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যতদিন তিনি জ্যেষ্ঠের অভিভাবকতায় রাজ্য করিতেছিলেন, ততদিন তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা ছিলনা। কিন্তু জেষ্ঠের রাজ্যপরিত্যাগ করার পর তদীয় মাতৃবংশ আসিয়া মিবারে অযথা কর্তৃত্ব আরম্ভ করি-লেন। তদীয় মাতামহ মাড়ওয়ারাধিপতি বৃদ্ধ রাও বিন্মূল কখন বা শিশু দৌহিত্রকে ক্রোড়ে করিয়া কখন বা একাকী মিবার-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজশক্তি তিনি নিজ করতলস্থ করিয়া লইলেন। যে বাপ্পারাওএর সিংহাসনে এতদিন সিসোদিয়া বংশীয় ব্যতীত আর কেহ বসিতে সাহস করেন নাই, আজ সেই সিংহাসনে অন্য দেশীয় লোক আসীন। প্রজাবর্গের অন্তরে ইহা শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল; অথচ রাজমাতার ভয়ে কেহ এবিষয়ে উচ্চ বাচ্য করিতে সাহস করিল না। রাণীমাতার ভ্রাতা যোধসিংহ পূর্ব্বেই আসিয়া কর্তৃত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পিতা দলবলে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার প্রভুত্ব শত গুণ বাড়িয়া উঠিল।

রাজমাতা ও রাজমাতামহ।

একদিন বিন্মূলকে সিংহাসনাধিরূঢ় দেখিয়া মুকুলজির ধাত্রী ক্রোধে আরক্ত-নয়না হইয়া রাণীমাতাকে স্পষ্টাক্ষরে

বলিল যে রন্ধরাওএর অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ হই-তেছে। তাহার বোধ হইতেছে যে রন্ধরাও দৈহিত্রকে বঞ্চিত করিয়া নিজে মিবারের সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টায় আছেন। রাণী-মাতার অন্তরে পূর্ব্বে এ সন্দেহ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে ধাত্রীর বাক্যে সে সন্দেহ-তরুশাখা পল্লবে বিভূষিত হইল। তিনি জানিতেন, রাজপুতজাতি রাজ্যলোলুপ। রাজ্যলাভের জন্য তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ততদূর করেন না। এই ভাবিয়া তিনি অন্তরের সন্দেহ মুখে ব্যক্ত করিলেন। রাণীমাতা এতদিনে মুখ ফুটিয়া পিতাকে তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য তিরস্কার করিলেন। বিন্‌মূল্‌ এতদিনে মুক্তাবরণ হইলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, মিবার-সিংহাসন তিনিই অধিকার করিয়াছেন এবং তিনিই আজীবন ভোগ করিবেন। আর বলিলেন যে রাণীমাতা যদি তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির অন্তরায় হয়েন, তাহাহইলে তাঁহার পুত্রের জীবন সংশয়াপন্ন হইবে।

রঘুদেব বা পিতৃদেব হত।

পিতার এই নিষ্ঠুর বাক্যে দুহিতার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। বুঝিলেন যে পিতা কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণকে নিশ্চয় হস্তগত করিয়াছেন। নতুবা এরূপ বাক্য বলিতে কখন সাহস করিতেন না। তাঁহার সন্দেহ শীঘ্র দৃঢ়ীভূত হইল। চন্দের মধ্যম ভ্রাতা দেব-প্রকৃতি রঘুদেবকে কৈলবারা ও কোয়ারিয়া নগর জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তথায় নিষ্কাম যোগীর ন্যায় প্রজাপালনে ও ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক বিন্‌মূল তাঁহার নিকট সম্মানসূচক এক পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন। প্রচলিত প্রথা অনুসারে প্রাপ্তিমাত্র তিনি ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন, এমন সময় গুপ্ত-

হত্যাকারীর অস্ত্রে তাঁহার প্রাণবধ হইল।" ধার্ম্মিকতা, সাহসিকতা, এবং বীরোচিত অঙ্গ সৌষ্টব ও সৌন্দর্য্যে রঘুদেব মিবারে অদ্বিতীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে মিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাঁহার হত্যা সৎকার্য্যে আত্মবলি রূপে পরিগণিত হইল। ইহাতে তিনি দেবোচিত গৌরব লাভ করিলেন। তিনি আজ হইতে মিবারের পিতৃ-দেবগণের সহিত একাসনে বসিয়া জাতীয় পূজোপহার পাইতে লাগিলেন। আজ হইতে প্রত্যেক গৃহস্থের পূজা-গৃহে তদীয় মূর্ত্তি পিতৃদেবগণের সহিত পূজিত হইতে লাগিল। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার করিয়া—আশ্বিন ও চৈত্রমাসে—রাণা হইতে সামান্য দাস পর্য্যন্ত সকলকেই তদীয় মন্দিরে আসিয়া তদীয় প্রতিমা পূজা করিতে হয়। মিবার আত্মোৎসর্গের পূজা করিতে জানিত বলিয়া মিবারে এই সময় এত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজমাতা ও চন্দের ষড়যন্ত্র।

রাণীমাতার এত দিনে সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি এই অকূল সাগরে পড়িয়া একমাত্র চন্দকে কাণ্ডারী বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি চন্দকে বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি না আসিলে সিসোদিয়া বংশের আধিপত্য লোপ হইবে। তাঁহার পিতৃ-বংশ আসিয়া রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ অধিকার করিয়াছেন। অধিক কি, মিবারের সর্ব্বোচ্চপদে এক জন ভট্টিবংশোদ্ভব জেসল্মীরীয় রাজপুত অধিরূঢ় রহিয়াছেন। চন্দ বিমাতার পত্র পাইয়াই দুই শত বিশ্বস্ত শিকারী সঙ্গে লইয়া চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই শিকারিগণ স্ব স্ব পরিবার চিতোরে রাখিয়া চন্দের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। ইহারা আপন আপন পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছলে চিতোরদুর্গাভ্যন্তরে বিনা সন্দেহে লব্ধ-প্রবেশ

হইল। চন্দ তাহাদিগকে দুর্গের দ্বাররক্ষকগণের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে তাহারা সকলেই দুর্গদ্বারপালগণের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিল। তাহারা পরিবার ফেলিয়া আর চন্দের নিকট যাইতে চাহে না বলায় তাহারা মহাসমাদরে গৃহীত হইল। এদিকে চন্দ রাজ-মাতাকে পুত্রসহ প্রতিদিন নানাব্যপদেশে দুর্গের বাহিরে আসিতে উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি প্রতিদিন ধাত্রী পুরোহিত ও অন্যান্য বিশ্বস্ত ভৃত্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া পুত্রসহ দুর্গের বহিঃস্থ গ্রামাদি প্রদর্শন ও তথায় দীন দুঃখী প্রজাবর্গের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও দারিদ্র্য বিদূরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দের উপদেশানুসারে তাঁহারা পরিভ্রমণের দূরত্ব ক্রমেই বাড়াইতে লাগিলেন। দেওয়ালীর দীপোৎসব রজনীতে চিতোর হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত গোস্‌গুণ্ডা নগরে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইবার প্রস্তাব রহিল।

চন্দের চিতোরাধিকার।

রাজমাতা চন্দের সমস্ত উপদেশ অনুষ্ঠিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই দীপোৎসব-রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজমাতা পূর্ব্ববৎ সকলকে সঙ্গে লইয়া গোস্‌গুণ্ডা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা মহোৎসবে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। নিশার প্রায় অবসান হইয়া আসিল— তথাপি চন্দের দেখা নাই। রাজমাতা, পুরোহিত ও ধাত্রী ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় সহসা চল্লিশ জন অশ্বারোহী বীরপুরুষ তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া নক্ষত্রবেগে চিতোরের পথে ছুটিয়া গেলেন। চন্দ এই বীরবৃন্দের নেতা ছিলেন। তিনি যাইবার সময় সঙ্কেতে চিতোরাধিপতি শিশু ভ্রাতাকে রাজপদোচিত অভিবাদন করিয়া গেলেন। সে সঙ্কেত যাঁহারা বুঝিতে পারিলেন তাঁহারাই চন্দকে চিনিতে পারিলেন।

তাঁহাকে চিনিবার অন্য উপায় ছিল না। কারণ তিনি ছদ্মবেশে গমন করিতেছিলেন।

নিমেষ-মধ্যে সেই বীরদল রামপুল বা রামসেতু অতিক্রম করিলেন। ইহাই চিতোরদুর্গে প্রবেশের প্রথম দ্বার। ঐ বহির্দ্বারে কেহই তাঁহাদের গতিরোধ করিল না। শাস্ত্রীগণ কেবল 'কোন্ হায়,'? এই প্রশ্ন মাত্র করিয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিল তাঁহারা গোস্থ্ণ্ডা হইতে রাজার অগ্রগামী সৈন্যস্বরূপ আসিতেছেন, তখন আর দ্বিরুক্তি করিল না। কারণ এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু যখন অবশিষ্ট সৈন্যগণ রাজাকে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ষড়যন্ত্র, আর গুপ্ত রহিল না। তখন সেই দুই শত বিশ্বস্ত তিরন্দাজ নিজ মুর্ত্তি ধারণ করিল। চন্দের চিরপরিচিতস্বরে তাহারা কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইল। এদিকে চন্দ অসি নিষ্কোশিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই ভটি সামন্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি এ ষড়যন্ত্রের কোনও সংবাদ পান নাই। সুতরাং সহসা উদ্যোতিত-অসি চন্দকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়বিহ্বল ও ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিজ ছোরা চন্দের অভিমুখে সবেগে প্রক্ষেপ করিলেন; চন্দ ক্ষত হইয়াও নিমেষমধ্যে খড়্গাঘাতে ভটিপতির দেহ বিখণ্ডিত করিলেন। দ্বারপালগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। রাঠোরবংশোদ্ভবগণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া নির্দ্দয় রূপে হত্যা করা হইল।

হত্যাকাণ্ড ও যোধসিংহের পলায়ন।

রাও রিনমূলের হত্যাকাণ্ড শোচনীয় অপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক হইয়াছিল। উক্ত প্রবয়াঃ মাড়ওয়ারাধিপতি রাজমাতার কোন সহচরীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার সতীত্বরত্ন অপহরণ করেন। যখন চন্দ তদীয় প্রাসাদ অবরোধ করেন,

তখন তিনি মদ্য, অহিফেন ও প্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই রমণীকে নিজ বাহুযুগলের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যুবতীর অন্তরে যে প্রতিহিংসানল ধূমায়মান ছিল, তাহা এই সুযোগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রমণী তাঁহার শিথিলিত বাহুযুগলের বন্ধন হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া তদীয় মাড়ওয়ারী পাকুড়ী দ্বারা তাঁহাকে খট্টাপাদে বাঁধিল। অহিফেনের শক্তিতে তদীয় নয়নদ্বয় নিমীলিত ছিল। এদিকে মদ্য তাঁহার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এই অবস্থায় রমণী গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল। এই অবসরে অস্ত্রধারী পুরুষগণ তদীয় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনাশব্দে ও অস্ত্রধারী পুরুষগণের পাদশব্দে বৃদ্ধ রাওর চৈতন্য হইল। তখন আসন্ন-মৃত্যু দেখিয়া তিনি সিংহ-বিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সে প্রেমাগারে বীরবাহ্য অস্ত্র কোথায় পাইবেন? বৃদ্ধ তথাপি নিরস্ত হইবার নহেন। ক্ষত্রিয় নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও কখন প্রাণ ভিক্ষা করেন না। আজ সেই ক্ষত্রধর্ম্মের বশীভূত হইয়া প্রবয়াঃ মাড়ওয়ারাধিপতি সম্মুখে তৈজস পত্র যাহা পাইলেন তদ্দ্বারাই অসংখ্য লোককে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই একটী বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহাকে তদীয় প্রাসাদের শানের উপর পাতিত করিল। এইরূপে তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাকতাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কেহই তাঁহার মৃত দেহের সমুচিত সৎকার করিল না। তাঁহার ও তদীয় অনুচরবর্গের শবগুলি চিতোরের শ্মশানভূমিতে শকুনি গৃধিনীর মুখে প্রক্ষিপ্ত হইল! যেমন পাপ তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইল!

তদীয় পুত্র যোধসিংহ তৎকালে চিতোরদুর্গের পাদদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র ক্ষিপ্রগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমে মণ্ডোর নগরে গমন করেন,

কিন্তু চন্দ সেই নগরাভিমুখে তদনুসরণে আসিতেছেন, শুনিয়া সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া বীরবর অতিথি-বৎসল হর্ব্বসঙ্ক-লের আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দ নিজ পুত্রদ্বয়ের উপর মণ্ডোর-নগররক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সুযোগ পাইয়া যোধসিংহ হর্ব্বসঙ্কলের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত নগর আক্রমণ করেন। চন্দের জ্যায়ান্ পুত্র উপেক্ষা করিয়া অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু যোধসিংহ কর্ত্তৃক রণে পরাজিত ও হত হয়েন। কনীয়ান্ পুত্র এই সংবাদ পাইয়া বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু গোধওয়ার প্রদেশে ধৃত ও নিহত হইলেন। বৃদ্ধ রাঠোরের মৃত্যুর প্রতিশোধ লই-বার জন্য দুই জন চিতোর রাজকুমারকে বলি দেওয়া হইল। যোধসিংহ বুঝিলেন যে এ অনল বিনা প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই জন্য তিনি চন্দের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন, এবং তদীয় কুমারদ্বয়ের হত্যার জন্য যে ব্যবস্থা হয় তাহাই তিনি মস্তক পাতিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন। অব-শেষে স্থিরীকৃত হইল যে তাঁহাকে গোধওয়ার ছাড়িয়া দিতে হইবে। তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে অনেক দিনের পর গোধওয়ার রাজ্য আবার মিবাররাজ্যের অন্ত-র্ভুক্ত হইল।

রাণামুকুল ও তাঁহার গুণাবলী।

রাণামুকুল বীরত্বে ও মহাপ্রাণতায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালের সমকালীন প্রসিদ্ধ ঘটনা—তাইমুরকর্ত্তৃক ভারতআক্রমণ। সম্রাট ফেরোজ সাহার একটী অজাতশ্মশ্রু প্রপৌত্র তৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি তাইমুরের আগ-মনে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া গুজরাটাভিমুখে পলায়ন করিতে-

ছিলেন। তিনি মিবার রাজ্যের মধ্য দিয়া সেই দিকে ধাবিত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। রাণামুকুল এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্য তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেন সহসা একটী গিরি-শৃঙ্গ পতিত হইয়া গিরি-নির্ঝরিণীর গতিরোধ করিল। রাণা মুকুল আরাবলী গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া রাইপুর রণক্ষেত্রে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়া যবনসম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তদীয় দুর্ভেদ্য বূ্যহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া যবনসৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইল। এই বিজয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া রাণামুকুল সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া সম্বর প্রদেশ ও সম্বর হ্রদ অধিকার করিলেন। রাণা মুকুল আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমান্ত প্রদেশ জয় করিয়া রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনেও তিনি অল্প বিচক্ষণতা প্রকাশ করেন নাই। পিতার ন্যায় তিনিও স্থপতিবিদ্যার এক জন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ রাণা লক্ষ আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, রাণা মুকুল তাহা পরিসমাপ্ত করিলেন। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ এখন প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তিনি চিতোর-গিরির প্রতীচ্য প্রদেশে একটী প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাপিত করিয়া তাহাতে চতুর্ভুজের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

রাণামুকুলের শোচনীয় হত্যা।

রাণামুকুলের লালবাই নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি কীচীপ্রদেশের অধিপতির সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। উক্ত কীচীরাজ বিবাহের যৌতুক না লইয়া রাণার নিকট বিপদের সময় সৈন্য সাহায্যের প্রতি-শ্রুতি লইয়াছিলেন। মালওয়াধিপতি হোসঙ তাঁহাদিগের নগর আক্রমণ করিলে, তিনি পুত্র ধীরাজকে রাণার নিকট সাহায্যভিক্ষার জন্য পাঠাইলেন। রাণা তৎকালে সসৈন্যে

মাদারীয়া নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ধীরাজ আসিয়া সৈন্য চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে প্রার্থনা পূরণ করিলেন। ধীরাজ সৈন্য লইয়া যাওয়ার পর একটী সামান্য ঘটনায় মুকুলের খুল্লতাতদ্বয়—চাছ ও ময়রা—তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিলেন।

কায়স্থী পরমরূপলাবণ্যবতী কোন সূত্রধরবংশোদ্ভবা রমণীকে গোপনে বিবাহ করেন। এই বিবাহ তাঁহাদিগের কৌলিক প্রথার বিরুদ্ধে হইয়াছিল বলিয়া, ও উক্ত কামিনী নীচবংশোদ্ভবা ছিলেন বলিয়া লোকে ইহার সিদ্ধতা স্বীকার করিত না। এই কামিনীর গর্ভে ও কায়স্থীর ঔরসে ঐ দুই পুত্র জন্মে। এই জন্য লোকে তাঁহাদিগের দুইজনের জন্ম-বৃত্তান্ত লইয়া কাণাকাণি করিত। মিবারে এই অসিদ্ধ বিবা-হের পুত্রগণ পঞ্চম শ্রেণীস্থ পুত্র বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইঁহারা মন্ত্রভবনে ও অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পাইতেন ও বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতেন বটে কিন্তু রাজ্যে বা রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে তাঁহাদিগের অধিকার থাকিত না। রাণামুকুলের সেনা মধ্যে ইঁহারা প্রত্যেকে সপ্ত শত অশ্বা-রোহী সৈন্যের অধিনায়কপদে অভিষিক্ত ছিলেন। কোন সামন্ত ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাজসকাশে যে কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এক দিন সে সুযোগও উপস্থিত হইল। এক দিন রাণা সামন্তবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া নিকুঞ্জমধ্যে আসনে সমাসীন হইয়া অদূর-বর্ত্তী কোন বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চোহানসামন্ত নিজের অনভিজ্ঞতার ভান করিয়া রাণাকে কাণে কাণে তদীয় খুল্লতাতদ্বয়ের এক জনকে উক্ত বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। সরল-হৃদয় রাণা ইহার প্রকৃত মর্ম্মের উদ্ভেদ করিতে না পারিয়া সরল ভাবে তাঁহাদিগের অন্যতরকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "খুল্লতাতঃ! এ বৃক্ষটী কি বৃক্ষ?" উভয়

ভ্রাতাই এ প্রশ্নে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে তাঁহারা সূত্রধর-কন্যার গর্ভজাত বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাদিগকেই বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। তাঁহারা সেই দিনই ইহার প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাণা মুকুল ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি একাগ্র মনে মালা জপিতেছিলেন, এমন সময় ভ্রাতৃদ্বয় যমদূতের ন্যায় সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। এক জনের অসি তদীয় হস্তকে দেহবিচ্ছিন্ন করিল, অন্যতরের অসি তাঁহার দেহকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূপাতিত করিল। ভ্রাতৃদ্বয় এই লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত করিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল যে চিতোরের শূন্যসিংহাসন গিয়া অধিকার করেন। কিন্তু চিতোরবাসীরা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে দুর্গদ্বার অর্গলবদ্ধ করিল।

রাণাকুম্ভ এবং রাজহন্তৃদ্বয়।

রাণামুকুল নিহত হইলে তদীয় পুত্র যুবরাজ কুম্ভ মিবারের শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু হত্যাকারীদ্বয় তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা চিতোরে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মাদারীয়ার সমীপবর্ত্তী দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সঙ্কট সময়ে কুম্ভ পিতৃ-মাতুল যোধসিংহের শরণাপন্ন হইলেন। যোধসিংহ এই বিপদ্‌কালে ইচ্ছা করিলে মিবারের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় কখন শরণাগতের সর্ব্বস্বাপহারী হন না। তিনি ক্ষত্রোচিত হৃদয়-মাহাত্ম্যের বশীভূত হইয়া নিজ পুত্রকে সৈন্য সামন্ত দিয়া মাদারিয়া দুর্গাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের আগমনসংবাদেই সে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রাতাকোট্-গিরি দুর্গে গিয়া

আশ্রয় লইলেন। এই দুর্গ উক্ত গিরির অত্যুঙ্গ শৃঙ্গোপরি বিনির্ম্মিত, সুতরাং অতি দুরাধিগম্য। রাজহন্তৃদ্বয় চোহান-বংশীয় সামন্ত সুজ্জার এক কুমারী কন্যাকে লইয়া তথায় পলায়ন করেন। এই জন্য সুজা প্রতিহিংসাপরতন্ত্র হইয়া অনেক কষ্টে তাঁহাদিগকে ধরাইয়া দেন। যোধসিংহতনয় ও কুম্ভ উক্ত সামন্তের সাহায্যে রজনীতিমিরে অবগুণ্ঠিত হইয়া গিরি-শৃঙ্গের গাত্র বহিয়া দুর্গোপরি আরোহণ করিলেন। চাছ ও ময়রা সহসা কুমারদ্বয়কে সম্মুখে দেখিয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই অবসরে পথ-প্রদর্শক চন্দনা চাছকে ও রাঠোর-রাজতনয় ময়রাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। অবশেষে আক্রমণকারীরা দুর্গের লুণ্ঠিতদ্রব্য ভাগ করিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাণাকুম্ভ।

রাণাকুম্ভ ১৪৭৫ শক বা ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেন। তদীয় বিস্তৃত রাজত্বকালের মধ্যে কোন প্রকার প্রজাবিদ্রোহের লক্ষণ উপলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে নিয়ত বহিশ্চর শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অথচ তাঁহার রাজত্বের সময় মিবার অতিশয় সমৃদ্ধি-শালী হইয়া উঠিয়াছিল।

কোন দেশের ইতিহাসে উপর্য্যুপরি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া প্রতিভাশালী মহাপ্রাণ শাসন-দক্ষ রাজবৃন্দকে রাজত্ব করিতে দেখা যায় নাই। বাপ্পার সময় হইতে গণনা আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে কুম্ভের রাজত্বকাল মিবারের সৌভাগ্য-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল। মিবারের গৌরব-গিরিপাদ-মূলে প্রতি-হত হইয়া একে একে সমস্ত যবন-শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যেন মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদমূলে সাগরতরঙ্গ প্রতিহত হইয়া জলকণিকাপুঞ্জরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। নিষ্ঠুর ধর্ম্মান্ধ

আলাউদ্দীন যে দিনে আসিয়া চিতোরের শিল্প ও স্থপতি বিদ্যার কীর্ত্তি-স্তম্ভ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দুর্দ্দিন হইতে আজ এক শতাব্দী কাল অতীত হইয়াছে। সে দুর্দ্দিনের আঘাত হইতে চিতোর এখন একরূপ সাম্‌লাইয়াছে। চিতোর রক্ষার জন্য যে সকল বীর আত্মবলি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্থানে আবার নব নব বীর আবির্ভূত হইয়া স্বদেশের রক্ষার্থ প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ককেসস্ পর্ব্বতের শিখরদেশে ও অক্সসের উপকূলে যে মহতী যবন-শক্তি ভারত আমক্রণের জন্য ক্রমে উপচিত-বল হইতেছিল, এবং যে মহাশক্তি তদীয় পৌত্র রাণা সঙ্গের রাজত্বকালে উত্তাল সাগর-তরঙ্গের ন্যায় মিবারকে কুক্ষিগত করিবার জন্যই যেন প্রচণ্ড বেগে তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, সেই মহতী যবন-শক্তির সম্মুখীন হইবার যোগ্য উপাদানসামগ্রী রাণাকুম্ভের রাজত্বকালে সবিশেষরূপে সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। হামীরের বীরত্ব ও কার্য্যকরী শক্তি, রাণা লক্ষের শিল্প-বিষয়িণী স্বাদগ্রাহিতা, এবং বাপ্পারাউলের সর্ব্ববিষয়িণী-প্রতিভা এক রাণা কুম্ভে বিদ্যমান ছিল। রাণাকুম্ভ এই সকল অসামান্য মৌলিক শক্তিবলে যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই দ্বিতীয়বার মিবারের লোহিতধ্বজা দৃশদ্বতী নদীতীরে প্রোথিত করিলেন। যে দৃশদ্বতী নদীতীরে তদীয় পিতৃপুরুষ সমরসিংহ যবন-হস্তে রণে পরাজিত ও হত হন, সেই দৃশদ্বতী নদীতীরে তাঁহার বিজয়িনী সেনা যবন-শক্তিকে পরাজিত করিয়া মিবার রাজ্যের পরিসর দৃশদ্বতীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিল।

দিল্লী ও মিবারের রাজবংশ।

কি কারণে এতশীঘ্র যবনশক্তির হ্রাস হইত, এবং কি কারণেই বা হিন্দু শক্তি এত শীঘ্র পুষ্টাবয়ব হইত, ইহার কারণ

অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় আত্ম-সংযমের অভাবই যবনগণের পতনের কারণ, এবং তাহার ভাবই হিন্দু-গণের দ্রুত-উন্নতির নিদান। ভারত-রাহু সাহাবুদ্দীনের ও তাঁহার সমসাময়িক সমরসিংহের সময় হইতে দিল্লীর সিংহাসনে দুইটী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই রাজ-বংশে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি সম্রাট ও এক সাম্রাজ্ঞী আবি-র্ভূত হন।

গুপ্ত-হত্যা, রাজ্যবিপ্লব বা সিংহাসনচ্যুতিনিবন্ধন তাঁহারা অতি অল্প ব্যবধানেই রঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিত হন। গড়ে তাঁহারা প্রত্যেকে নয় বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারেন নাই। এরূপ ঘন ঘন রাজ্য-বিবর্ত্তনের মূল আত্ম-সংযমের অভাব নিহিত রহিয়াছে। যিনি সম্রাট বা সাম্রাজ্ঞী হইলেন তিনি আত্মসুখে বিভোর হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়গণ ও প্রজা-বর্গ তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহাদের ষড়-যন্ত্রে সম্রাট হত ও তাহার উত্তরাধিকারী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা-পিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু মিবারে সেরূপ ঘটনা অল্পই ঘটিয়াছে। মিবারের রাজগণ এরূপ প্রজাবৎসল ও কুটুম্ব-পরি-পোষক ছিলেন যে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কখন ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, বলিয়া ইতিহাসে লিখিত নাই। তাঁহাদিগের রাজ্যে সকলেই সুখী ছিল, তাঁহাদের আত্মোৎসর্গে সকলেই প্রীত ছিল বলিয়া কোন প্রকার অন্তর্ব্বিপ্লব বা গৃহবিচ্ছেদ ঘটিতে শুনা যায় নাই। যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে চতুর্ব্বিংশতি সম্রাট্ অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে মিবারের সিংহাসনে একাদশ জন মাত্র রাজা অধিরূঢ় হন।

ভারতের তদানীন্তন অবস্থা।

খিল্‌জী রাজবংশের রাজত্বকালের শেষে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্দ্দৌবল্য-নিবন্ধন তদধীন ভারতীয় রাজ্যসকল স্বাধীনতা

ধ্বজা উড্ডীন করিল। দাক্ষিণাত্যে বিজয়পুরও গলকণ্ডা; এবং আর্য্যাবর্ত্তে মালব, গুর্জ্জর, ও জৈনপুর, অধিক কি কাল্পীও আপন আপন স্বাধীনতা খ্যাপন করিল। যে সময়ে কুম্ভ সিংহাসনাধিরোহণ করেন, সে সময় মালব ও গুজরাট অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুম্ভের গৌরব-সূর্য্যের মধ্যোদয়ের সময় এই দুই রাজ্যের রাজদ্বয় তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য পরস্পর সন্ধিবদ্ধ হন।

অবশেষে ১৪৯৬ সম্বৎ বা ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা দুই মহতী সেনা লইয়া মিবার আক্রমণ করেন। কুম্ভ এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী লইয়া মালব-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া এই মিলিত সেনাকে যুদ্ধ প্রদান করেন। এই মহারণে সেই মিলিত সৈন্য কুম্ভের হস্তে পরাজিত হয়, এবং খিল্‌জী বংশীয় মালবাধিপতি মামুদ রণে বন্দীভূত হইয়া চিতোরে আনীত হন।

কুম্ভের চরিত্র মাহাত্ম্য।

কুম্ভের হৃদয়-মাহাত্ম্য এই বিজয়ের পর অধিকতর বিকশিত হয়। হিন্দুধর্ম্মে পরাজিত ও রণে বন্দীভূত শত্রুর প্রতি নৃশংসাচার নিষিদ্ধ। কুম্ভ পরাজিত বন্দীভূত মামুদকে শুদ্ধ মুক্তি দিয়াই যে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন এরূপ নহে, পদানত শত্রুর প্রতি সে ঔদার্য্য ত হিন্দুবীর মাত্রই প্রদর্শন করিতে বাধ্য। কিন্তু তিনি মামুদকে মুক্তি দিবার সময় বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়া নিজের হৃদয়ের অতিমানুষিক বিশালতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত যুদ্ধ স্থলে তিনি শত্রুগণের যে সমস্ত বসন ভূষণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সে সমস্তই তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন; কেবল বিজয়চিহ্নস্বরূপ মালবাধিপের রাজমুকুট খানি রাখিয়া দিলেন। এই ঘটনার একাদশবর্ষ পরে কুম্ভ এই বিজয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চিতোর গিরির বক্ষে এক গগণ-স্পর্শী বিজয়-

স্তম্ভ নিখাত করেন। ইহা সমাপ্ত করিতে তাঁহার দশ বৎসর কাল লাগিয়াছিল। এই বিজয়-স্তম্ভ এত উচ্চ যে উচ্চতায় মেরু পর্ব্বতকেও পরিহাস করিতেছে। ইহা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ-ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। অনন্তকালের জন্য ইহা এইরূপ অক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া রাণা-কুম্ভের কীর্ত্তি ঘোষণা করুক্ ইহা আমার ঐকান্তিক কামনা। এই কীর্ত্তিস্তম্ভের পাদমূলে এই যুদ্ধের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত আছে। এই মর্ম্মে সেই বিবরণের প্রারম্ভ হইয়াছে। "যখন গুর্জ্জরখণ্ড ও মালবের অধিপতিদ্বয় সাগরোপম বাহিনীদ্বয় লইয়া মেদিনী বিকম্পিত করিয়া মিবারাভিমুখে আগমন করেন ইত্যাদি।".

কুম্ভের অনন্ত কীর্ত্তি।

হৃদয়-মাহাত্ম্যের নিকট পরাজিত না হয় এমন লোক জগতে অতি বিরল। যে মালবাধিপতি মামুদকে কুম্ভ রণে পরাজিত করিয়া ছয় মাস কাল চিতোরের কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মহাপ্রাণতায় সেই মামুদ তাঁহার নিকট চিরদিন আত্ম বিক্রীত হইয়া ছিলেন। তাঁহার কারা-মুক্তির পর যখন ঝুন্‌ঝুনু রণক্ষেত্রে কুম্ভের সহিত যবন সম্রা-টের সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তখন মামুদ সসৈন্যে কুম্ভের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্বজাতীয় সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মিলিত সৈন্যের সাহায্যে কুম্ভ সহজেই সেই মহতী-সম্রাজ্-সেনার উপর জয় লাভ করিয়াছিলেন। এই উপকার প্রত্যুপকারে উভয়েরই চরিত্র ইতিহাসে স্বর্ণা-ক্ষরে লিখিত আছে।

রাণাকুম্ভের কীর্ত্তি-কলাপ।

মিবারের রক্ষার জন্য যে চতুরশীতি দুর্গ প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহার মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক দুর্গ কুম্ভ কর্ত্তৃক নির্ম্মা-

পিত। মিবারের যে প্রকাণ্ড দুর্গ কেবল চিতোরের দুর্গের নিকট অবনত-মস্তক, সেই উত্তুঙ্গ ও বিশাল দুর্গ তাঁহারই নামে কুম্ভমীর নামে আখ্যাত হয়। এক্ষণে ইহা সাধারণতঃ কমলমীর নামে বিদিত আছে। চিতোর দুর্গ যেমন চিতোর গিরির উপর প্রতিষ্ঠাপিত, ইহাও সেইরূপ কুম্ভমীর গিরির উপর প্রতিষ্ঠাপিত। ইহার প্রাকৃতিক অবস্থান ও উত্তুঙ্গ প্রাকার-বেষ্টন-হেতু ইহা অনন্তকালের জন্য শত্রুদিগের দুষ্প্র-বেশ্য হইয়া রহিয়াছে। যে স্থানে কুম্ভ এই দুর্গ প্রতিষ্ঠাপিত করেন, সেই স্থানে পুরাকাল হইতে একটী প্রাচীন দুর্গ প্রতিষ্ঠা-পিত ছিল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে চন্দ্রগুপ্তের বংশোদ্ভব জৈন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রীত নামক এক রাজা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতা-ব্দীতে ঐ দুর্গ নির্ম্মাপিত করেন। দুর্গাভ্যন্তরে যে সকল জৈন-মন্দির আছে তাহা দ্বারা এই কিম্বদন্তীর সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়। সেই প্রাচীন অট্টালিকাসকল এরূপ সুদৃঢ় ও সুগঠিত ছিল যে কুম্ভ সে গুলি ভাঙ্গিয়া না ফেলিয়া তাহার সঙ্গে নূতন সৌধরাজি সংযোজিত করিয়া ইহাকে একটী অপূর্ব্ব দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। কুম্ভ নাগোর নগর বলে অধিকার করিয়া তাহার অপূর্ব্ব তোরণ সকল আনিয়া কুম্ভমীর দুর্গে বসাইয়া দেন। এই সকল তোরণের উপর ভক্তবীর হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছে। তিনি যেন সেই দুর্গের রক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইয়া রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আবু পর্ব্বতের শিখর দেশে একটী অপূর্ব্ব দুর্গ নির্ম্মাপিত করেন। এই দুর্গটী প্রমরবংশীয় নরপতিগণের অতি বিশাল দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এই দুর্গে তিনি অনেক সময় বাস করিতেন। ইহার বারুদখানা ও ভীতি-সৌধ * অদ্যাপি কুম্ভের নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই দুর্গের একটী মন্দিরে কুম্ভ ও তদীয় পিতার পিত্তলের মূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। কত

* যে উত্তুঙ্গ টাওয়ারে বসিয়া শত্রুর আগমন ঘোষণা করা হয়।

শতাব্দী অতীত হইয়াছে, সেখান হইতে মিবারের আধিপত্য চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তথাকার লোকে আজও কুম্ভ ও তদীয় পিতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। ইহাকেই বলে প্রকৃত রাজভক্তি। কুম্ভ প্রতীচ্য সীমা ও আবু পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী গুহা প্রদেশে অনেক গুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সিরোহীর নিকট বাসন্তি নামক দুর্গ, এবং সেরনালা ও দেবগড় রক্ষার জন্য সেরনালা গিরিসঙ্কটমুখে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ অদ্যাপি তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এতভিন্ন তিনি জারোল ও পানোরা ভূমিয়া (ভূম্যাধিকারী) ভিল্ দিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য আহোর প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ প্রস্তুত করান। তদ্ভিন্ন তিনিই সর্ব্ব প্রথমে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে মাড়ওয়ার ও মিবার রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করেন।

তাঁহার সমর-বিষয়িণী প্রতিভার জ্বলন্তস্বাক্ষিস্বরূপ এই এই সকল সামরিক দুর্গ ভিন্নও ধর্ম্ম বিষয়ক কীর্ত্তিরাজিও তাঁহার নাম মিবারে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আবু পর্ব্বতের শিখরদেশে "কুম্ভশ্যাম" নামে এক অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির অদ্যাপি দর্শকগণের মনে বিস্ময়রসের অবতারণা করিয়া থাকে। এই মন্দির অন্য দেশে প্রতিষ্ঠাপিত হইলে বোধ হয় এত দিনে এই মন্দিরের নাম জগদ্বাসী সকলেই জানিতে পারিত। কিন্তু কুম্ভের অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপের সহিত তুলনায় ইহা যেন রাহুগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। কুম্ভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'ঋষভ দেবের মন্দির।" এই মন্দির সদ্রিগিরিসঙ্কটে অবস্থিত। এই গিরিপথ দিয়া মিবারের প্রতীচ্য অধিত্যকা প্রদেশ হইতে অবতরণ করিয়া মিবারের সমতলক্ষেত্রে আসিতে হয়। রাণার জৈন ধর্ম্মাবলম্বী মন্ত্রিপ্রবর ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে এক কোটী বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। কুম্ভ নিজ

কোষ হইতে ইহার দ্বাদশ ভাগ মাত্র প্রদান করেন। অবশিষ্ট সমস্ত টাকা চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হয়। এরূপ উচ্চ ও বিশাল মন্দির পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। ইহা ত্রিতল। প্রত্যেক তল অসংখ্য প্রস্তরময় স্তম্ভে সংরক্ষিত। এক একটী স্তম্ভ উচ্চে চত্বারিংশৎ পাদ পরিমিত। স্তম্ভ গুলির অন্তর্গাত্র বহুমূল্য হীরক রত্নাদিখচিত, এবং খোদিতাক্ষর ও খোদিত-ছবি। ইহার নিম্নতল ভূগর্ভস্থ। সেই নিম্নতলের প্রত্যেক গোলার্দ্ধের * নিম্নে এক এক জন জৈন ঋষির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছে। ইহার নিভৃত অবস্থান হেতু ইহা ধর্ম্মান্ধ যবনগণের কুঠারাঘাত বক্ষে ধারণ করে নাই। এক্ষণে এই নির্জ্জন মন্দির কেবল ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি হইয়া রহিয়াছে।

রাণাকুম্ভের পারিবারিক জীবন।

কুম্ভ রাঠোর বংশীয় মৈর্ত্তানগরের অধিপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বংশ মাড়ওয়ারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশ। রাণা স্বয়ং যেমন সুকবি ছিলেন, তাঁহার মহিষী মীরা-বাই ও সেইরূপ সুকবি বলিয়া প্রথিত ছিলেন। কুম্ভ যে শুদ্ধ কবিতা লিখিতে পারিতেন এরূপ নহে, তিনি কবিত্বের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ ছিলেন। তিনি জয়দেবের অপূর্ব্ব প্রেমগীতি গীত-গোবিন্দের অতি সুললিত ও সুন্দর টীকা লিখিয়া গিয়া-ছেন। তাঁহার ভার্য্যাও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার যোগ্যা ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর গীতিকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মিরাবাইয়ের রূপ লাবণ্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান—দুইই লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহার অনেক গুলি সুললিত গীতি-কাব্য কালের করাল গ্রাস হইতে পরি-রক্ষিত হইয়াছে।

* Vaults.

তাঁহার জীবন উপন্যাসের নায়িকার ন্যায় অপূর্ব্ব ও ঘটনা-পূর্ণ। তিনি যমুনা পুলিন হইতে দ্বারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে যত গুলি কৃষ্ণের মন্দির ছিল সমস্ত প্রদর্শন করিয়া আসেন। এই তীর্থ পর্য্যটনকালে তাঁহার জীবনে অনেক গুলি ঔপন্যাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। সে সকল ঐতিহাসিকের বর্ণনীয় নহে বলিয়া এখানে উল্লিখিত হইল না। যাহাহউক মীরাবাই যে সৌন্দর্য্যে ও ধর্ম্মপরায়ণতায় তৎকালে আদর্শ রমণী বলিয়া গণ্যা হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কুম্ভের জীবন-নাটকের শেষাঙ্ক।

কুম্ভ যে শুদ্ধ বীর ছিলেন এরূপ নহে। তিনি এক জন বিখ্যাত প্রেমিক ছিলেন। বীরপুরুষ মাত্রই প্রায় প্রেমিক হইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায়ই রমণীর উপাসক। বাপ্পা-রাউল্, আলেক্জাণ্ডার, নেপোলিয়ন্, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি জগতের প্রখ্যাতনামা বীরবৃন্দ সকলেই রমণীকুলের উপাসক ছিলেন। কুম্ভের প্রেম-পিপাসা শুদ্ধ মিরাবাইএ নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি ঝালাবর সামন্তের দুহিতার রূপ লাবণ্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া রাক্ষস-বিবাহ করেন। মণ্ডোর রাজকুমারের সহিত এই রমণীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই ঘটনায় মিবা-রের সহিত মণ্ডোরের পূর্ব্ব শত্রুতা বলবতী হইয়া উঠিল। মণ্ডোর রাজকুমার নিজ ভবিষ্য ভার্য্যার উদ্ধারের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না। মণ্ডোর রাজকুমারের জীবন অতঃপর বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিল। শরতের বিমল রজনীতে মণ্ডোরের দুর্গ হইতে কুম্ভমীর দুর্গের ভীতি-সৌধ স্পষ্ট দেখা যাইত। মণ্ডোর রাজকুমার সেই নিভৃত কক্ষে বসিয়া এক দৃষ্টিতে সেই ভীতি-সৌধের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন।

কারণ তাঁহার প্রাণেশ্বরী সেই সৌধে বাস করিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রিতে সৌধের ধবলতা মাত্র উপলব্ধি হইত। কিন্তু অন্ধকার রজনীতে সেই সৌধের দীপালোক হইতে কিরণ আসিয়া তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করিত। যুবরাজ আর বিচ্ছেদ-যাতনা সহিতে অক্ষম হইয়া এক রজনীতে সেই কুম্ভমীর দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি মই লাগাইয়া সেই প্রীতি-সৌধে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন এমন সময় প্রহরীরা জানিতে পারিল। তিনি এক লম্ফে নামিয়া বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিলেন। এই জন্য একটী প্রবাদ হইয়া আছে যে "তিনি ঝাল (জঙ্গল) ভেদ করিয়া গিয়াও ঝালানীকে (ঝালাবর রাজনন্দিনী) পাইলেন না।"

কুম্ভের রাজত্বকাল অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইল। এই পঞ্চাশৎ বৎসরে তিনি রাজ্যের সমস্ত শত্রুকে পরাজিত, সুদৃঢ় দুর্গাবলী দ্বারা ইহাকে সুসংরক্ষিত, এবং অপূর্ব্ব মন্দিরমালাদ্বারা ইহাকে পরিশোভিত করিয়া মিবারের নাম জগদ্ব্যাপি করিয়া তুলেন।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম মিবার-বক্ষে অনন্তকালের জন্য অমর-বর্ণে অঙ্কিত করেন। তদীয় রাজ্যের যে পঞ্চাশত্তম বৎসরে তাঁহার সামন্তবর্গ ও প্রজাগণ একতানে ও এক প্রাণে তাঁহার প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রদর্শনার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চাশৎ বৎসরের রাজত্ব উৎসব বা জুবিলি করিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, সেই শুভ বৎসরেই (সম্বৎ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ ১৪৬৯) এক লোমহর্ষণ ব্যাপার দ্বারা তাঁহার সামন্ত ও প্রজাবর্গের সেই উৎসব বিষাদে পরিণত করে। এক গুপ্ত হত্যাকারীর অতর্কিত ও অদৃষ্ট অস্ত্রে এই মহাপ্রাণ, মহাবীর ও মহাপ্রবীণ এবং প্রজাবৎসল ও প্রজাপ্রাণভূত নরপতির জীবনাভিনয়ের পরিসমাপ্তি হয়। এ গুপ্ত হত্যাকারী আবার যে কেহ নহে। তদীয় পুত্র উডাই এই জঘন্য কার্য্য-

দ্বারা আপনাকে, সেই পবিত্র পিতৃবংশকে, ও পবিত্র হিন্দু-নামকে চিরকলঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। এই পিতৃহত্যা উজ্জ্বল হিন্দুইতিহাসে অতিগভীর কালিমারেখা অর্পণ করিয়াছে! এরূপ রাজার এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে সমস্ত মিবারবাসী শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রতি গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রতিগৃহস্থ শোক-চিহ্ন ধারণ করিল। এরূপ বিশ্ব-ব্যাপিনী শোকাভিভূতি ভারতে আর একবার মাত্র অনুভূত হইয়াছিল। যে দিনে রাণা বংশের আদি পুরুষ রামচন্দ্রের অভিষেক বন-নির্ব্বাসনে পরিণত হয়, সেই দিনে কেবল প্রজা-গণ বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে এইরূপ কাঁদিয়াছিলেন! কুম্ভ! তুমি মরিলে বটে, কিন্তু তোমার স্মৃতি তোমার প্রজা-মণ্ডলীর হৃদয়-ক্ষেত্রে অনন্তকালের জন্য জীবিত রহিল! এরূপ মৃত্যু শোচ্য নহে!

রাণা উডা হাতিয়ারো বা পিতৃ-হন্তা

রাণা উডা অস্বাভাবিক দুরাকাঙ্খার বশবর্ত্তী হইয়া পিতার দীর্ঘ জীবন সহিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিয়া তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দুর্দ্দমনীয় রাজ্যপিপাসায় উপ-হত-বিবেক হইয়া সিংহাসন-প্রাপ্তির আশায় মিবার-কহিনুর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে হাতে হাতে করিতে হইল। মিবারবাসিগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা—তাঁহাকে অতঃপর হাতিয়ারো বা পিতৃহন্তা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কেহ তাঁহার নিকটে যাইতনা—কেহ তাঁহার নামও মুখে উচ্চারণ করিত না। আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি অন্তশ্চর সামন্তবর্গ ও বহিশ্চর রাজন্যবর্গের শরণাপন্ন হইলেন। যে মিবারের মহিমা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সময়ে দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল, সে মহিমা যেন সহসা রাহুগ্রস্ত হইল। তিনি দেওরা সামন্তকে আবু প্রদেশে

স্বাধীন করিয়া দিলেন। এবং মিত্রতার মূল্যস্বরূপ যোধপুরাধিপতি* যোধাকে সম্বর, আজমীর, এবং নিকটবর্ত্তী জেলা সকল প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

পিতৃহন্তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

তিনি বুঝিলেন যে তিনি কাহারও নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি বা সম্মানের আশা করিতে পারেন না। তিনি বুঝিলেন যে যে সকল রাজন্য ও সামন্ত তাঁহার সাহায্য করিতেছেন সে কেবল রাজ্য লোভে। যতদিন তিনি নিজরাজ্যের অংশ দিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য-পিপাসা শান্তি করিতে পারিবেন, ততদিনই কেবল তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য পাইতে পারিবেন। সুতরাং তিনি রাজ্যের অংশ দিয়া সাহায্য ক্রয় করা অপেক্ষা, দিল্লীর সম্রাটকে কন্যা দান করিয়া তাঁহার নিকট নিজ অবৈধ উপায়ে রাজ্যপ্রাপ্তির অনুমোদন ভিক্ষা অধিকতর সম্মানের বিষয় মনে করিলেন। কিন্তু বিধাতা এ ঘোর অপমান ও কলঙ্ক হইতে বাপ্পারাউলের বংশকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের বজ্রঅস্ত্রধারণ করিলেন। পিতৃহন্তা দিল্লীশ্বরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেওয়ান খানা হইতে যেমন বাহির হইয়াছেন, অমনি স্বর্গ হইতে বিদ্যুদ্দণ্ড তদীয় মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিল। এইরূপে সিসোদিয়া বংশের কুলাঙ্গার উডা পঞ্চ বৎসরের অবৈধ ঘৃণিত রাজত্বের পর অকালে কাল কবলে পতিত হইলেন। তদীয় মৃত্যুতে একবিন্দু শোকাশ্রু পতিত হইয়া পবিত্র মিবারক্ষেত্রকে দূষিত করিলনা।

* যোধা উডার সিংহাসনাধিরোহণের দশবৎসর পূর্ব্বে (১৫১৫ সম্বৎ) ায় রাজধানী যোধপুরে স্থাপনা করেন।

রায়মল্ল।

রায়মল্ল রাণা কুম্ভের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কুম্ভের সিংহাসনাধিকারী। ঝুনুঝুনুর যুদ্ধে জয়লাভের পরঅবধি কুম্ভ সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বেই নিজ তরবারীকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার চক্রাকারে ঘুরাইতেন। এই গূঢ় সমস্যার উদ্ভাবন করিতে অত্যন্ত কৌতূহলী হওয়ায় কুম্ভ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। তাহাতেই কুম্ভের সিংহাসনে কনীয়ান্ পুত্র উড়ার অধিকার জন্মে- এবং সেই লোভেই তিনি চ্যুতধৈর্য্য হইয়া পিতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হন। পিতৃহত্যার সংবাদ পাইয়া রায়মল্ল মিবারে আগমন করেন, এবং অবিরাম সংঘর্ষের পর উড়াকে রণে পরাজিত করেন। সেই পরাজয়ের পরই উড়া দিল্লীতে পলায়ন করেন, এবং নিজ কন্যা দিয়া দিল্লীশ্বরের সাহায্য-ভিখারী হন।

রাণা রায়মল্ল ১৫৩০ সম্বৎ বা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্ববিক্রমে কুম্ভের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে রায়মল্ল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পিতৃহন্তা দিল্লীর সম্রাটের শরণাপন্ন হন, ও তাঁহার সাহায্যের নিষ্ক্রয়স্বরূপ তাঁহাকে নিজ দুহিতা সম্প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বাপ্পারাউলের পবিত্র বংশ এই ঘোর কলঙ্ক হইতে রক্ষা পায়। অপঘাতে তাঁহার মৃত্যুতে দিল্লীশ্বরের হৃদয় ব্যথিত হয়। দিল্লীশ্বর শরণাগতবাৎসল্য-পরতন্ত্র হইয়া পিতৃহন্তার দুইপুত্র সেহেশমল্ল ও সূরজমল্লকে লইয়া মিবার আক্রমণ করেন। যবন-সম্রাট সিঘাড়া নগরে (বর্ত্তমান নাথাদ্বরা) গিয়া সৈন্যাবাস স্থাপন করেন। মিবারের সামন্তবর্গ সিংহাসনের বৈধ অধিকারী রায়মল্লের প্রতি অবিচলিত-ভক্তি ছিলেন। সুতরাং রায়মল্ল তাঁহাদিগের এবং আবু ও গির্ণারের মিত্র রাজদ্বয়ের সাহায্যে

অবিলম্বে অষ্ট পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং একাদশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। এই সমবেত সেনা লইয়া তিনি ঘাসা সমরক্ষেত্রে যবন-সম্রাট ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল রণ হইল। সমীপবর্ত্তিনী নদী সকল অবিরাম শোণিত বহন করিতে লাগিল। পিতৃহন্তার পুত্রদ্বয় বিক্রমে কেশরী ছিলেন। সুতরাং রায়মল্লের সেনা তাঁহাদের বীরত্বে স্খলিত-পদ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু যে পক্ষে ধর্ম্ম, বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে সেই পক্ষই অবলম্বন করিলেন। রায়মল্ল সেই মহতী যবন সৈনাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন। যবন-সম্রাট্ রায়মল্লের পরাক্রমে এতদূর ভীত হইয়াছিলেন যে সেই যুদ্ধের পর আর মিবারে প্রবেশ করেন নাই।

জয়মল্লের বীরত্ব ও মহাপ্রাণতা।

এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ রায়মল্ল এক কন্যা গীর্ণারাধিপতি যদুবংশীয় শূরজীকে, ও অন্য কন্যা দেওরা বংশীয় সিরোহী নগরাধিপতি জয়মল্লকে সম্প্রদান করিলেন। এবং দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ যৌতুক স্বরূপ আবু প্রদেশে চিরস্থায়ী জায়গীর স্বরূপ জয়মল্লকে প্রদান করিলেন। জয়মল্ল ঘাসা যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাদিগের উপর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাদিগের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। এবং তাঁহাদিগকে সৈন্য বিভাগে অতি উচ্চ পদ প্রদান করিলেন। তিনি বীরত্বে বাপ্পারাউল, হামীর ও রাণাকুম্ভ প্রভৃতি পিতৃপুরুষগণের ন্যূন ছিলেন না। তিনি সিংহাসনারোহণের পর অবধি নিরন্তর সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন। প্রত্যেক সমরেই তিনি বিজয় লাভ করিয়া শত্রুগণের ভীতি-স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মালবাধিপতি ঘিয়াসউদ্দীনকে অনেক গুলি নিয়মিত রণে

পরাস্ত করেন। এই সকল যুদ্ধে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের বীরত্বে সবিশেষ উপকৃত হন। ঘিয়াস উদ্দীন উপর্য্যুপরি সমরে পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট শান্তি ভিখারী হন। অবশেষে তিনি তাঁহার সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করিয়া রায়মল্লের নিকট শান্তি ক্রয় করেন। এই সমরের পর লোদীবংশীয় সম্রাটগণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাদিগের সহিত মিবা-রের উত্তর সীমা লইয়া রাণার কিছুকাল সংঘর্ষ চলে।

রায়মল্লের তিনটী পুত্র সন্তান জন্মে,—সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, ও জয়মল্ল। তিন জনই রাজপুত ইতিহাসে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সঙ্গ দিল্লীশ্বর বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং পৃথ্বীরাজ বীরত্বে ভীমোপম। ইঁহারা দুইজনে ঝালী রাণীর গর্ভজাত। জয়মল্ল অন্য রাণীর গর্ভে উৎপন্ন, সুতরাং সঙ্গ ও পৃথ্বীরা-জের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সঙ্গ রণে অজেয় ছিলেন বলিয়া "সংগ্রাম-সিংহ" নামেও অভিহিত হইতেন। রায়মল্লের দুর্ভাগ্যতা নিবন্ধনতা তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মধুময় ভ্রাতৃ-প্রেমের পরিবর্ত্তে বিষময় বিদ্বেষ ভাব বদ্ধমূল হয়। এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ মিবার ও মিবারাধিপতির নিরন্তর অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। ভ্রাতৃত্রয়ের পরস্পর বিদ্বেষ যে শুদ্ধ তাঁহা-দিগের হৃদয়কে কলুষিত করিয়া নিরস্ত হয় এরূপ নহে; ইহার বাহ্য বিস্ফুরণে মিবার রাজ্য ও রাজ পরিবার নিরন্তর দগ্ধ হইয়াছিল। এই সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে বোধ হয় রায়-মল্লের রাজত্বকাল তদীয় যে কোন পূর্ব্বপুরুষের রাজত্বকালের সমতুল হইতে পারিত। কিন্তু যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহাতে ইহা নিরন্তর অন্তর্বিপ্লবে সম্পূর্ণ বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছিল। সঙ্গ আত্ম জীবন রক্ষার জন্য অগ্রেই মিবার হইতে স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত হন। দ্বিতীয় পুত্র পৃথ্বীরাজের দুর্দ্দমনীয়তা নিবন্ধন রায়মল্ল তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিতে বাধ্য হন। তৃতীয় পুত্র জয়মল্ল পতঙ্গবৎ নিজ কামানলে

পতিত হইয়া ভস্মীভূত হন। দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া তিনি গুপ্তহত্যাকারীর অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

রায়মল্লের পুত্রগণের সংঘর্ষ।

পৃথ্বীরাজ আপনাকে স্বার্থকনাম্মা করিবার জন্য সর্ব্বদা রণে অবতীর্ণ হইতেন। যখন রাজ্যে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখনও তিনি সামান্য সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করিয়া নিজের অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য আজও মিবারবাসীগণের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আজও বীরের নামোল্লেখ কালে তাঁহারই নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে। পৃথ্বীরাজ বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন বটে, কিন্তু ভীমের ন্যায় তাঁহারও আত্মসংযমশক্তি ছিল না। সামান্য বিষয়ে তিনি উত্তেজিত হইয়া নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে যাইতেন। ইহাতে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া রায়মল্ল তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। সঙ্গ ইহার ঠিক বিপরীত প্রকৃতির লোক ছিলেন। যদিও তাঁহার সাহসিকতা পৃথ্বীরাজের সাহসিকতার ন্যূন ছিল না, তথাপি তিনি এরূপ সংযমী ও চিন্তাশীল ছিলেন যে তিনি সহসা কোন বিষয়ে উত্তেজিত হইতেন না। বিশেষ কারণ উপস্থিত না হইলে তিনি কখনই নিজ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিতেন না। অর্জ্জুনে ও ভীমে যে প্রভেদ ছিল, সঙ্গে ও পৃথ্বীরাজেও সেই ভেদ উপলব্ধি হইত। কিন্তু সঙ্গ পৃথ্বীরাজের জ্যেষ্ঠ এই মাত্র বিপর্য্যয়। সঙ্গ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিবেন—এচিন্তাও পৃথ্বীরাজের অসহনীয় হইত। এই জন্য তিনি প্রজাবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য স্থানে অস্থানে কালে অকালে নিজ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিতেন, এবং সর্ব্বদাই বলিতেন যে "বিধাতা নিশ্চয়ই আমায় মিবার শাসন করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন।" এক দিন তিন ভ্রাতায় বসিয়া খুল্লতাত সূরজ্‌মল্লের

সহিত সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় সঙ্গ বলিয়া উঠিলেন যে “যদিও তিনি মিবারের দশ সহস্র নগরের ভাবী উত্তরাধিকারী, তথাপি তিনি তাঁহার স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি নাড়ামুগরো পর্ব্বতোপরি * স্থাপিতা চারুণী দেবীর পুরোহিতার সঙ্কেত চিহ্ন তাঁহার প্রতিকূল হয়।' এই প্রস্তাবের পর তাঁহারা সকলেই সেই স্থানে গমন করেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল সর্ব্বাগ্রে তথায় গিয়া উত্তীর্ণ হইয়া এক আস্তীর্ণ শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন। সঙ্গ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পুরোহিতার ব্যাঘ্র চর্ম্ম বিস্তারিত রহিয়াছে দেখিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। সুরজমল্ল সর্ব্ব পশ্চাতে আসিয়া দেখিলেন যে বসিবার আর আসন নাই। তখন তিনি একটী জানু সঙ্গাধিকৃত সেই ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনের উপর রাখিয়া অপর জানু উত্তোলিত করিয়া বসিলেন। সকলে সমাসীন হইলে পৃথ্বীরাজ আপনাদিগের আগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পুরোহিতা সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে “যিনি ঐ সিংহাসনে † উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন; এবং যিনি এক জানু উক্ত সিংহাসনে রাখিয়া অপর জানু উচ্চ করিয়া বসিয়াছেন, তিনি রাজ্যের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র প্রাপ্ত হইবেন।” রোমিউলস্ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রীমস্‌কে যেরূপে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আজ পৃথ্বীরাজ পুরোহিতার লাক্ষণিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ঠিক সেই ভাবে অসি নিষ্কোশিত করিয়া জ্যেষ্ঠের অভিমুখে

* এই পর্ব্বত উদয়পুরের পঞ্চ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব বলিয়া এই পর্ব্বতকে লোকে “ব্যাঘ্র-পর্ব্বত”ও বলিয়া থাকে।

† সিংহ বা ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন।

ধাবিত হইলেন। সুরজমল্ল মধ্যে আসিয়া বাধা না দিলে সেই উদ্যত অসি নিশ্চয়ই সঙ্গের দেহকে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিত, ও পুরোহিতার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইত। কিন্তু সুরজমল্ল তাহা হইতে দিলেন না। তিনি নিজে ক্ষত বিক্ষত দেহ হইয়া মিবারের মুকুটমণি সঙ্গের জীবন রক্ষা করিলেন। সঙ্গ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু অক্ষত শরীরে যাইতে পারিলেন না। পৃথ্বীরাজের খড়্গ তাঁহার শরীরে পঞ্চ ক্ষত চিহ্ন অঙ্কিত করিল; এবং তদীয় তীর জন্মের মত সঙ্গের একটী চক্ষু অন্ধ করিয়া দিল। জয়মল্ল পলায়মান সঙ্গের অনুসরণ করিলেন। এদিকে সুরজমল্লে ও পৃথ্বীরাজে ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের খড়্গাঘাতে ক্ষত বিক্ষত শরীর হইলেন। বীরত্বে উভয়েই জগতে অতুলনীয়—সুতরাং কেহ কাহার নিকট পরাজিত হইবার নহেন। অবশেষে নিরন্তর রক্ত মোক্ষণে উভয়েরই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন পার্শ্বচরেরা উভয়কেই যুদ্ধস্থল হইতে লইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সঙ্গ চতুর্ভুজের মন্দিরাভিমুখে পলায়ন করিলেন; তিনি বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সাবন্তী প্রদেশ দিয়া গমন করিতে ছিলেন। তথায় তিনি এক দেব মন্দিরের সম্মুখে বিশ্রামার্থ অশ্ব থামাইলেন। মন্দিরাধ্যক্ষ বীডা তাঁহাতে অতি কষ্টে অশ্ব হইতে অবতারিত করিয়া যেমন মন্দির মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন, সেই সময়ই অনুসরণকারী জয়মল্ল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রয়দাতা অতিথিকে মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিতে বলিলেন, এবং স্বয়ং সেই আততায়ী রাজকুমারের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অতিথির প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের প্রাণোৎসর্গ করিলেন। ইত্যবসরে সঙ্গ মন্দিরের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিলেন।

সঙ্গের দৈবাভিষেক ও পরিণয়।

এদিকে পৃথ্বীরাজ ক্রমে ক্রমে ব্রণক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। সঙ্গও ভ্রাতার অক্ষালনীয় শক্রুতা হইতে আত্ম রক্ষা করিবার জন্য আত্মগুপ্তির বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। যিনি ভবিষ্যতে একদিন টাইমুর-বংশোদ্ভব দিল্লীর সম্রাট্ বাবরের বিরুদ্ধে রণস্থলে শত সহস্র সংখ্যক সৈন্য অবতারিত করিতে পারিয়াছিলেন, আজ সেই সঙ্গ গোপালনেও অসমর্থ বলিয়া যাহারা কৃষক গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল, এবস্তূত মেষপালকগণের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। আলফ্রেড্ দি গ্রেটের ন্যায় সঙ্গও রুটী প্রস্তুত করিতে গিয়া রুটী পুড়াইয়া ফেলায়, কার্য্যে "যোগ্যতাশূন্য আহার-পটু" বলিয়া তিরস্কৃত হইয়া-ছিলেন। মহাপুরুষগণের জীবনী এইরূপ বিপরীত ঘটনাবলীর সমাবেশেই গঠিত হইয়া থাকে। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত তাঁহাকে এই রূপ দুরবস্থায় পতিত দেখিয়া তাঁহাকে একটী দ্রুতগামী অশ্ব ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সংযোজিত করিলেন, এবং তাঁহাদিগের অধিনায়ক করিয়া শ্রীনগরাধি-পতি * রাও করিম্ চাঁদ প্রমরের নিকট গিয়া উপস্থিত হই-লেন। করিমচাঁদ তাঁহাদিগকে নিজ সৈন্যতালিকা-ভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সীমান্তবর্ত্তী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এক দিন এইরূপ আক্রমণ ব্যাপারে ক্লান্ত হইয়া সঙ্গ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এক বটবৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। তাঁহার ছোরার উপর মস্তক রাখিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং জয়সিংহ বলেও ও জৈমূসিন্দিল্ নামক দুই জন রাজপুত সহচর তাঁহার রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে তাঁহাদিগের অশ্ব সকল পার্শ্ববর্ত্তী শাদ্বল-

* এই শ্রীনগর আজমীরের অদূরে অবস্থিত

ক্ষেত্রে তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল। এরূপ সময়ে সূর্য্যকিরণ পত্র ভেদ করিয়া সঙ্গের মস্তকোপরি আসিয়া পতিত হইল। একটী বিষধর রৌদ্র পোহাইবার মানসে সঙ্গের মস্তকোপরি আরোহণ করিল, এবং কুণ্ডলিতদেহ হইয়া ফণা তুলিয়া তথায় বসিয়া রহিল। একটী দেবী পক্ষী এই সময় সেই বিষধরের ফণার উপর আসিয়া বসিল ও মনের উল্লাসে কত কি বুলি বলিতে লাগিল। মারু নামক একজন মেষপালক সেই সময় সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সেই পক্ষীকূজিতের অর্থ বুঝিত। সে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেই সঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মেষপালক নিদ্রোত্থিত সঙ্গকে জানাইলেন যে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। সঙ্গ তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সে গিয়া রাজাকে জানাইল যে তিনি একজন রাজচক্রবর্ত্তী দ্বারা অনুসেবিত হই-তেছেন। প্রমররাজ এ রহস্যের উদ্ভেদ করিলেন না এবং সঙ্গের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের প্রত্যয়ে তাঁহাকে এক কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর তিনি জামাতাকে সর্ব্ব প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যুর পর সঙ্গ পিতৃ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য চিতোরে আহূত হইলেন।

পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসন ও মিবারের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য।

যখন পৃথ্বীরাজের ভ্রাতৃহননোদ্যমের সংবাদ রায়মল্লের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া পৃথ্বীরাজকে নিজরাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিলেন এবং নিষ্কাশন সময়ে বলিলেন যে তিনি আপন বীরত্ব ও দ্বন্দ্বপ্রিয়তা বৃত্তির চালনা দ্বারা যথা ইচ্ছা তথা যাইয়া আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। পৃথ্বীরাজ পঞ্চ জন অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র লইয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোদ্ওয়ার প্রদেশস্থ

বলেহ নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অতীত রাজত্বের শোচ-নীয় পরিণামের পর এই সকল অন্তর্বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ায় মিবার রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই অন্তর্দ্দৌ-র্ব্বল্য নিবন্ধন আরাবলী পর্ব্বতের অধিবাসীগণ এতদূর নির্ভয় হইয়া উঠিল যে তাহারা গোদ্ওয়ারের রাজধানী নাডোল্-দুর্গে অবস্থিত রাজপুত সেনাকে তুচ্ছ করিয়া সদলে মিবারের সমতলক্ষেত্রে পড়িয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। পৃথ্বীরাজ নাডোলে আসিয়া এই সংবাদ পাইয়া তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এক মণিকারের বিপণিতে নিজের বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিয়াছিলেন, সুতরাং সে রাজকুমারকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল। পৃথ্বীরাজ মণিকারের সাহায্যে নিজের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন। এক্ষণে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে গোদ্ওয়ার প্রদেশ পুনরাধিকার করিয়া পিতাকে দেখাইবেন যে পৃথ্বীরাজ পিতৃ-অনুগ্রহ বিনাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

তৎকালে মীন বংশীয় ভূস্বামিগণ এই গোদ্ওয়ার প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। রাজপুতেরা এই প্রদেশ জয় করিয়া কিছু দিন অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রায়মল্লের রাজত্বের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্যের সুবিধা পাইয়া মীনবংশীয় এক জন রাউত স্বাধীনতা-ধ্বজা উড্ডীন করিলেন এবং সমতল ক্ষেত্রস্থিত নাডোলেয়ী নগরে নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। মীন-রাজ এরূপ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে অনেক রাজ-পুত তদীয় সেনার মধ্যে প্রবেশ করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত বণিক ওজার পরামর্শানুসারে পৃথ্বীরাজ ও তদীয় সহচরবর্গও মীন রাজের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই প্রদেশে বৎসরে বৎসরে আহেরীয়া বা মৃগয়োৎসব নামে একটী উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব-উপলক্ষে সকল কর্ম্ম-

চারীই আপন আপন পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া উৎসব করিতে অনুমতি পাইতেন।

পৃথ্বীরাজের বিজয়।

প্রথমতঃ বোধ হয় এই প্রথা মৃগয়াশীল ব্যক্তিগণে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমে ইহা সার্ব্বজনিক উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পৃথ্বীরাজও এই উৎসব-উপলক্ষে গৃহে গমন করিতে অনুমতি পাইলেন। তিনি গৃহ-গমন-ব্যপদেশে নগর হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী কোন ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া নিজ ষড়যন্ত্রের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি নগর হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহচরবর্গকে অসহায় মীন রাজকে বধ করিবার জন্য নগর মধ্যেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সমস্ত সৈনিক কর্ম্মচারীই তৎকালে উৎসবোপলক্ষে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং নগর প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। এই সুযোগে পৃথ্বীরাজের অনুচরবর্গ মীনরাজকে আক্রমণ করে। মীনরাজ বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রাণভয়ে নগর হইতে পলায়ন করেন। পৃথ্বীরাজও তাহাই অনুমান করিয়া অগ্র হইতে তাঁহার পলায়ন-পথের পার্শ্বে এক জঙ্গলমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। যেমন মীনরাজ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, অমনি পৃথ্বীরাজ তদভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন, এবং নিমেষমধ্যে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। মীনরাজ আত্মরক্ষার জন্য একটী কেশূল বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সুতীক্ষ্ণ বর্ষা তাঁহাকে সেই কেশূল বৃক্ষের সঙ্গে গাঁথিয়া, তাঁহার ঐহিক লীলা সমাপ্ত করিল। এইরূপে মীনরাজের প্রাণবধ করিয়া পৃথ্বীরাজ অবিলম্বে তদীয় রাজধানীতে অগ্নি প্রদান করিলেন। মীনীয়গণ অগ্নিদাহ হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশ্বাবসু সর্ব্বদিক্ হইতে সহসা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ

করায়, তাহাদিগের সে উদ্যম বিফল হইল। এইরূপে একে একে পৃথ্বীরাজ গোদ্‌বার প্রদেশের সমস্ত নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া মীনীয় বংশের পূর্ণ ধ্বংস বিধান করিলেন। দৈশূরী ও সোদ্‌গড় দুর্গ ব্যতীত সমস্ত গোদ্‌বার প্রদেশ অচিরকাল মধ্যে পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। দৈশূরী দুর্গ তৎকালে মদ্রেচ-বংশীয় সন্দ নামক ক্ষত্রিয়ের অধিকারে ছিল। আর সোলাঙ্কী-বংশীয় সর্দ্দ নামক একজন ক্ষত্রিয় সোদ্‌গড় দুর্গ অধিকার করিতেছিলেন। সঙ্গের পুত্র মদ্রেচের কন্যাকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে পৃথ্বীরাজ দৈশূরী দুর্গ সঙ্গকে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার অধীনতাক্রয় করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে দৈশূরী দুর্গ অধিকার করিয়া তাঁহাকেই সেই দুর্গ অর্পণ করিলেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত গোদ্‌-বার প্রদেশে পৃথ্বীরাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যে ষড়যন্ত্রে দৈশূরী দুর্গ হস্তগত হইল তাহা পরিশিষ্টে পরিব্যক্ত হইবে।

পৃথ্বীরাজের স্বদেশে গমন।

পৃথ্বীরাজের বিজয়বার্ত্তা রায়মল্লের কর্ণগোচর হইলে তিনি পুত্রকে সাদরে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। বিশেষতঃ কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্লের শোচনীয় মৃত্যু, ও পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গের নিরুদ্দেশ নিবন্ধন রায়মল্লের হৃদয় শোকে অভিভূত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ ভিন্ন মিবারের সিংহাসন অধিকার করিবার আর কেহ নাই দেখিয়া রায়মল্ল তাঁহাকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ বণিক্ ওজ্ঞা ও সোল্লাঙ্কী সামন্তের উপর গোদ্‌বার রাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করিয়া পিতৃ-রাজধানী চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রায়মল্ল পৃথ্বীরাজের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে ও গভীর স্নেহে গ্রহণ করিলেন।

জয়মল্লের শোচনীয় মৃত্যু ও রায়মল্লের মহাপ্রাণতা।

আমরা জয়মল্লের শোচনীয় মৃত্যুরকথা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে সংক্ষেপে সেই মৃত্যুর বিবরণ প্রদান করিব। রায় শূরতম বা সুরতন্ নামে সোলাঙ্কী বংশীয় এক নরপতি টোডা নগরের অধিপতি ছিলেন। পাঠানেরা তদীয় নগর অধিকার করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে নিষ্কাশিত করে। তিনি নিরুপায় হইয়া মিবার রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার অশেষ গুণসম্পন্না-অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী তারাবাই নাম্নী এক কন্যা ছিল। তারাবাই তৎকালে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। 'যে বীর পাঠানদিগকে টোডা হইতে তাড়াইয়া তথায় সুরতন্‌কে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন'—বলিয়া সুরতন্ ঘোষণা করেন। এই কন্যাপণ সত্ত্বেও জয়মল্ল অবৈধ রূপে রমণীর পার্শ্ববর্ত্তী হইতে চেষ্টা করেন। যদিও সঙ্গের অজ্ঞাতবাসে ও পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসনে জয়মল্লই মিবারের ভাবী রাণা বলিয়া বিদিত ছিলেন, তথাপি সুরতন কন্যাপণ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইহা জানিয়াও জয়মল্ল অবৈধ উপায়ে তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণের চেষ্টা করায়, তিনি অতিশয় অপমান বোধ করিলেন, এবং এই অপমান অসহনীয় হওয়ায় জয়মল্লের প্রাণসংহার করিলেন। সুরতন্ আজ মিবারের একজন সামান্য প্রজামধ্যে গণনীয় হইয়া মিবারের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী জয়মল্লের প্রাণবধ করিলেন—ইহাতে সকলেই স্থির করিল যে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইবে। বোধ হয় সুরতন ও তাহাই ভাবিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই সম্ভবপর ছিল। কিন্তু রায়মল্ল প্রকৃতিতে দেবোপম ছিলেন। হৃদয়-

মাহাত্ম্যে তিনি তদীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের কাহারও ন্যূন ছিলেন না। জয়মল্লের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছিলে তদীয় সৈন্য সামন্ত সকলেই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে পুত্রহন্তার প্রতি প্রতিহিংসা লইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রায়মল্ল অটল অচলের ন্যায় অবিচলিত ভাবে সেই মহাশোক সহ্য করিলেন এবং বলিলেন—"যে পিতা বিপদাপন্ন অবস্থায় আসিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই পিতার কুল গৌরবের হন্তা হইতে গিয়া জয়মল্ল প্রাণদণ্ডার্হ হইয়াছিল, সুতরাং সেই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার পুত্রের এই উপযুক্ত মৃত্যুতে রাজা হইয়া আমার শোক করা উচিত নহে; এবং সেই উপযুক্ত দণ্ডের বিধাতাকে দণ্ডিত না করিয়া বরং আমার পুরস্কৃত করাই উচিত।" রায়মল্ল যে শুষ্ক মুখে এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন এরূপ নহে—তিনি সোলাঙ্কীরাজ সুরতন্‌কে বেদনৌর রাজ্য প্রদান করিয়া নিজ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। তাঁহার এই অতিমানুষ সৎকার্য্যে হিন্দু-সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইল; ক্ষত্রিয় কুলের গৌরব বৃদ্ধি পাইল; এবং অনন্তকালের জন্য তাঁহার নাম ভারতেতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হইল। ধন্য রায়মল্ল! ধন্য তোমার সমদর্শিতা! ধন্য তোমার ন্যায়-পরতা! ধন্য তোমার গুণগ্রাহিতা! এবং ধন্যাদপি ধন্য তোমার মহাপ্রাণতা! ব্রিটনবাসী! রায়মল্লের ন্যায়পরতা ও মহাপ্রাণতার সহিত তোমাদের অনুদার-নীতি ও প্রতিহিংসাবৃত্তির একবার তুলনা কর। দেখিবে এতদুভয়ে স্বর্গ নরক প্রভেদ! আজ রায়মল্ল! তুমি ক্ষত্রোচিত চরিত্র-মাহাত্ম্যে যুগপৎ-জগৎ-পূজিত হইলে ও জগৎ বিজিত করিলে। প্রকৃত বীরের হৃদয় যে মহানভাবে উদ্বোধিত তাহা তুমি আজ জগৎ-সমক্ষে নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলে।

পৃথ্বীরাজের সঙ্কল্প।

জয়মল্লের শোচনীয় মৃত্যুই পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে মুক্তির প্রধান কারণ। তিনি পিতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বহুদিনের পর চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন। চিতোরে আসিয়া তিনি জয়মল্লের সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সবিশেষ বিবরণ অবগত হইলেন। ভ্রাতা যে টোডা দুর্গ পুনরাধিকার করিতে অক্ষম হইয়া অবৈধ উপায়ে সেই জগল্লনামভূতা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বীরা রমণী তারাবাইএর পাণি-গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন, আজ বীরবর পৃথ্বীরাজ সেই টোডা দুর্গ অধিকার করিয়া বৈধ উপায়ে সেই রমণীরত্নের প্যাণি গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে বীরা রমণী একদিন করধৃতধনুর্ব্বাণ ও পৃষ্ঠে কৃততূণীর হইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে রণস্থলে নিরন্তর পৃথ্বীরাজের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইবেন, আজ পৃথ্বীরাজ কল্পনার তালিকায় সেই রমণীমূর্ত্তি হৃদয়ফলকে চিত্রিত করিলেন, এবং সেই রমণী-রত্নকে পাইবার জন্য টোডাধিপতি পাঠানরাজ লীল্লাকে পরাজিত করিয়া টোডা দুর্গ রাও সুরতনকে প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বেদনৌরে আসিয়া রাও সুরতনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যদি তিনি এই দুর্গ অধিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি আর আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবেন না।

পৃথ্বীরাজ ও তারাবাই।

এদিকে তারাবাইও পূর্ব্ব হইতেই পৃথ্বীরাজের রূপ গুণ ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বীরত্বরত্নাকর রূপগুণাধার পৃথ্বী-রাজ স্বয়ং পিতৃ-সদনে উপস্থিত দেখিয়া তিনি তদীয় অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হইতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। উভয়েই উভয়ের হৃদয়-

সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। পৃথ্বীরাজের প্রার্থনা মতে অবিলম্বে যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন হইল। রণপ্রিয়া তারা-বাইও পিতৃ-অনুমতি লইয়া রণ সজ্জায় সজ্জিতা হইলেন। আজ রণসঙ্গিনী রণ সাজে সাজিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বারোহী রণবীরের সঙ্গে সঙ্গে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলেন।

টোডা গ্রহণ ও পৃথ্বীরাজের বিবাহ।

আজ মহরমের দিন। টোডা নগরের সমস্ত মুসলমান আজ শোকোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। সকল মুসলমানই বক্ষ তাড়ন দ্বারা ইমাম ও হোসেনের শোক নবীভূত করিতে-ছেন। বীর পতি ও বীরা পত্নী পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে টোডা নগরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। দম্পতী আসিয়া দেখিলেন যে মহরমের তাজিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহারা অশ্বারোহীদিগকে নগরের বাহিরে রাখিয়া অনুগত ও বিশ্বস্ত সেনগড়াধিপতিকে মাত্র সঙ্গে করিয়া সেই জন স্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। ক্রমে সেই জনস্রোত টোডাপতির প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইল। টোডাধিপতি লীল্লা সেই উৎসবে যোগ দিবার জন্য তৎকালে সজ্জিত হইতে ছিলেন। সেই জনস্রোতের মধ্যে তিনটী অপরিচিত লোক দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আকুলিত হইল। তিনি সেই অপরিচিত ব্যক্তিত্রয়ের পরিচয় লইতেছিলেন, এমন সময় সহসা পৃথ্বী-রাজ ও তারাবাইএর শর আসিয়া তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বীর পুরুষ ও বীরা নারীর অব্যর্থ শর-সন্ধানে টোডাপতির এরূপ হঠাৎ মৃত্যুতে সকলেই বিস্মিত হইল ও সমস্ত নগরীতে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। এই আকস্মিক চমকের ও স্তব্ধ ভাবের সুবিধা লইয়া সেই অশ্বারোহিদ্বয় ও অশ্বারোহিণী তাড়িতবেগে নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। সহসা লীল্লার এক শিক্ষিত হস্তী আসিয়া তাঁহাদিগের বহির্গমনের পথ রোধ করিল। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি নির্ভীক বীরা রমণী এই সঙ্কটে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন না। বীর্য্যবতী তারাবাই নিমেষমধ্যে করধৃত অসির প্রহারে গজপতির শুণ্ডাদণ্ড তদীয় বিশাল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হস্তী ভয়চকিত ও যাতনায় অধীর হইয়া প্রচণ্ডবেগে পলায়ন করিল। বীরদ্বয় ও বীরা রমণী সেই অবসরে সেই পঞ্চ শত সংখ্যক রাজপুত সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন।

টোডা গ্রহণ ও পৃথ্বীরাজের বিবাহ।

ইত্যবসরে পাঠানেরাও ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। জয়লক্ষ্মী কিছুকাল সংশয়িতভাবে রহিলেন, কিন্তু পরিশেষে ক্ষত্রিয়তেজ পাঠানগণের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা সেই অসহনীয় তেজ সহিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে তারাবাইই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শৌর্য্য প্রদর্শন করেন, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই অসমসাহস, বীরত্ব, ও শৌর্য্য নিবন্ধন আজ রাজপুতগণ রণে অজেয় পাঠানগণের উপর জয় লাভ করিলেন। আজ পৃথ্বীরাজকে পতিরূপে পাইবার জন্য—পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য—তারাবাই আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তিনি জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বাগ্রে রণানলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবং ভগবতী মহাশক্তিরূপিণী হইয়া এই বিষম রণে জয় লাভ করিলেন। ধন্য তারাবাই! ধন্য তোমার বীরত্ব! ধন্য তোমার পতিভক্তি! ঐ দেখ আজ তোমার সর্ব্বসংহারিণী শক্তির নিকট অসংখ্য পাঠান বলি পড়িয়া মৃতদেহে রণস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! ঐ দেখ মৃতাবশিষ্টেরা তদ্ভয়ে রণ-স্থল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে! বীরা রাজপুত

রমণী অসি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার প্রচণ্ড আঘাতে হস্তীর হস্ত ছেদন করিতেছেন—রণে দুর্দ্ধর্ষ্য যবন-কুলকে নির্ম্মূল করিতেছেন—এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভারত-পুণ্য-ক্ষেত্রে আবার সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। জানিনা আবার কবে ভগবতী মহাশক্তি ভারতের ললনাকুলকে অনুপ্রাণিত করিবেন! সেই মহাশক্তি একদিন গ্যারিবল্ডী রমণী আনিটাতে আবির্ভূত হইয়া ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারীবল্ডীর প্রধান সহায় হইয়া-ছিলেন। সেই উদ্দীপনা বলেই গ্যারিবল্ডী অতিমানুষ কার্য্য-কলাপ করিতে পারিয়াছিলেন। আজ পৃথ্বীরাজ প্রস্ফুরিত মহাশক্তি তারাবাইএর সাহায্যে টোড়াদুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গোপরি আবার হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিলেন!

তারাবাই ও পৃথ্বীরাজ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ।

টোডা অধিকার করিয়া পৃথ্বীরাজ রাও সুরতন্‌কে তাহা প্রদান করিলেন। সুরতন্‌ও অঙ্গীকৃত পণ অনুসারে টোডা-গৃহীতা পৃথ্বীরাজকে যথাবিধানে কন্যা সমর্পণ করিলেন। বীরনারী বীরভোগ্যা আর বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সুতরাং বীরবর পৃথ্বীরাজ নিজ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তারাবাইকে পাইয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। তিনি বসুন্ধরাকে তারার সপত্নী করিবার জন্য মহাব্যাকুল হইলেন। নবদম্পতী পরি-ণয়ের পর কমলমীর প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ ইহার পর অনেক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই তারাবাই স্বামিপার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়া রমণীকুলের গৌরব বৃদ্ধি করেন। রাজপুতানা এই বীর-দম্পতীর বিজয়-সৌভাগ্যে নিরন্তর গৌরবান্বিত হইতে লাগিল। এই

বীর-দম্পতী দীর্ঘজীবন লাভ করিলে, বোধ হয় ভারত যবন-শূন্য হইত। ভারত ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ করিত।

সূরজমল্ল ও পৃথ্বীরাজ।

এদিকে খুল্লতাত সুরজমল্লও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্লের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিয়া তাহার সুবিধা লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প অনেক পরিমাণেই সিদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গের নিরুদ্দেশ, পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসন ও জয়মল্লের মৃত্যু—এই সুযোগত্রিতয় যুগপৎ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাহার সুবিধা লইতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। আবার তিনি পিতৃহন্তা পিতার উত্তরাধিকারীত্বসূত্রে মিবারের সিংহাসন দাবী করিতে লাগিলেন। মিবারের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন তাঁহারও যথেষ্ট পক্ষবল যুটিল। দেবসেবয়িত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী কখন ব্যর্থ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তিনি লক্ষরাণার অন্য-তর পুত্র সারঙ্গদেবের সহিত মিবারের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। পুরোহিতা তাঁহাকে রাজ্যের অংশ-ভাক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে রাজ্যের অংশমাত্র তাঁহার অধিকার, এই জন্য "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" 'যখন সব যায় যায় হয়, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধেক দিয়া অর্দ্ধেক রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন'—এই নীতি অনুসারে তিনি মিবারের অপরার্দ্ধ সারঙ্গদেবকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সহকারিতা ক্রয় করিলেন। পরে উভয়ে মালবের সুল্‌তান মুজঃফরের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার নিকট সৈন্য সাহায্য লইয়া তাঁহারা মিবারের দক্ষিণ সীমা আক্রমণ করিলেন। অনতিকাল মধ্যে সদ্রি, ও রাটুরো দুর্গ—ও নাই হইতে নীমক পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড তাঁহাদিগের করতলস্থ

হইল। তাঁহারা সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সূরজমল্ল ও সারঙ্গদেব কর্ত্তৃক মিবার আক্রমণ।

তখন রায়মল্ল উপস্থিতমত সৈন্য লইয়া চিতোর-গিরি হইতে অবতরণ করিলেন। গম্ভীরী নদীতীরে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। রাণা সামান্য পদাতিক সৈন্যের ন্যায় পাদচারে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। রাণা তদীয় বীর দেহে দ্ব্যধিক-বিংশ সংখ্যক ক্ষত ধারণ করিলেন। অপর্য্যাপ্ত রক্ত মোক্ষণে তিনি ক্রমে অবশেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। এমন সময় পৃথ্বীরাজ এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবানই যেন মরণো-ন্মুখ রাণাকে রক্ষা করিবার জন্য এই দৈবী সেনা প্রেরণ করি-লেন। সেই নির্ব্বাণোন্মুখ রণ আবার নবীভূত হইয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজ খুল্লতাত সূরজমল্লকে লক্ষ্য করিয়া অবিরাম অস্ত্র প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিমেষমধ্যে সূরজমল্লের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষেই অসংখ্য সৈন্য সমর-শায়িত হইতে লাগিল। তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। কোন পক্ষই যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। অবশেষে উভয় পক্ষই একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন উভয় সেনাই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া পরস্পরের দৃষ্টির সম্মুখে আপন আপন সৈন্যাবাসে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ ও সূরজমল্লে সাক্ষাৎ।

পৃথ্বীরাজের সহিত রায়মল্লের এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি স্বদেশে আসিয়াই যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, এবং শ্রবণ

করিয়াই স্বসৈন্যে পিতৃ-সাহায্যার্থ রণস্থলে উপস্থিত হন। এই বিশ্রাম কালে সর্ব্ব প্রথমেই তিনি সূরজমল্লের শিবিরে গমন করেন। বীরের প্রতি বীরের আসক্তি স্বভাবসিদ্ধ। আজ পৃথ্বীরাজ সেই স্বাভাবিকী আসক্তির বশীভূত হইয়া খুল্লতাতের দর্শন-পিপাসায় তদীয় শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষত্রিয় রণস্থল ব্যতীত অন্যস্থলে শত্রুকে আঘাত করেন না। অভ্যাগত অতিথি পরম শত্রু হইলেও তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন। পৃথ্বীরাজ এই ক্ষত্র ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া একাকী নির্ভীক চিত্তে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিলেন। পৃথ্বীরাজ শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন—খুল্লতাত পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধ-হেলিত অবস্থায় শয়ান রহিয়াছেন, ও এক-জন অস্ত্রচিকিৎসক তাঁহার ক্ষতগুলি শেলাই করিয়া দিতেছেন। পৃথ্বীরাজকে সহসা সম্মুখে দেখিয়াই সূরজমল্ল শয্যা হইতে উঠিলেন—যেন কোন মনান্তর ঘটে নাই। এই ঝটিতি-উত্থানে তাঁহার ক্ষত গ্রন্থির অনেক গুলি ছিঁড়িয়া গেল - এবং রুধির-স্রাবে তাঁহার দেহ ভাসিয়া গেল। এই বীরদ্বয়ের যে কথোপ-কথন হইল তাহা শুনিলে শরীর ও মন বিস্ময়রসে অভিভূত হয়। পাঠক! একবার সেই বীরদ্বয়ের কথোপকথন শ্রবণ করুন।

পৃথ্বীরাজ। ভাল, কাকা! তোমার ক্ষত গুলি কেমন আছে?

সূরজমল্ল। বৎস! তোমার দর্শনজনিত সুখে সে গুলি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে।

পৃথ্বীরাজ। কাকা! এখনও আমি দাওয়ানজীকে* দেখি-নাই। আমি সর্ব্ব প্রথমেই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। কিছু কি খাবার আছে?

---

* মিবারের রাণাগণ ভগবান্ এক লিঙ্গের দাওয়ান্‌জী বলিয়া কথিত হইতেন।

তৎক্ষণাৎ উভয়ের আহারের আয়োজন হইল। অবিলম্বে চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়-পরিপূরিত ভোজনপাত্র উভয়েরই সম্মুখে আনীত হইল। সেই অসাধারণ বীরযুগল একপাত্রে ভোজন করিলেন। বিদায় কালে সুরজমল্ল পৃথ্বীরাজের হস্তে একটী পানের খিলি প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরাজ নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহা চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ। কাকা! তবে কল্য প্রত্যুষে আমরা আমাদের যুদ্ধের অবসান করিব।

সুরজমল্ল। বৎস! আচ্ছা তাহাই হইবে। খুব প্রত্যুষে আসিও।

পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।

গম্ভীরী নদীতীরে মহারণ।

প্রত্যুষে পূর্ব্বকথিত মত পৃথ্বীরাজ ও সুরজমল্ল রণস্থলে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সারঙ্গদেব এই যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার দেহ পঞ্চ ত্রিংশ ব্রণ-লাঞ্ছনে বিভূষিত হইল। চারি ঘণ্টাকাল উভয় পক্ষ রণোন্মত্ত হইয়া নিরন্তর পরস্পরের উপর তরবারি ও বর্ষা প্রক্ষেপ করিলেন। উভয় পক্ষেই অসংখ্য রাজপুত সমরশায়ী হইলেন। কিন্তু অবশেষে বিজয়-লক্ষ্মী পৃথ্বীরাজেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া সদ্রি-অভিমুখে পলায়ন করিলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজ বিজয় ধ্বজা উড়াইতে উড়াইতে মহোল্লাসে চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনিও অক্ষত শরীরে রণস্থল হইতে ফিরিতে পারেন নাই। সেই ভীষণ সমরে সেই বীরবরের দেহ সপ্ত ব্রণ-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হয়।

বিদ্রোহিগণ পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হইলেন না। ইহার পরও পৃথ্বীরাজের সহিত সুরজমল্লের অসংখ্য

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইয়াছিল। ভ্রাতষ্পুত্র খুল্লতাতকে বলিলেন যে "তিনি তাঁহাকে সূচ্যগ্রপরিমিত স্থানও প্রদান করিবেন না"। আবার খুল্লতাত ভ্রাতষ্পুত্রকে উত্তর দিলেন যে "তাঁহার শয়ন করিতে যে টুকু স্থান প্রয়োজন, তাঁহাকে কেবল সেই টুকু মাত্র প্রদান করিবেন"। কিন্তু পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে ও তদায় পক্ষভুক্তগণকে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম দেন নাই। তিনি নিরন্তর অনুসরণ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক-বিদ্রোহীগণের দারুদুর্গ আক্রমণ।

অদ্য একস্থানে কল্য অন্যস্থানে—পরশ্ব তদন্যত্র—এইরূপ করিয়া তাঁহাদিগকে অবিরাম আত্মরক্ষার্থ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইত। অবশেষে তাঁহারা বাটোরা অরণ্যমধ্যে একটী দারু দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তদভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই দুর্গমধ্যে পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয় সৈন্য একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল। রজনীতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তৎপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সুরজমল্ল ও সারঙ্গদেব আপনাদের দুরবস্থার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা অশ্বের পদশব্দ ও হ্রেষারব তাঁহাদিগের শ্রুতি গোচর হইল। উভয়েই ভয়চকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুরজমল্ল বলিয়া উঠিলেন—"এ নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইবে"। এই কথা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজ অশ্বের প্রচণ্ডবেগে সেই দারুদুর্গ ভেদ করিয়া স্বসৈন্য একবারে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল বোধ হইল যেন মহাপ্রলয়কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কে কাহাকে মারে তাহার কিছুই ঠিক্ নাই। খড়্গ, তরবারি, বর্ষা, ও বাণের যেন চতুর্দ্দিকে বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্য স্থির নাই—উদ্দেশ্য স্থির

নাই! এই প্রলয় মুহূর্ত্তের পর পৃথ্বীরাজ খুল্লতাতের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক প্রচণ্ড অসি-প্রহার করিলেন। সারঙ্গদেব রক্ষা না করিলে এই অসিপ্রহারে সূরজমল্ল শমনসদনে প্রেরিত হইতেন। সারঙ্গদেব পৃথ্বী-রাজকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে "তোমার খুল্লতাতের দেহে এক সামান্য আঘাত পূর্ব্বে বিংশ আঘাতের সমান অনু-ভূত হইবে'। সূরজমল্ল সারঙ্গদেবের এই বাক্যের এই বলিয়া উপসংহার করিলেন যে 'যদি এই আঘাত আমার ভ্রাতুষ্পু-ত্রের হস্ত দ্বারা প্রদত্ত হয়'। সূরজমল্ল ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য সময় চাহিলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে সেই সময় প্রদান করিয়া বীরধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। সূরজের প্রার্থনা অনুসারে কিয়ৎকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

ভ্রাতুষ্পুত্র ও খুল্লতাতের কথোপথন।

সূরজমল্ল ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস! যদি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ আমার পুত্রগণ রাজপুত —তাহারা সাহায্যের জন্য সমস্ত মিবাররাজ্য আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে পারিবে। কিন্তু বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ নিরুদ্দেশ, এবং তোমার কনিষ্ঠ হত। এ অবস্থায় তুমি মরিলে, চিতোরের দশা কি হইবে? তাহা হইলে আমারই মুখে যে কালী পড়িবে, এবং আমারই নাম যে অনন্তকালের জন্য ভৎর্সিত হইবে।" এই বলিতে বলিতে সূরজমল্লের নয়ন-যুগল হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

উভয়ে তখন অসি কোষসাৎ করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। পৃথ্বীরাজ ভক্তিভাবে খুল্লতাতকে জিজ্ঞাসা করি-লেন—"তাত! আমি যখন উপস্থিত হইলাম—তখন আপ-নারা কি করিতেছিলেন?" তদুত্তরে সূরজমল্ল বলিলেন— তখন আহারান্তে আমরা অসম্বন্ধ প্রলাপ করিতেছিলাম।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন—"তাত? যখন আমার মত শক্র আপনার মাথার উপর রহিয়াছে, তখন আপনি কি বলিয়া এরূপ অনবহিত ছিলেন?" সূরজমল্ল উত্তর করিলেন—"বৎস! আমি কি আর করিতে পারিতাম? তুমি আমাকে সর্ব্বোপায়শূন্য করিয়াছ; আমার মস্তক রাখিবার ত একটা স্থান চাই!" এই কথোপকথনের পর বীরদ্বয় পরস্পর বিস্রম্ভালাপ করিয়া সকলে মিলিয়া তথায় রজনী যাপন করিলেন।

পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক সারঙ্গদেবের মুণ্ড কালী-চরণে উপহার।

প্রত্যূষে উঠিয়া পৃথ্বীরাজ খুল্লতাতকে বলিলেন—'তাত! চলুন্ ঐ অদূরবর্ত্তী কালীমন্দিরে গিয়া বলি দিয়া আসি।' কিন্তু সূরজমল্ল পূর্ব্ব দিনের আঘাতে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই জন্য যাইতে অক্ষম হইলেন। তথাপি তিনি সারঙ্গদেবকে প্রতিনিধি স্বরূপ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। মহিষ বলি সমাপ্ত হইল এবং ছাগ বলি হইবে—এমন সময় পৃথ্বীরাজ উত্তোলিত খড়্গ লইয়া সারঙ্গদেবকে আক্রমণ করিলেন। সারঙ্গদেবও তদ্বিরুদ্ধে নিজ অসি উত্তোলিত করিলেন। উভয় বীরে তুমুল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল—কিন্তু পরিশেষে বিজয় লক্ষ্মী পৃথ্বীরাজেরই করতলস্থ হইলেন। পৃথ্বীরাজ প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে সারঙ্গদেবের মস্তক তদীয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। পৃথ্বীরাজ সারঙ্গদেবের মুণ্ড লইয়া নৃমুণ্ডমালিনীর চরণে উপহার প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি সদলে আসিয়া সেই দারুদুর্গ বা গুড়া লুণ্ঠন করিলেন, এবং বাটোরো নগর পুনরাধিকৃত এবং করিলেন। সূরজমল্ল পলাইয়া আবার সদ্রি-দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে "যদি তিনি নিজের ভূমি সম্পত্তি রক্ষা

করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহা রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী মিবারের ব্রাহ্মণ ও চারণগণকে দান করিয়া চলিয়া যাইবেন।" তিনি আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। তিনি নিজের সমস্ত ভূমি সম্পত্তি আজ ব্রাহ্মণ ও চারণগণকে দান করিয়া মিবার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।*

প্রতাপগড় ও দেওলা দুর্গ সংস্থাপন।

তিনি খান্থুল্ অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, একটী ব্যাঘ্র শাবককে মুখে করিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু ব্যাঘ্রী প্রাণপণে সেই ব্যাঘ্র শাবকটীকে রক্ষা করায় লইয়া যাইতে পারিতেছে না। এই লক্ষণ দ্বারা সূরজমল্ল ঐ স্থানই নিজ বাসস্থানের উপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন। পুরোহিতার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইতে পারে না ভাবিয়া তিনি তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি তথাকার আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া সেই স্থানেই একটী দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। এই নগরের নাম প্রতাপগড় ও এই দুর্গের নাম দেওলা দুর্গ হইল। ক্রমে ক্রমে তিনি সহস্র গ্রামের অধিপতি হইয়া উঠিলেন। আজও তাঁহার বংশধরগণ এই ক্ষুদ্র রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তদীয় বর্ত্তমান বংশধর ইংরাজ রাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজ্য করিতেছেন।

---

* এরূপ দানের প্রত্যাহরণকারীকে ষাইট্ হাজার বৎসর নরকে বাস করিতে হইবে। এই জন্য এই ব্রাহ্মণ ও চারণগণের উত্তরাধিকারিগণ আজও ইহা ভোগ করিতেছেন।

পৃথ্বীরাজের শোচনীয় মৃত্যু।

আজ পৃথ্বীরাজ মিবাররাজ্যকে শত্রু-শূন্য করিয়া কমলমীর প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। নব-দম্পতী কিছুদিন তথায় মনের সুখে কালযাপন করিলেন। কিন্তু বিধাতা এ বীর-দম্পতীকে এ পাপময় পৃথিবীতে আর রাখিতে চাহিলেন না। এ উজ্জ্বল রত্ন দুটীকে শীঘ্রই নিজ স্নেহময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। সিরোহীরাজ প্রভুরাও পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিতেন। এই জন্য পৃথ্বীরাজ সিরোহীতে গিয়া তাঁহার সমুচিত শাসন করিলেন। সিরোহীপতির এ অপমান অসহ্য হইল। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য পবিত্র আতিথ্য-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কাপুরুষের ন্যায় তদ্বধের গুপ্ত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি স্বয়ং মিষ্টান্ন বিষমিশ্রিত করিয়া বিদায়কালে পৃথ্বীরাজকে ভোজন করিতে দিলেন। পৃথ্বীরাজ নিজ স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তখন ভোজন না করিয়া পথিমধ্যে ভোজন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কমলমীর প্রাসাদের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইলে পৃথ্বীরাজ প্রফুল্লচিত্তে ভগিনীপতি-দত্ত মিষ্টান্ন ভোজন করিতে বসিলেন। মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া তিনি কমলমীর প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় প্রিয়তমাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহাকে দেখিবার জন্য পৃথ্বীরাজ আকুলিত প্রাণে কমলমীর প্রাসাদাভিমুখে ছুটিতেছিলেন সেই জগল্ললামভূতা রমণীর সহিত তাঁহার আর এই নশ্বর জগতে সাক্ষাৎ হইল না। পৃথ্বীরাজ কালকূটের প্রভাবে ক্রমে অবশেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। মামা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন আর

অশ্বচালনে তাঁহার শক্তি রহিল না। অশ্বের বলগা হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। শরীর অবসন্ন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পতিত হইল। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গেল। তারাবাইকে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একজন অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। কিন্তু সেই প্রাণাধিকা আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতেই মামা দেবীর সম্মুখে সেই মহাপ্রাণ বীরেন্দ্র প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। অনুযাত্রীকবর্গের আর্ত্তনাদে সেই বিশাল মন্দির প্রতিধ্বনিত হইল !

তারাবাই পৃথ্বীরাজের সহমৃতা।

অনতিবিলম্বেই বীরা রমণী তারাবাই প্রচণ্ড বেগে অশ্বচালনা করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রাণ-তারা ভারত-গগন হইতে পূর্ব্বেই স্খলিত হইয়াছেন। তারাবাই আজ জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। বুঝিলেন তাঁহার জীবনের কার্য্য পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি ঊর্দ্ধকর্ণে প্রাণনাথের আহ্বান শুনিতে লাগিলেন। সে আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া থাকে কাহার সাধ্য? সতী আজ সেই আহ্বানের অনুবর্ত্তিনী হইয়া প্রাণনাথের সহমৃতা হইতে কৃত সঙ্কল্পা হইলে শীঘ্রই চিতা সজ্জিত হইল। তারাবাই ভক্তিভাবে মামা দেবীকে প্রণাম করিয়া সেই জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। সেই জীবন-সর্ব্বস্ব পৃথ্বীরাজকে পার্শ্বে করিয়া সেই আদর্শ সতী বীরাঙ্গনা পবিত্র সতীত্বধর্ম্মে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। অলক্ষিতভাবে দেবসারথি সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন সেই বীর-দম্পতীকে পুষ্পকরথে করিয়া স্বর্গধামে লইয়া চলিল!

আজ তাঁহাদিগের অভাবে সমস্ত মিবার শোকে অভিভূত হইল। চিতোররাজপুরী আজ মহাশ্মশানের আকার

ধারণ করিল। বৃদ্ধ রায়মল্লের পক্ষে এ শোক অসহনীয় হইল। অচিরকালমধ্যে সেই প্রবয়া নরপতি পুত্রের অনুগমন করিলেন। রায়মল্ল যদিও বীরত্বে পূর্ব্বপুরুষগণের তুল্য ছিলেন না, তথাপি হৃদয়-মাহাত্ম্যে ও শাসনদক্ষতায় তিনি তাঁহাদিগের কাহারও ন্যূন ছিলেন না। প্রজাগণ তাঁহাকে পিতৃনির্ব্বিশেষে ভক্তি করিত। আজও তাঁহার নামোচ্চারণে মিবারবাসীগণ ভক্তি-গদ্গদ হইয়া উঠে। আজও তাহারা ভক্তিভাবে রায়মল্লের প্রাসাদের প্রাচীরাবলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

আজ পৃথ্বীরাজ ও রায়মল্লের মৃত্যুতে মিবার-সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। এখন সেই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সংগ্রাম সিংহ কোথায়? সকলের নেত্র এক্ষণে যুগপৎ তাঁহারই দিকে প্রেরিত হইল। পাঠক! চল আমরা মিবারবাসিগণের সহিত অনুসন্ধান করিগে, সেই রাজরাজেশ্বর এখন কোথায় লুকাইয়া আছেন!

রাণা সংগ্রামসিংহ।

মিবারের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে এই সংবাদ সেই নির্জ্জনাবাসে সংগ্রামসিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য দ্রুত গতিতে চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় পৌঁছিয়া ১৫৬৫ সম্বৎ বা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সংগ্রামসিংহ সেই শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। মিবারে তিনি রাণা সঙ্গ নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ। মোগল ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে রাণা সিঙ্ক নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই নরপতির রাজত্বকালেই মিবার সৌভাগ্যগিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। ইহাই মিবারের গৌরব-রবির মধ্যাহ্নকাল। সংগ্রামসিংহই মিবারের কীর্ত্তিমন্দিরের চূড়ারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার পর হইতে

মিবারের সৌভাগ্যচক্রনেমি অধোমুখিনী হইতে আরম্ভ হয়। যদিও সেই অধোগতির সময় মিবারের সৌভাগ্য-চক্র-কেন্দ্র হইতে দুই চারিটী বৈদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সেই অধোগতি বরং অধিকতর উজ্জ্বলভাবে লোক-নয়ন-সমক্ষে অবতারিত হইয়াছিল।

দিল্লী সাম্রাজ্যের তৎকালিক অবস্থা।

যে ইন্দ্রপ্রস্থে বহুদিন ধরিয়া পাণ্ডুপুত্রপৌত্রাদিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং যে ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীর সিংহাসনে চোহান বংশীয় সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিল্লীর সিংহাসনে এতদিন গাজ্‌নী, ঘোরী, খিলিজী, ও লোদী বংশীয় সম্রাট্‌গণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া আসিতে-ছিলেন। যখন সংগ্রাম সিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, সে সময় সেই বিশাল যবনসাম্রাজ্য শেষ দশায় উপস্থিত হইয়াছে। সেই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-গুলি আপন আপন স্বাধীনতা উদ্ঘোষিত করিয়াছে। দিল্লী হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত প্রদেশের মধ্যে তিনটী হিন্দুরাজ্য স্বাধীন হইয়া উঠেন। সেই তিন রাজ্যের নাম—বিয়ানা, কাল্‌পী, ও জৈনপুর। এইরূপ মালব, গুজরাট, মাড়ওয়ার, অম্বর প্রভৃতি রাজ্যও দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। মিবার কখন দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই; এখন ত ইহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল।

সংগ্রামসিংহ এই অবস্থায় মিবারের সিংহাসনে আরো-হণ করিলেন। আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে সমরাঙ্গনে অব-তীর্ণ হইতে হইল। বিদ্রোহিদল মালব ও গুজরাটাধিপতির সাহায্যে আবার মিবার আক্রমণ করিল। রাণা সংগ্রাম অশীতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শত্রুসেনার বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। তদ্ভিন্ন সাতজন রাজা, নয়জন রাও, এবং, রাউল্

বা রাউৎ উপাধিধারী একশত চারিজন সামন্ত স্ব স্ব সৈন্য ও পঞ্চশত হস্তীর সহিত তাঁহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন। মাড়ওয়াররাজ এবং অম্বর, গোয়ালিয়ার, আজ্‌মীর, সিক্রী রাইসেন্‌, কাল্‌পী, চন্দেরী, বুন্দী, গগ্‌রাউন্‌, রামপুর, এবং আবুর রাওগণ—সকলেই সংগ্রামের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বদলে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন। পৃথ্বীরাজের দ্বাদশ পুত্র তৎকালে অম্বরের অধিপতি ছিলেন। ইহাঁরাই কচ্ছবহ (Cutchwaha) বংশের শাখা প্রশাখার আদি পুরুষ। হুমায়ুনের রাজত্ব কালেই এই বংশের গৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। যদিও পৃথ্বীরাজ জ্যেষ্ঠের পরম শত্রু ছিলেন, তথাপি মহামতি সংগ্রাম তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে কোন প্রকারে নির্যাতিত করেন নাই।

সংগ্রামের হৃদয়মাহাত্ম্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। যাঁহারা সেই অজ্ঞাতবাসের সময় তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি এই সৌভাগ্যের দিনে তাঁহাদিগকে ভুলিলেন না। সকলকেই তিনি যথাযথরূপে ধনমান সম্পদাদি দ্বারা পূজিত করিলেন। শ্রীনগরের করমচাঁদ চন্দেরী দখল বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে আজমীর রাজ্য জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার পুত্র জগমল্লকে রাও উপাধি প্রদান করিলেন।

দিল্লীসম্রাট ও মালবরাজের সহিত নিরন্তর সমর ও সংগ্রামসিংহের উপর্য্যুপরি জয় লাভ।

সংগ্রামসিংহ সেই মহতী বাহিনী লইয়া সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন। অচিরকালমধ্যেই শত্রুসৈন্য পরাজিত হইল, মিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইল। কিন্তু সংগ্রামসিংহ অধিক দিন শান্তিসুখ-ভোগ করিতে পারিলেন না। মালবাধি-

পতি ও দিল্লীর সম্রাট্ নিরন্তর তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাঁদিগের বিরুদ্ধে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ষোলটী নিয়ামত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, এবং প্রত্যেকটীতেই জয়লাভ করেন। এই ষোলটী যুদ্ধের মধ্যে দুইটী যুদ্ধে—বাক্‌রোল্ ও ঘাটোলী রণক্ষেত্রে—দিল্লীর সম্রাট্ ইব্রাহীম্ লোদী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। শেষের যুদ্ধটীতে যবনসেনা পরাজিত ও নির্ম্মূলপ্রায় হইয়া যায়, এবং একজন যবনরাজ বন্দীভূত হইয়া বিজয়-প্রতিযানের শোভা-সম্বর্দ্ধন করে। এই কয়েকটী যুদ্ধে উপর্য্যুপরি জয়লাভ করায় মিবারের পরিসর বাড়িয়া যায়। এখন হইতে বিয়ানার অদূরবর্ত্তিনী পীত কৃত্রিম সরিৎ (পালা খাল) মিবারের উত্তর সীমা, সিন্ধু নদী পূর্ব্ব সীমা, মালব দক্ষিণ সীমা, এবং দুর্ভেদ্য দুর্গাবলীর ন্যায় আরাবলী গিরিমালা ইহার প্রতীচ্য সীমা স্বরূপ হয়। এইরূপে প্রায় সমস্ত রাজপুতনার উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা সংস্থাপন করিয়া; এবং যে সকল গুণ ক্ষত্রিয়ের অতিভক্তি ও আদরের সামগ্রী সেই সকল গুণের পূর্ণ আধার হইয়া সংগ্রাম সিংহ নিজ সৌভাগ্য-গিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেন। যদি এই সময় অক্সস ও জাক্‌জার্টেসের অনন্ত-বীর-প্রসবী উপকূল বিভাগ হইতে উসবেক্‌স ও তাতার জাতীয় নব নব বীরদল আবার আসিয়া ভারতক্ষেত্রকে প্লাবিত না করিত তাহা হইলে সংগ্রামসিংহ অবিসম্বাদিত রূপে সমস্ত ভারতের রাজরাজেশ্বর হইতে পারিতেন। আবার হিন্দু-রাজ্যের মহিমা সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। কেবল এইমাত্র পৃথক হইত যে ভারতের রাজশক্তি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে চিতোরগিরির উপর বিরাজমান হইত এবং ভারতের জয়-পতাকা চিতোর গিরিদুর্গের উপর উড্ডীন হইত।

রাণা সংগ্রামের পূর্ণ অভ্যুদয় কালে বাবর কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ।

কিন্তু কি ভাগ্য দোষে জানি না বিধাতা তাহা হইতে দিলেন না। যে সময় সমরসিংহের সমর-বিষয়িণী প্রতিভা যবন-রাজ-শক্তিকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই সঙ্কটকালে বীরবর বাবর অবসন্নপ্রায় কোরাণশিষ্যগণের গতিহীন ধমনীতে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করিবার জন্য ভারতক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন।

হিন্দু সাম্রাজের দুর্ব্বলতার কারণ।

ভারতভূমি অতি পুরাকাল হইতেই এই ভোগ ভুগিয়া আসিতেছেন। ইঁহার অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার লুটিবার জন্য মধ্য আসিয়া হইতে লুণ্ঠনকারী দস্যুর দলের পর দল আসিয়া সমস্ত লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। অনন্ত-রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি কামধেনুর ন্যায় তথাপি অবিরাম রত্ন প্রসব করিতেছেন। অনন্ত-স্নেহময়ী জননী—যে আসিয়া মা বলিয়া ডাকিতেছে—তাহাকেই ক্রোড়ে স্থান দিতেছেন—স্নেহভরে লালিত করিতেছেন। বিরাম নাই! বিরাগ নাই! কিন্তু যে লুণ্ঠনকারী দস্যুরা তাঁহাকে মা বলিয়া বলে তাঁহার কণ্ঠাভরণ ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য নিজ পুত্রগণকে উদ্দীপিত করিতেছেন। অনন্ত-বীর-প্রসবিনী মায়ের বীর সন্তানের কখন অপ্রতুল ছিল না—এখনও নাই। কিন্তু চিরকালই তাঁহার সন্তানগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন—পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট সুতরাং দূরবিপ্রকৃষ্ট। ঘনীভূত আকর্ষণে কখন তাঁহারা কেন্দ্রীভূত নহেন। সমস্ত হিন্দু সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহারা কেবল ছয় জন রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আর সকল সময়েই তাঁহারা

পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও দূরবিক্ষিপ্ত। ইহার কারণ কেন্দ্রীকরণ শাসনপ্রণালীর অভাব, এবং সামন্ততন্ত্র শাসনপ্রণালীর সদ্ভাব। বর্ত্তমানকালে রুসিয়া কেন্দ্রীকরণ শাসনপ্রণালীর পূর্ণ আদর্শ। সমস্ত রুশীয় সাম্রাজ্য এক কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন। সেণ্ট্ পিটর্স্বর্গে রুশীয় সাম্রাজ্যের রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। তথা হইতে যে সকল বিধি ব্যবস্থা বিনির্গত হইতেছে সমস্ত সাম্রাজ্যের লোকে তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে। ভারতে পূর্ব্বে এরূপ কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যশক্তি ছিল না। ইহা অসংখ্য ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকল রাজ্যই প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে যখন কোন রাজচক্রবর্ত্তী সমস্ত ভারতের শাসন-দণ্ড চালিত করিতেন, তখন সেই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য সামন্তরাজ্য রূপে পরিণত হইত। অর্থাৎ সামন্তগণ যেমন যুদ্ধের সময় নিজ রাজাকে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য দিয়াই অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণও যুদ্ধের সময়ে সম্রাট্কে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য দিয়াই আর সকল বিষয়েই আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। সুতরাং ইহাঁদিগের পরস্পর স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। এই জন্য কোন লুণ্ঠনকারী দস্যুর দল আসিয়া ভারত আক্রমণ করিলে আক্রান্ত নরপতি বা সম্রাট ভিন্ন তাহাতে আর কেহ ব্যথা অনুভব করিত না। সম্রাটের সাহায্যার্থ যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইত, তাহারাও কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির সহিত সহানুভূতি-বিরহে বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিত না। পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ একের ধ্বংসে বরং অপরের উল্লাস হইত। যৎকালে সেকন্দরসাহ ভারত আক্রমণ করেন, তখনও ভারতের রাজশক্তির এইরূপ বিচ্ছিন্নদশা ছিল। এক পঞ্চনদ প্রদেশেই অনেক গুলি রাজা রাজত্ব করিতেন। তদ্ভিন্নও তথায় অনেক নাগরিক সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল। এই সকল

কারণে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া নিরন্তর ভারতবক্ষ বিতাড়িত করে।

ভারতে নিরন্তর বৈদেশিক আক্রমণস্রোত।

সেকন্দরসাহের পূর্ব্বে পারসীকেরা ভারত বিজয় করে। দ্বিতীয় নরপতি দারায়ুষ ভারতকে আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন। পারসীকদিগের পর গ্রীকেরা, গ্রীকদিগের পর পার্থীয়ান্‌গণ, পার্থীয়ান্‌গণের পর গেটেস্ বা যতিগণ ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ করেন। ইতিহাস ও বিবিধ মুদ্রা ইহার প্রমাণ। কিন্তু ইহাঁরা কেহই ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারেন নাই। ঘোরীবংশীয় সাহাবুদ্দীনই ইন্দ্রপ্রস্থে সর্ব্ব প্রথমে স্থায়ী যবন-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে জেঙ্গীস্ খাঁর বংশসম্ভূত বাবরের সময় পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন তিন শত শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চবার, ভারত আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। প্রত্যেক বারেই এক একটী নূতন যবনবংশ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। সংগ্রামসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী বাবরই ভারতের শেষ আক্রমণকারী যবন। এই মোগলবংশেই ভারতের যবন রাজশক্তি পূর্ণ বিকশিত হইয়া ইহাতেই বিলীন হইয়া যায়। এই মোগল রাজশক্তিকে গ্রাস করিবার জন্য চারিটী রাজশক্তি ক্রমে অভ্যুদিত হয়। প্রথম, মিবারে রাজপুত-শক্তি, দ্বিতীয়, দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি, তৃতীয় পঞ্চনদে শিখ-শক্তি, এবং চতুর্থ অনুগাঙ্গ প্রদেশে ব্রিটন্‌শক্তি। প্রথম তিনটী পর পর অভ্যুদিত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যশক্তিকে পূর্ব্বে বিপর্য্যস্ত ও অন্তঃসার-শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। ব্রিটন্-রাজশক্তি শেষে আসিয়া এ সমস্ত শক্তিকেই কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে। এই মহাশক্তির নিকট সেই

শক্তি-চতুষ্টয় পরাজিত হইয়া এক প্রকার ইহার কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে, কত ধর্ম্মবিপ্লব ও রাজ্যবিপ্লব এই সময়ের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে—তথাপি মিবারের রাজপুতগণ আপনাদিগের ধর্ম্ম ও আপনাদিগের কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। সেই পুরাকালের আর্য্য-সভ্যতা মিবারে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সনাতন ধর্ম্ম-বিশ্বাস এখনও অটল রহিয়াছে।

রাজপুতানার স্থিতি-শীলতা।

রাজপুতানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন অন্যান্য দেশের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই এবং কোন কালেও ছিল না। ইহার নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সেকন্দরসাহের আক্রমণকালেও যেরূপ ছিল, এখনও ঠিক্ সেইরূপ রহিয়াছে। ইহার ধর্ম্মসংস্কারসকল অবিচলিত ও অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জগতে উদ্ঘোষিত করিতেছে। ইহা চিরকালই স্থিতিশীল। ইহা আপনার পরিবর্ত্তন যেমন চাহে না—পরের পরিবর্ত্তন ও সেইরূপ সংঘটিত করিতে প্রস্তুত নহে। ইহা স্থিতিশীল বটে, তাই বলিয়া নিষ্ক্রিয় বা শক্তি-হীন নহে। এই রাজপুত-সমাজের ভিতর একটী মহতী শক্তি নিহিত আছে। কর্ত্তব্য-প্রিয়তা রাজপুতজাতির একটী প্রধান ধর্ম্ম। যদি কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তখন সেই কর্ত্তব্য সাধনে রাজপুত-জাতি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অকাতরে প্রাণোৎসর্গ করিবে। 'কর্ত্তব্য পালনে প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতের জন্ম' প্রত্যেক রাজপুতের অন্তরে, এই ভাব চিরবদ্ধমূল হইয়া আছে। কোন্‌টী কর্ত্তব্য কর্ম্ম এইটী বুঝাইতে পারিলেই হইল। রাজপুত জাতি সেই কর্ত্তব্য সাধনে জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইবে। রাজপুতজাতির এই কর্ত্তব্য-

পালনে আত্মোৎসর্গ করার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি হইতেই ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনরুদিত হইবে।

বাবর ভারত-ক্ষেত্রে আবির্ভূত।

পৌরাণিক ইতিহাসে কথিত আছে যে তুর্ক্ষ ও যবন আসিয়া ভারত অধিকার করিবে। আজ সেই পৌরাণিকী ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করিবার জন্যই যেন তর্কস্-জাতীয় ফার্ঘাণাধিপতি বাবর ভারতক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হন। যখন বাবুর বিজয়িনী সেনা লইয়া অনুগাঙ্গ প্রদেশে আসিয়া আবির্ভূত হন, তখন সংগ্রামসিংহের প্রতাপ দিগন্তপ্রসারী, হইয়া পড়িয়াছে। বাবর শাকদ্বীপ বা প্রাচীন সকটাই * রাজ্যের একাংশের অধিপতি ছিলেন। তদীয় রাজ্য জাক্সার্টেস্ নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত ছিল। হিরোদোতস্ যে গেটিক্ রাণী তোমিরিস্কে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি পুরাকালে এই রাজ্যেরই অধীশ্বরী ছিলেন। গেটিজিত বা যুতি জাতি এই রাজ্য হইতেই বিনির্গত হইয়া খ্রীষ্ট শকাব্দার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ব্যাকুট্রিয়া রাজ্যের ধ্বংস বিধান করেন, এবং তাহার পঞ্চ শত বৎসর পরে উদীচ্য ভারতে আসিয়া ভারতে যবন রাজ্যের সূত্রপাত করে। সেই প্রথম নির্গমনের দিন হইতে ধরিয়া এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে সেই শাকদ্বীপ হইতেই বাবর দলবলসহ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া তথায় স্থায়িরূপে যবন-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এই শাকদ্বীপের অধিবাসিগণ যে শুদ্ধ ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয় করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে। আসি, জিৎ, যিউৎ প্রভৃতি জাতি—এই চিরস্মরণীয় রাজ্য হইতেই বিনির্গত হইয়া বল্টিক্ সাগরের উপকূলভূমি অধিবাসিত করে এবং তথা হইতে ক্রমে সমস্ত

* Scythia.

ইউরোপখণ্ডে বিক্ষিপ্ত হইয়া ইহার ভাগ্যচক্রের নেমি আবর্ত্তিত করে, আঙ্গেল্ জাতি ঐ সকল জাতির একটী শাখা মাত্র। সেই আঙ্গেল্ জাতি, সাক্সেন্ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া ইংরাজজাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অধিবাসিসংখ্যার আধিক্য—তাঁইমুর ও জেঙ্গীস্ খাঁর উত্তরাধিকারিগণের জ্যাক্জার্টিন্ পরিত্যাগ করিয়া অনুগাঙ্গ প্রদেশে আসিবার কারণ নহে। অচরিতার্থ রাজ্যপিপাসাই ইহার মূল কারণ। বাবর ত সমরকন্দ হইতে তাড়িত হইয়াই নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য দুই সহস্র মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সমরসিংহ ব্যতীত সে প্রচণ্ড বাহিনীর সম্মুখীন হইবার যোগ্য বীর তৎকালে ভারতে আর ছিল না।

সমরসিংহ ও বাবর তুলিত।

বাবর সমরসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। উভয়েই আশৈশব বিপৎ ও দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত। সংযমিত বীরত্বে ও অসমসাহসিকতায় উভয়েই তৎকালে জগতে তুলনারহিত। উভয়েই স্থিরপ্রজ্ঞ ও পরিণামদর্শী। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাবর একটী বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি অসংখ্য শত্রুসঙ্ঘ বিজিত করিয়া সমরকন্দ অধিকার করেন; এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরে ইহা একবার হারাইয়া আবার অধিকার করেন। তাঁহার জীবন জয় পরাজয়ের মালামাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক সময়ে তিনি অতিক্রান্ত অক্সস্ * রাজ্য সমূহের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট; এবং পর মুহূর্ত্তেই প্রাণভয়ে পলায়মান, অসহায়, দীনহীন কাঙ্গালের মত সর্ব্বজন-অনুশোচ্য। এক সময়ে বিপুল সেনার অধিনায়ক,

* Transcaspian.

আর এক সময়ে অনুসরণকারিণী শত্রুসেনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ। তিনি একাকী দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনেক বীরের সম্মুখীন হইতে পারিতেন। এক সময়ে অনেককে শমন-সদনে প্রেরিত করিয়াছেন।

ইব্রাহিম লোদী হত ও বাবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়।

অবশেষে তিনি ফার্গানা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়া নৈরাশ্যের তীব্র তাড়নে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে অবতীর্ণ হন। কাবুল ও পঞ্চনদ প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সাত বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়া তিনি ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অবশেষে সময় বুঝিয়া তিনি প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-পাতের ন্যায় দিল্লীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভয়চকিত দিল্লীর সম্রাট্ ইব্রাহীম লোদী সে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন। এই রণে তিনি হত তাঁহার সৈন্য তাড়িত ও সর্ব্বতোবিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দিল্লী ও আগরা— সেই পলাতক ফার্গানাধিপতির বিজয়িনী সেনার অভ্যর্থনার্থ আপন আপন তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত করিল। এইরূপে দিল্লীর সাম্রাজ্য-মুকুট লোদীবংশের মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া মোগলবংশীয় সম্রাটের মস্তকে পতিত হইল। এই বংশের রাজত্বকালেই আবার সমস্ত ভারত এককেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন হইয়াছিল। ইহারই গৌরব-রবির মধ্যাহ্ণ-কালে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' এই জয়ধ্বনি, সমস্ত ভারতে উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। বাবর অত্যন্ত ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। এই বিজয়ের পর তিনি বলিয়াছিলেন—'হে ঈশ্বর! এ বিজয় তোমারই প্রসাদে লাভ করিয়াছি—সুতরাং এ বিজয়-

ফলে তোমারই অধিকার—আমার কোন অধিকার নাই"। বাবর একবৎসর মাত্র দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই প্রবলতম শত্রু চিতোরাধিপতি রাণা সংগ্রামসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সাহসী হইলেন।

বাবর রাণা সংগ্রামের সম্মুখীন।

বাবরের অসাধারণ বীরত্ব, এবং মেঘগিরি * বাসী তদীয় অনুযাত্রিক বর্গের সুদৃঢ়কায়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও কেহ ভাবে নাই যে তিনি সমরসিংহের হস্তে পরিত্রাণ পাইবেন। সকলেই ভাবিয়াছিল যে তাঁহাকে ও তদীয় ক্ষুদ্র সেনাকে বিয়ানার লোহিত স্রোতস্বিনীতে আত্মবলি দিতে হইবে। সে জলময়ী সমাধি হইতে তিনি ও তৎসহচরবৃন্দ উত্তীর্ণ হইবেন—ইহা কেহই মনে ভাবে নাই। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে—"আমরা কতিপয় মাত্র বীর জ্যাকুজারর্টিস্ নদীর তীর হইতে সুদৃঢ় মিবারক্ষেত্রে অসংখ্য রাজপুতবীরের সম্মুখে ব্যূহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছি। যদিও আমাদের অটল বিশ্বাস যে এই ধর্ম্মযুদ্ধে মরিলে আমরা স্বর্গলাভ করিব, তথাপি আজ আমি কিছুতেই আমার অনুযাত্রিক-বর্গের মন হইতে গভীর হতাশতার ভাব বিদূরিত করিতে পারিতেছি না। আজ [illegible]ন সকলেই মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া শোকে অভিভূত হইতেছে। একটী প্রাণীরও মুখে বীরোচিত সাহস-বাক্য শুনিতেছি না। আজ বীরের উপযুক্ত মত প্রকাশ করিতে কাহাকেও দেখিতেছি না। আজ আমাদের ধর্ম্মোন্মাদ যেন বিষাদে পরিণত হইয়াছে! সত্যই এ বিপদে, রাজপুতগণের পরস্পর হিংসা ও স্বদেশানুরাগের অভাবই, বাবরের কৃতকার্য্যতার একমাত্র নিদান হইয়াছিল। সমস্ত

---

* Belur Tag.

রাজপুত যদি এই ধর্ম্মসংগ্রামে সংগ্রামসিংহের পার্শ্ববর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে সেই নগণ্য যবনবীরদল সেই নরমেধযজ্ঞে নিশ্চয়ই বলি পড়িতেন। ভারতে হিন্দু রাজত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্বি হইত, এবং ভারত-ইতিহাস আজ অন্য আকার ধারণ করিত! কিন্তু কি পাপে জানি না—হিন্দুর গৌরব রক্ষা হইল না! হিন্দুর ব্যক্তিগত লালসার নিকট তাঁহার জাতীয় গৌরব বলি পড়িল! যে বিশ্বাসঘাতকতা মহম্মদ ঘোরীর নিকট দিল্লীর সিংহাসন বিক্রীত করিয়াছিল, আজ সেই বিশ্বাসঘাতকতা বাবরের নিকট হিন্দুরাজশক্তিকে বলি দিল ও বিষ প্রয়োগ দ্বারা হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য রাণা সংগ্রামসিংহের প্রাণাপহরণ করিল।

বাবরের অগ্রগামিনী সেনার ধ্বংস।

বাবর আগ্রা ও সিক্রী হইতে রাণা সংগ্রামসিংহের আক্রমণার্থ অভিযান করিলেন। সংগ্রামসিংহ সমস্ত রাজপুত রাজন্যবর্গের নেতা হইয়া তদাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ১৪৮৪ শকাব্দা বা ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই কার্ত্তিক বিয়ানা সৈন্যাবাস হইতে অগ্রসর হইয়া কানুয়ায় গিয়া বাবরের অগ্রগামিনী সেনার সম্মুখীন হইলেন। বাবর পঞ্চদশ শত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্যকে শত্রুর অবস্থানাদি জানিবার জন্য অগ্রে পাঠাইয়াছিলেন। এই সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল হইল। অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যমাত্র ফিরিয়া গিয়া বাবরের নিকট অগ্রগামিনী সেনার পূর্ণ-ধ্বংসের সংবাদ দিল। গভীর হতাশতা আসিয়া সমস্ত মোগল সৈন্যকে আশ্রয় করিল। তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। সেই স্থানেই তাঁহার ব্যূহ রচনা করিয়া রাজপুতগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে সকল সৈন্য বাবরের সাহায্যার্থ নানা স্থান হইতে আসিতেছিল—তাহারাও অগ্রগামিনী সেনার রাজ-

পুতগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট প্রায় হইতে লাগিল। উহার অল্প সংখ্যক মাত্র মোগল শিবিরে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।

মোগল সৈন্য ব্যূহ মধ্যে আবদ্ধ ও বাবরের সন্ন্যাস।

কিন্তু বাবর এই উপর্য্যুপরি বিপদপরম্পরায় অধীর হইলেন না। কারণ তিনি শৈশব হইতেই বিপদে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি অচিরকালমধ্যেই সৈন্যগণের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নি উদ্দীপনাবাক্যে সন্ধুক্ষিত করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকাস্তূপ তুলিয়া তাহার উপর কামানরাজি সজ্জিত করিলেন, এবং কামানগুলিকে সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা মধ্যভাগে পরস্পর সংযুক্ত করিলেন। কামানের অগ্রভাগ লেদার চর্ম্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইল। এইরূপে সেই ব্যূহকে দুর্ভেদ্য করিয়া তাঁহারা রাজপুতগণের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন! সকল দিকই হিন্দুদিগের অনুকূল বোধ হইতে লাগিল। রাজপুতেরা বীরত্বে, ও আত্মোৎসর্গে পৃথিবীতে অতুলনীয়। সেই বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের সহিত আবার সংখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে। সোণায় সোহাগা মিশিয়াছে! এরূপ অজেয় সেনাকে জয় করিতে পারিব বলিয়া কাহারও মনে সাহস হইতেছে না। কিন্তু বাবরের মনে হতাশতার ভাব একবারও উদিত হইতেছে না। জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছেন—যে সেনা প্রথম আক্রমণ করিবে—সেই সেনাই এই যুদ্ধে পরাজিত হইবে। এই কারণে মোগলসেনা আজ এক পক্ষকাল সেই ব্যূহমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ব্যূহ হইতে বিনির্গত হইয়া রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছে না। এমন সময় বাবর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যগণের সংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ভাবি-

লেন যে দৈব সাহায্য ব্যতীত তাঁহার এ বিপৎ হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। এই জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য তিনি আজ হইতে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। তিনি আজ হইতে মদ্য ও অন্যান্য বিলাস দ্রব্যে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইলেন। ব্যূহমধ্যে যত মদ্য ছিল সমস্তই মৃত্তিকায় ঢালিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখন মদ্য পান করিবেন না। শিবিরে যত কিছু স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত তৈজস পত্র ছিল—সমস্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দীন দুঃখী ও দরবেশগণকে দান করিতে আদেশ দিলেন। আজ হইতে তিনি শ্মশ্রু ধারণ করিলেন। তাঁহার আদেশে দিল্লীর সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা হইল যে সেই দিন হইতে কোন মুসলমানের উপর আর টেম্‌ঘা বা ষ্ট্যাম্প-কর ধার্য্য হইবে না। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে যিনি আপনাকে রক্ষা করিতে চাহেন—তাঁহাকে আত্ম জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। সমস্ত মোগল শিবিরে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মের ভাব প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এ ধর্ম্ম যুদ্ধে সকলেই আত্মোৎসর্গ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। সর্ব্ব প্রথমে আসাস্‌ বাবরের মন্ত্র-শিষ্য হইলেন। একে একে সমস্ত পুরুষ প্রাণোৎসর্গ করিতে শপথ গ্রহণ করিলেন। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আজ হইতে তাঁহারা সর্ব্ববিলাসদ্রব্যের ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিলেন। সকলেই শ্মশ্রুধারণ করিলেন। এইরূপ অল্পদিনের মধ্যেই বাবরের ক্ষুদ্র সেনাদল এক নবীন বীর সন্ন্যাসীদলে পরিণত হইল। বাবরের উজ্জ্বল আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে—প্রধান সেনাপতি হইতে সামান্য সৈন্য পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ বিলাসে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইলেন।

বাবরের উদ্দীপনা-বাক্য।

বাবর সমস্ত অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে একত্রিত করিয়া এইরূপ উদ্দীপনাবাক্যে উদ্দীপিত করিলেন—"সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও সৈন্যগণ! যিনিই এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতে হইবে। মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও আশা নাই। যখন আমরা সংসার-নাট্যশালা হইতে অন্তর্ধান করিব—তখন কেবল এক অপরিবর্ত্তনশীল ঈশ্বরই বিদ্যমান থাকিবেন। যিনিই জন্ম-ভোজ খাইবেন, তাঁহাকেই সেই ভোজনাবসানে মৃত্যু-রূপ পানীয় পান করিতে হইবে। যিনিই এই জীবনরূপ পান্থ-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাঁহাকে সেই শোক-নিবাস হইতে বিদায় লইতে হইবে। এ জগৎ ত শোক দুঃখের নিলয় মাত্র। তবে কি লজ্জা ও অগৌরবের সহিত জীবন ধারণ করা অপেক্ষা সম্মান ও গৌরবের সহিত মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয় নহে? যদি কীর্ত্তি রাখিয়া মরিতে পারি, তাহাহইলে মরণেও সন্তোষ লাভ করিব। আমার সহিত আমার কীর্ত্তির সম্বন্ধ নিত্য—কিন্তু আমার দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ ক্ষণিক, কারণ সে দেহে মৃত্যুরই অধিকার আছে। সেই মহামহিমান্বিত ঈশ্বর আমাদিগকে এখন এমন সঙ্কটে আনিয়াছেন যে যদি আমরা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে আমরা জগতে উৎসৃষ্টপ্রাণ ধর্ম্মবীর বলিয়া প্রখ্যাত হইব। আর যদি বাঁচি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিজয়ী হইয়া এ বিপদ হইতে উঠিব। নিশ্চয়ই উঠিব—কারণ পুত্তলী উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের নামে যাহারা কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্যই তিনি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব এস ভ্রাতৃগণ! আজ আমরা একবাক্যে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য * স্পর্শ করিয়া শপথ করি যে যতক্ষণ

* কোরাণ। মহম্মদ এই গ্রন্থ খানি ঈশ্বরের নিকট পাইয়াছেন বলিয়া জগতে উদ্ঘোষিত করিয়াছিলেন।

আমাদের অবিনশ্বর আত্মা এই বিনশ্বর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইবে, ততক্ষণ আমরা এ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব না এবং যে যুদ্ধ ও ঘাতন-কার্য্য শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, তাহা ফেলিয়া পলায়ন করিব না"।

বাবরের এই উদ্দীপনা-বাক্য মোগল সৈন্যগণের রুদ্ধরক্ত-স্রোত ধমণীমণ্ডলে তাড়িত-বেগ সঞ্চারিত করিল। যে শিবিরে এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ভয় ও প্রাণের ব্যাকুলতা বিরাজিত ছিল, সেই শিবিরে এখন সেই ভয় ও ব্যাকুলতার স্থানে প্রচণ্ড ধর্ম্মোন্মাদ ও যুদ্ধপিপাসা দেদীপ্যমান হইল। ধর্ম্মের এমনই মোহিনী শক্তি যে ইহার পবিত্র নামে অতি নরাধমও দেবতা হইয়া উঠে। আজ ধর্ম্মের নামের মোহিনী শক্তিতে শত্রু মিত্র সকলে একবাক্যে কোরাণ স্পর্শ করিয়া বাবরের প্রার্থনামত শপথ গ্রহণ করিলেন। আজ মোগল শিবির "আল্লা! আল্লা" রবে প্রতিধ্বনিত হইল।

সন্ধির প্রস্তাব ও সংগ্রামের দীর্ঘসূত্রতা।

এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মোন্মাদের সুবিধা লইবার জন্য বাবর সেই সৈন্যাবাস ভগ্ন করিয়া যুদ্ধার্থ সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাজপুত সেনার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা একমাস সেই ব্যূহমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আজ যেন কারা-মুক্তির আনন্দ অনুভব করিলেন। আজ তাঁহারা যেন মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রখর দীপ্তিতে জগৎ বিভাসিত করিতে লাগি-লেন। তাঁহারা এইরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে দুই মাইল অগ্রসর হইয়া রাজপুতগণকে যুদ্ধ প্রদান করিলেন। অসমসাহসিক রাজ-পুতগণ মোগলদিগের কামানের সম্মুখ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগের অবস্থান ও সৈন্যসংখ্যা দেখিয়া যাইতে লাগি-লেন। বাবর এরূপ অরক্ষিত অবস্থায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। এই সময় রাণা সংগ্রামসিংহ ইচ্ছা করিলে মোগল-

সেনাকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারিতেন। কারণ তখনও তাঁহার সৈন্যগণ-মধ্যে দুর্দ্দমনীয় রণপিপাসা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কি কারণে জানা যায় না—তিনি এরূপ অমূল্য সুবিধা হারাইলেন। ভারতে যবন-প্রভুশক্তিকে ধ্বংস করিবার এরূপ সুবিধা আর কখন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কৌশলী বাবর এই অবস্থার সুবিধা লইতে ক্রটি করিলেন না। তিনি সময় পাইবার জন্য রাইসীনাধিপতি তুয়ার-বংশীয় সিলৈদী দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তিনি দিল্লী ও তৎপার্শ্ব-বর্ত্তী অধীন রাজ্য সকলকে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধীন রাখিয়া আর সমস্ত সংগ্রামসিংহকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। বিয়ানার নিম্নবর্ত্তী পীলাখাল উভয় রাজ্যের মধ্যসীমা বলিয়া গণ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন; অধিক কি সংগ্রামসিংহকে বৎসরে বৎসরে রাজকর দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন।

কানুয়ায় মহাসমর।

হিন্দুর হৃদয় ইহাতে গলিত হইল। শরণাগত-বাৎসল্য হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম। সংগ্রামসিংহ সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি এরূপ অবস্থায় মোগল সৈন্য আক্রমণ করা বোধহয় অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সন্ধির পরিণাম কি হয় দেখিয়া বোধহয় কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। নতুবা এরূপ দীর্ঘসূত্রতার আর কোন কারণ স্থির করিয়া উঠা যায় না।

যে কারণেই হউক সন্ধির প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। বাবর সন্ধির প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া এখন বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইয়া হিন্দু-শিবিরে ভেদ উৎপাদন করিলেন। তখন সংগ্রামসিংহ বাবরের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং ১৬ই মার্চ্চ প্রত্যূষে মোগল সৈন্যের মধ্য ও দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। কয় ঘণ্টা ধরিয়া উভয়

সৈন্যে ভীষণ সমর চলিতে লাগিল। রাজপুতগণ এই ভীষণ সমরে অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সে বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গে কোন ফল দর্শিল না। বাবরের কামানরাজি অবিরাম অগ্নিময় গোলা বর্ষণ দ্বারা ক্ষত্রিয় বীরবৃন্দকে সমরশায়িত করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ কিছুতেই সে কামানরাজি-পরিরক্ষিত মোগল-ব্যূহ ভেদ করিয়া ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সেই ব্যূহ-মধ্যে মোগল পদাতিক সেনা চতুরস্র ক্ষেত্র করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। যদিও ক্ষত্রিয় সেনা মোগল-ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না—তথাপি বিজয়লক্ষ্মী এখনও তাঁহাদিগের দিকেই রহিয়াছেন;—কারণ মোগলেরা কেবল আক্রমণ নিবারণ করিতেছে মাত্র, ক্ষত্রিয় সেনা আক্রমণ করিতে সাহস করিতেছে না।

বাবর বিজয়ী।

এই সঙ্কটসময়ে বিশ্বাসঘাতক তুইয়ার শীলৈদী সসৈন্য রাজপুতপক্ষ ছাড়িয়া মোগল শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সংগ্রামসিংহ গত্যন্তর না দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে তিনি স্বয়ং ক্ষত, তাঁহার প্রধান প্রধান সামন্তগণ রণে নিহত, ও সৈন্যগণ উপর্য্যুপরি কয় ঘণ্টার নিরন্তর রণে ক্লান্তকলেবর, এ অবস্থায় আবার নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করা অসম্ভব। এই জন্য তিনি জয় পরাজয় সন্দিগ্ধ থাকিতেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। রণস্থলে দোঙ্কারপুরের রাউল্ উদয়সিংহ দুইশত নিজবংশীয় বীর সহ; মাড়ওয়ারাধিপতির পুত্র রাঠোর বংশীয় রায়মল্ল; মায়েটার অধিনায়কদ্বয় কায়স্থী ও রত্ন; সনিগুরাধিপতি রামদাস রাও; ঝাল বংশীয় উজো; প্রমর বংশীয় গোকুলদাস; মিবারের চোহান বংশীয় প্রথম শ্রেণীস্থ সামন্তদ্বয় মাণিকচাঁদ ও চন্দ্রভানু প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বৃন্দ সমাধিনিহিত রহিলেন। দিল্লীর

সিংহাসনচ্যুত লোদী সম্রাটের পুত্র হোসেন খাঁও আসিয়া সদলে সংগ্রামসিংহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তিনিও সেই ক্ষত্রিয় বীরবৃন্দের পার্শ্বে সেই রণক্ষেত্রে সমাধিনিহিত হইয়া রহিলেন। সেই পরিত্যক্ত শবাচ্ছাদিত রণক্ষেত্রে বাবরই বিজয়ী বলিয়া উদ্ঘোষিত হইলেন। তথায় সে উদ্ঘোষণার প্রতিবাদ করিবার জন্য আর কেহ ছিলনা। আজ বিজয়ী বাবর "গাজী" (বিজয়ী) উপাধিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ আবহমান কাল এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। বাবর মৃত বীরবৃন্দের মস্তক পুঞ্জীকৃত করিয়া জয়চিহ্নস্বরূপ একটী নৃমুণ্ড পীরামিড্ নির্ম্মাণ করাইলেন, আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গের উপরে নরকপাল দ্বারা একটী বিজয়মন্দির নির্ম্মাপিত করিলেন। এইরূপে সেই ভীষণ সমরের পর্য্যবসান হইল। আজ হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য চিরকালের জন্য রাহুগ্রস্ত হইল। হিন্দুর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যবনের অঙ্কশায়িনী হইল।

সংগ্রামসিংহের মৃত্যু।

স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সঙ্গের প্রাণে আজ নিদারুণ ব্যথা লাগিল। তিনি উৎসৃষ্ট-প্রাণ বীরবৃন্দের শোকে ও পরাজয়দুঃখে অভিভূত হইয়া মেওয়াট্ গিরির অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় গিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে যতদিন তিনি মোগল সেনার উপর বিজয় লাভ করিতে না পারিবেন, ততদিন চিতোরে পুনঃ প্রবেশ করিবেন না। যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে স্বদেশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাধ মিটিল না। যে বৎসর তিনি পরাজিত হইলেন, সেই বৎসরই তাঁহার জীবনের শেষ বৎসর হইল। মেওয়াট্ গিরির সীমান্ত প্রদেশস্থ বুস্ওয়া নগরে এই মহাপ্রাণ মহা-

বীর স্বদেশবৎসল সংগ্রামসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন। বলিতে লজ্জা হয়—হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যে তদীয় মন্ত্রিবর্গ বাবরের স্ববর্ণে ক্রীত হইয়া বিষ প্রয়োগ দ্বারা প্রভুর জীবন সংহার করিলেন। রাজহত্যার বিনিময়ে তাঁহারা অকীর্ত্তির শান্তিসুখ ক্রয় করিয়া স্বদেশের মুখে কালী দিলেন। যে রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যত দিন না শত্রু বিজিত হয় তত দিন তিনি গগণমণ্ডলকে নিজ চন্দ্রাতপে পরিণত করিবেন, আজ তদীয় মন্ত্রীবর্গ অযশস্কর শান্তি-সুখের প্রয়াসী না হইয়া, যদি তাঁহার সহিত বিপদ্ ও কষ্টের সাগরে ঝাঁপ দিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত! হায় রে! কি পাপে তাহা ঘটিল না! কি পাপে বিশ্বাসঘাতকতা ভারতীয় জাতীয় দুর্গতির বার বার কারণীভূত হইতেছে? বল বিধি কেন তুমি আমাদের প্রতি বাম?

বাবর রণে জয় করিয়াও সঙ্গ-ভীতি হইতে মুক্ত হন নাই। তিনি সঙ্গের পরাক্রম স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন—এই জন্য তিনি সঙ্গকে ভয়ও করিতেন ও শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি এই জন্য আর তাঁহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহস করেন নাই। তিনি তদীয় আত্ম-জীবনবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "যে, রাণা আপন বীরত্ব ও বাহু-বলেই উন্নতি-শৈলের এত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন।"

সংগ্রামসিংহের আকৃতি প্রকৃতি।

রাণা সঙ্গ মধ্যমাকৃতি ছিলেন। তাঁহার শরীরে ধামণীক বলের পরাকাষ্ঠা ছিল। তিনি উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অতি বিস্ফারিত ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই প্রায় তাঁহার বিস্তৃত নয়ন পাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রকৃত বীরের দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতার সহিত সংঘর্ষে তিনি একটী চক্ষু হারাইয়াছিলেন। লোদীবংশীয়

দিল্লীর সম্রাটের সহিত সমরে তাঁহার এক খানি হাত ভাঙ্গিয়া যায়। একটী কামানের আঘাতে তাঁহার আর একটী অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি বিকলাঙ্গ হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার দেহ সর্ব্বশুদ্ধ অশীতি সংখ্যক অস্ত্র-ক্ষত-চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। তিনি কার্য্যোদ্যমের তীব্রতায় অতি প্রথিত ছিলেন। মালবাধিপতি মুজঃফরকে রণে পরাজিত বন্দীভূত করা—অভেদ্য দুর্গ বিন্থম্বোরের সবলে গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার বীরত্ব ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতেছে। এই সকল বীরোচিত গুণের সহিত দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে আদর্শ নরপতি করিয়া তুলিয়াছিল। যদি তাঁহার পরবর্ত্তী রাণা তদীয় গুণাবলী অধিকার করিতেন—তাহা হইলে দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য কখনই স্থির থাকিতে পারিত না। সঙ্গ কানুয়া সমরক্ষেত্রে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাপিত করিয়া তাহাকেই মিবারের প্রান্ত সীমারূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন। বাবর এ প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া দিল্লীর রাজ্যসীমা বাড়াইতে সাহস করেন নাই।

কানুয়া সমরের দুই বৎসর পরে (সম্বৎ ১৮৮৬=খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩০) নৃপতিকুলচূড়ামণি মানবলীলা সম্বরণ করেন। বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রে আহারের সঙ্গে হলাহল প্রযুক্ত হয়। তাহাতেই এই অপূর্ব্ব বীরদেহ নিমেষমধ্যে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া যায়। তাঁহার চিতাভস্মের উপর একটী সমাধি মন্দির বিনির্ম্মিত হয়। এই সমাধি মন্দির বহুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

সঙ্গের সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী পুত্র সন্তান জন্মে। তাহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র রত্ন মিবারের শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

রাণা রত্ন।

রাণা রত্ন ১৫৮৬ সম্বৎ বা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতা হইতে ক্ষত্রোচিত তেজ ও বীরোচিত গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতদিন শত্রু অবিজিত থাকিবে, ততদিন তিনি রণস্থলকে রাজধানী স্বরূপ করিবেন। তিনি চিতোরের দুর্গদ্বার বন্ধ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে দিল্লী ও মণ্ডুই অতঃপর তাঁহার তোরণ-দ্বার হইবে। যদি রত্ন যৌবন-সুলভ প্রচণ্ডতা ও অবিমৃষ্যকারিতা সংযত করিয়া রাজ্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি এ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিতেন। কিন্তু যৌবনের প্রথম সীমাতেই এই গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হওয়ায়, আত্মসংযম শিক্ষা করার সময় তিনি পাইলেন না। সুতরাং তিনি সে গর্ব্বিত ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।

রত্নের গুপ্ত পরিণয়।

দুর্দ্দমনীয় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া রত্ন বিবাদ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিবাদের কারণও শীঘ্রই উপস্থিত হইল। রত্নের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অম্বরাধিপতি পৃথ্বীরাজের দুহিতাকে অতি গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিফলা তরবারি তাঁহার সেই বিবাহের স্বাক্ষি-স্বরূপ ছিল। তিনি বিবাহের পর এই তরবারি পৃথ্বীরাজ-তনয়ার নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন—বলিয়া আসিয়াছিলেন যে যথা সময়ে তিনি এই তরবারি উদ্ধার করিবেন, এবং সেই সময় বিবাহের কথা ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবেন। কন্যা বীরের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া নির্জ্জনে তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু

রত্ন চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না। এই অবস্থায় বুন্দীরাজ হরসিংহ সেই কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলেন। রত্নের সহিত যে তাঁহার পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল—একথা বরকন্যা ও কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। সুতরাং হরসিংহ সেই কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া কোন প্রকার সাধু-বিগর্হিত কার্য্য করেন নাই।

রত্ন দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত।

রত্ন ইহার পর হরসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং হরসিংহ রত্নের সহিত অম্বররাজতনয়ার বিবাহের কথা জানিতে পারিলেই কখনই এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাই-তেন না। বিশেষতঃ বুন্দীরাজবংশ—সমরসিংহের সহিত মিলিত হইয়া দৃশদ্বতীনদীতীরে সাহাবুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে এই দুই রাজপরিবারে একটী ধর্ম্ম-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বুন্দীরাজবংশ সেই অবধিই মিবারের পক্ষতিতলে আশ্রয় লইয়া ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি শালী ও কীর্ত্তিশালী হইয়া আসিতেছিল। আজ হরসিংহ অজ্ঞানতা বশতঃ সেই মৈত্রীসূত্র ছিন্ন করিলেন। অম্বররাজ-তনয়া রত্নের বিবাহ প্রকাশ না করায় হরসিংহের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। মহাসমারোহে হরসিংহ রত্নজায়াকে বিবাহ করিয়া মিবার-বংশে ও রত্নের হৃদয়-ফলকে কলঙ্কারোপ করিলেন। এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ রত্নের হৃদয়কে শেলবিদ্ধ করিল। তিনি এ অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এ সুবিধাও শীঘ্র উপস্থিত হইল। বাসন্ত শিকারোৎসব* আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয় বীরই

* আহেরিয়া (Ahaeria.)

সেই উৎসবস্থলে উপস্থিত হইলেন। রত্ন হরসিংহকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, এ আহ্বান অস্বীকার করা ক্ষত্র-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। সুতরাং হরসিংহ অগত্যা এ আহ্বানে যোগ দিলেন। দুই বার প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পর প্রাণ হারাইলেন। রত্নের মৃত্যুতে সমস্ত মিবার শোকে অভি-ভূত হইল। তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন; এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি ভীমকান্ত গুণাবলী দ্বারা প্রজাবর্গের অনুরাগ-ভাজন হইয়া উঠিয়াছি-ছিলেন। সকলেই তাঁহা হইতে অনেক মহৎ কার্য্যের আশা করিতেছিলেন। প্রত্যুতঃ রত্ন দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে বোধ হয় মোগল সাম্রাজ্য দিল্লীর সিংহাসন-চ্যুত হইত। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধে তাহা ঘটিল না। রত্ন কামদেবের মন্দিরে আত্মবলি দিয়া মিবারকে ঘোর বিপদে ফেলিয়া গেলেন। কিন্তু একটী সান্ত্বনা মৃত্যুকালে রত্নের মনে শান্তি প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সঙ্গ-বিজয়ী বাবরের মৃত্যু হইয়াছিল—এবং সেই বিজয়ের পর মোগল সম্রাট্ সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও মিবার রাজ্য হইতে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্ত-র্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। এই সান্ত্বনা লইয়া রত্ন ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমজিৎ সেই শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

রাণা বিক্রমজিৎ।

১৫৯১ সম্বতে (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাণা বিক্রমজিৎ মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রত্নের ন্যায় ইহাঁরও যৌবন-সুলভ মত্ততা ছিল। কিন্তু এই মত্ততা সত্ত্বেও যে সকল ভীমকান্ত নৃপ-গুণে রত্ন মিবারের প্রজাবৃন্দের অনুরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন, বিক্রমজিতে সে সকল গুণ বিদ্যমান ছিল না।

তিনি অধিকন্তু দৃপ্ত, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, প্রতিহিংসাশীল, এবং আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-বিরহিত ছিলেন। তিনি রাজপুতগণের নেতৃত্ব-পরিত্যাগ করিয়া, নিরন্তর মল্লগণের ও পুরস্কার-লোভী ব্যবসায়ী যোদ্ধৃবৃন্দের সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। যে পুরস্কার বা রাজপ্রসাদ এতদিন উচ্চ বংশীয় রাজপুত অশ্বারোহী বীরবৃন্দই কেবল অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, বিক্রমজিৎ সেই রাজপ্রসাদ এই সকল মল্ল ও ব্যবসায়ী যোদ্ধা এবং 'পাইক' বা পদাতিক সৈন্যের উপর অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বিক্রমজিৎ মোগলদিগের নিকট হইতে এই প্রথা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ কামানের যুদ্ধ ক্রমেই অধিকতর ব্যবহৃত হওয়ায়, মোগলেরা কামান রক্ষা ও পরিচালনের জন্য এই সময় হইতে পদাতিক সৈন্যের অধিকতর আদর আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ অবরোধ কালে দেখা গিয়াছে —অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুত অশ্বারোহিগণ কিছু কাজে লাগেন নাই। সে সময় তাঁহারা অশ্ব বাঁধিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কার্পেট তুলিয়া তাহা পাতিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছিলেন। পদাতিক সৈন্যই মোগল-ব্যূহ ভেদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, বোধ হয় বিক্রমজিৎ এই কারণেই রাজপুত অশ্বারোহী অপেক্ষা পদাতিক সৈন্যের অধিক আদর করিতে লাগিলেন।

রাজপুতগণের স্থিতিশীলতার পরিণাম।

রাজপুতেরা কিন্তু বিক্রমজিতের এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কামানের আবশ্যকতা ইহাঁরা এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বর্ষা বা তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কামানমুখে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সামান্য পদাতিক সৈন্যের সহিত মিশিয়া

যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। এরূপ স্থিতিশীল জাতি পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাহা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ তাঁহারা কিছুতেই করিতে প্রস্তুত হন না। এই জন্যই এত বীরত্ব—এত আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও রাজপুতবীরগণ মোগল সেনার নিকট বার বার পরাজিত হইয়াছেন। এক দিন কামানরাজি অনবরত অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া বিশ্ব জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, অন্য দিকে রাজপুত অশ্বারোহী সেনা বর্ষা ও তরবারি হস্তে পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই বহ্নিমুখে প্রবিষ্ট হইতেছেন! এ দৃশ্যে আমাদের হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হয়! আমাদের অদৃষ্টকে তিরস্কার না করিয়া থাকা যায় না! এত বীরত্ব—এত আত্মোৎসর্গ—একটু বুদ্ধির ত্রুটিতে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়—ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। রাজপুতগণের বাহুতে যে বল ছিল, হৃদয়ে যে মহত্ত্ব ছিল, তাহার সহিত যদি মস্তিষ্কে বুদ্ধি থাকিত—তাহা হইলে বোধ হয় জগতের আধিপত্য তাঁহাদিগের করতলস্থ হইত! কিন্তু বিধাতা একাধারে সকল গুণ দেন না! তাই আজ আমরা পথের কাঙ্গালী! জগতের কৃপার পাত্র! দাসের দাস!

গুজরাটাধিপতি বাহাদুরসাহের চিতোরাক্রমণ।

বিক্রমজিতের এই পরিবর্ত্তনে সকল রাজপুতই অন্তরে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে বিক্রমজিতের রাজত্বকে "পোপ্পাবাইকা রাজ" * বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ

* পুরাকালে পোপ্পাবাই নামে একজন রাণী মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার সময় অত্যন্ত অরাজকতা হইয়াছিল বলিয়া ইহা অরাজকতা বিষয়ের প্রসঙ্গ স্বরূপ হইয়া আছে।

আসিয়া চিতোরের প্রাচীরের বাহির হইতেই গোপাল ও মেষপাল চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বিক্রমজিৎ যখন তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যবৃন্দকে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন, তখন তাঁহারা পরিহাস করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে রাণা যেন তাঁহার পাইকুগণকে এই কার্য্যে প্রেরণ করেন!

গুজ্জরাটের সুলতান বাহাদুরসাহ এই অন্তর্বিচ্ছেদের সুবিধা লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বাপমানের প্রতিহিংসা লইবার এমন সুযোগ আর ঘটিবে না—তাহা তিনি বুঝিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ মুজঃফরের পরাজয় ও কারারোধ তাঁহার হৃদয়ে দূর-প্রোথিত শল্যের ন্যায় বিদ্ধ ছিল। এক্ষণে তাহা উত্তোলিত করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি মণ্ডুর অধিপতির নিকট সৈন্য সাহায্য পাইয়া সেই মিলিত সৈন্য লইয়া রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। যদি ও বাহাদুরসাহের সৈন্য অগণ্য ছিল, তথাপি ক্ষত্রিয়োচিত সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমজিৎ তাঁহাকে যুদ্ধ প্রদান করিলেন। যুদ্ধস্থলে কেবল তাঁহার পাইক বা পদাতিক সৈন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। রাজপুত অশ্বারোহীসৈন্যগণ কেবল যে তাঁহার সহিত যোগ না দিয়াও ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, তাঁহারা একবাক্যে সকলেই চিতোর রক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। সঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার যে পুত্র জন্মে, তাঁহাকেই তাঁহারা ভাবী রাণা স্থির করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান আরম্ভ করিলেন।

চিতোর ধ্বংসের সবিশেষ আয়োজন।

প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয় চিতোরের নামে নৃত্য করিতে থাকে। ইতালীয়গণ যেমন রোমনগরীর নামে উন্মত্ত, সমস্ত রাজপুতানার অধিবাসীও সেইরূপ চিতোরের নামে উন্মত্ত। সে নামে তাহাদিগের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। চিতোর

তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত পবিত্রতার খনি। এইজন্যই সেই পুরাকাল হইতেই চিতোরের রক্ষার্থ সমস্ত রাজপুতানার অধিবাসিগণ বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রাণোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। সেই পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ রাজপুতানার সমস্ত সামন্ত ও রাজবৃন্দ চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

আজ দেওলাধিপতি সুরজমল্লের পুত্র পূর্ব্ব বৈর বিস্মৃত হইয়া শরীরের রক্তবিন্দু দিয়া পিতৃপৈতামহিক রাজধানীর রক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। বুন্দীরাজপুত্র পঞ্চশত হর বীর সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে চিতোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইরূপ ঝালোর ও আবুর সোণিগুরা ও দেওরা বংশীয় রাওগণ সসৈন্যে চিতোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই চন্দ্রাবত বংশীয়গণ, রাঠোরবংশীয়গণ, রাও দুর্গা, প্রভৃতিও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিতোর দুর্গাবরোধ।

এদিকে সুলতান্ বাহাদুরসাহও চিতোর ধ্বংসের নিমিত্ত সবিশেষ আয়োজন করিলেন। তিনি চিতোর দুর্গের মূলে চ্ছেদ কারবার নিমিত্ত ইউরোপীয় আর্টিলারিষ্ট্স্ * বা কামানদারগণকে নিযুক্ত করেন। বাবর যে ইঞ্জিনিয়ারের

* চাঁদ কবির কবিতা গ্রন্থে লিখিত আছে যে দিল্লিসমরে পৃথ্বীরাজও 'কামান ও 'নল-গোলা' ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একবার নহে, বার বার বর্ণনা করিয়াছেন, যে এই সকল যুদ্ধক্ষেত্রীয় আগ্নেয় গিরিমুখ হইতে অবিরাম অগ্নি উদ্গীরিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিতেছে যে হিন্দুরা যুদ্ধস্থলে বড় বড় কামান ও গোলা ব্যবহার করিতেন। ইহার পর বিয়ানা যুদ্ধে বাবর কামান ও গোলার অবতারণা করেন। সুলতান বাহাদুরসাহই সর্ব্ব প্রথমে দুর্গাবরোধকালে কামান ও গোলার ব্যবহারের সূত্রপাত করেন।

কামান প্রয়োগদ্বারা রাজস্থানের সমবেত অশ্বারোহি সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রুমি খাঁ। বাহাদুর খাঁ যে ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে চিতোর জয় করেন তাঁহার নাম ফিরিঙ্গী লাব্রী খাঁ। তিনি 'বাঁকা পাহাড়ের' নিম্নে একটী সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উক্ত সুড়ঙ্গ বারুদপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করেন। ইহাতে চিতোরদুর্গের ঘন পঞ্চচত্বারিংশৎ ফুট উড়িয়া যায়। দুর্গের ঐ স্থলেই বীর পঞ্চশত হর দণ্ডায়মান হইয়া উহার রক্ষাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বুন্দীরাজকুমারসহ তদীয় পঞ্চশত হর বীর কোথায় উড়িয়া গেলেন! বুন্দীকবিগণ এই শোচনীয় ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অতি তীব্র করুণরসের অবতারণা করিলেন। রাও দুর্গা এবং চন্দ্রাবত সামন্তদ্বয় সত্তো ও দুদু সদলে অতি বীরত্বের সহিত সুড়ঙ্গমুখ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাঠোরবংশীয় রাণী মাতা জেওয়াহীর বাই কঞ্চুকে অঙ্গ আবৃত করিয়া একদল সৈন্যের নেত্রী হইয়া অসিহস্তে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া যবন-সেনাকে আক্রমণ করিলেন। বীরা রমণীর বীরত্ব ও স্বজাতিপ্রেম দেখিয়া আক্রমণকারি ও আক্রান্ত উভয় সৈন্যই মুগ্ধ হইল। রণরঙ্গিনী বামা অসি হস্তে সমর করিতে করিতে রণদেবীর মন্দিরে আত্মবলি প্রদান করিলেন। চিতোরে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। আজ মিবারের প্রজামণ্ডলী যেন মাতৃহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে যবনেরা ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন চিতোরে এক সামরিক সভার অধিবেশন হইল। কিরূপে তাঁহারা এই উপস্থিত বিপদে চিতোরের ভবিষ্যৎ আশাস্থল শিশুরাজার প্রাণ রক্ষা করিবেন কেবল এই বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

বাঘজির অভিষেক।

কিন্তু রাজা না থাকিলে চিতোর রক্ষা কে করে? রাজবলি ব্যতীত চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হন না। এইজন্য তাঁহারা একজন ব্যবহিত মুকুটধারী খাড়া করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেওলাধিপতি সুরজমল্লের পুত্র বাঘজি এই ব্যবহিত মুকুটধারী হইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথারীতি অভিষিক্ত হইয়া চিতোরের শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। চিতোর-সিংহাসন বিক্রমজিতের নগর পরিত্যাগের পর হইতেই শূন্য পড়িয়াছিল। আজ তাহার উপর সুরজমল্লের পুত্র মহোৎসবে ও ক্ষত্রবীরবৃন্দের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া আরোহণ করিলেন। চিতোরের সূর্য্যমণ্ডল-পরিশোভিত লোহিত-ধ্বজা তাঁহার মস্তকের উপর সদর্পে উড়িতে লাগিল। যখন প্রধান রাজচিহ্ন সুবর্ণসূর্য্য-মধ্যে সুনীলবপু রাজচ্ছত্র নব রাজার মস্তকের উপর উত্তোলিত হইল, তখন চতুর্দ্দিক 'হর! হর!' ধ্বনিতে ও জয়শব্দে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শিশু উদয়সিংহের রক্ষার ভার বুন্দীরাজ চুকাসেন ধুন্ধেরার হস্তে সমর্পিত হইল। দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ সকলেই রক্তপরিচ্ছদে আবৃত হইলেন।

রাজপুতরমণীগণের অলৌকিক আত্মোৎসর্গ।

এদিকে রাজপুতসতীগণের সতীত্ব রক্ষার জন্য জোহর বা আত্মবলির উপাদানসামগ্রীসকলের আয়োজন হইতে লাগিল। চিতানল সজ্জিত করিবার আর সময় ছিল না। শত্রুকৃত সুড়ঙ্গমুখ রক্ষা করিতে গিয়া অসংখ্য ক্ষত্রবীর আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন। আর চিতোর রক্ষা হয় না দেখিয়া বীরা রমণীগণ যবনের হস্ত হইতে অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিবার জন্য আত্মাহুতি দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। চিতোরের গিরিবক্ষে বিশাল গর্ত্তসকল খনন করা হইল।

সেই সকল গর্ত্ত বারুদে বা অন্যান্য দাহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ করা হইল। নবাভিষিক্ত রাণা বাঘজির জননী আদর্শ সতী কর্ণাবতী ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুত সতীর অগ্রগামিনী হইয়া সেই কৃত্রিম গিরিগহ্বরে গিয়া ঝাঁপ দিলেন। অমনি সেই সকল দাহ্য পদার্থে অগ্নি প্রদান করা হইল। নিমেষমধ্যে কর্ণাবতীসহ সেই ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতসুন্দরী এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহা-দিগের সেই স্বর্গীয় দেহকান্তির আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তখন চিতোরের তোরণদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। নব রাণা বাঘজি মৃত্যাবশিষ্ট বীরবৃন্দের অগ্রণী হইয়া প্রচণ্ড বেগে যবনসৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইলেন। কিন্তু সে ক্ষুদ্র তরঙ্গ যবন-গিরির পাদদেশে বার বার আহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আবার চিতোর-সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। চিতোর আজ এই দ্বিতীয়বার মহাশ্মশানে পরিণত হইল! হায়! আর এ দৃশ্য দেখা যায় না। হিন্দুর এ দুর্দ্দশা আর সহ্য হয় না! ভগবতী বসুন্ধরে! দ্বিধা বিভিক্ত হও! তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণের এ দুর্ব্বিষহ জ্বালা জুড়াইগে! অথবা কাল স্মৃতি আমায় ছাড়িবে না! কোন স্থানে গিয়াই ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। পূর্ণ নির্ব্বাণ ব্যতাত এ জ্বালার হাত এড়াইবার আর উপায় দেখি না!!

এই দুর্ঘটনা ১৫৮৯ সম্বতের (১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) ১২ই জ্যৈষ্ঠ ঘটিয়াছিল। এই দিনে ভারত-বক্ষে এক প্রকাণ্ড শেল প্রোথিত হইল! সে শেল কবে উদ্ধৃত হইবে বিধাতাই জানেন!!

চিতোর মহাশ্মশানে পরিণত।

বাহাদুরসাহ চিতোরে প্রবেশ করিয়া ইহার ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন অসংখ্য মৃত দেহ ভীষণ

আকার ধারণ করিয়া পড়িয়া আছে—তাহা অপেক্ষাও ভীষণ-তর আর একটী দৃশ্য দেখিয়া বাহাদুরের হৃদয় গলিত হইল। তিনি দেখিলেন যে চিতোর একেবারে রমণী-শূন্য হইয়াছে। রাজপুতরমণীরা সতীত্বকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাসেন। তাই সতীত্ব-নাশের আশঙ্কায় স্বহস্তে বক্ষঃস্থলে ছুরিকা প্রবেশিত করিয়া বা বিষপান করিয়া রাজপুত-রমণী-গণ আজ প্রশান্তভাবে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছেন*। কর্ণাবতী-নীতা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পূর্ব্বেই বিশ্বাবসু-ক্রোড়ে গিয়া সতীত্ব-নাশ ও কারাবাসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ত্রিশ সহস্র সম্ভ্রান্ত রাজপুত-মহিলা পূর্ব্বেই অগ্নিমুখে ঝাঁপ দিয়া-ছিলেন। আজ অবশিষ্ট রাজপুতরমণীগণ ছোরাপ্রহারে বা বিষপান দ্বারা যবনের হস্ত হইতে নিজ নিজ সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করিলেন। আজ চিতোরের শেষ দিন উপস্থিত। আজ প্রত্যেক রাজপুতবংশ নেতৃহীন ও প্রত্যেক নেতা সহায়হীন হইয়াছেন। অবরোধ ও আক্রমণে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাত্রিং-শৎ সহস্র রাজপুতবীর এই ভীষণ সমরে নিহত হন। চিতো-রের এই দ্বিতীয় শক বা অর্দ্ধ ধ্বংস!

বাহাদুরসাহ দুই সপ্তাহ মাত্র চিতোরে অবস্থিতি করিতে-ছেন—এমন সময় সংবাদ আসিল যে হুমায়ুন চিতোর রক্ষার

* বিজেতা নরপতি বিজিত নরপতির স্ত্রীগণকে কারাবদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ ভোগ সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই রূপ অন্যান্য বিজেতা বীরবৃন্দ বিজিতবৃন্দের পত্নীগণকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া থাকেন। এই-রূপ বিবাহকে মনু রাক্ষস বিবাহ বলিয়াছেন। এরূপ বিবাহের প্রথা অন্য দেশেও প্রচলিত ছিল। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের এক স্থানে সিসেরা-জননী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তাহারা কি বিজিত রমণীগণকে প্রত্যেকে দুই একটী করিয়া ভাগ করিয়াছেন? Judges. V. 31.

জন্য সসৈন্য তদভিমুখে আসিতেছেন। রাণী কর্ণাবতীর আহ্বানে ধীর বীর হুমায়ুন বঙ্গ-বিজয় পরিত্যাগ করিয়া আজ চিতোর-সতী-কুলের উদ্ধারার্থ আগমন করিতেছেন। কিন্তু সে মৃদু গতি এরূপ বিপদের উদ্ধারের অনুকূল নহে। যাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি আসিতেছিলেন, সে রাজপুতসতীগণ আর যবনের বিভীষিকার অধীনা নহেন। হুমায়ুনের আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহারা এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথের ক্রোড়ে স্থান লইয়াছেন। হুমায়ুন সে দুর্ঘটনার পরে গজপতিগমনে চিতোর-শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই বাহাদুরসাহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। হুমায়ুন্ যদি এতদূরে অবস্থিত না থাকিতেন, তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না, বাহাদুরসাহ তাহা হইলে কখনই এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। কারণ বীরধর্ম্মানুসারে তিনি চিতোর রক্ষার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে বাধ্য ছিলেন। কারণ রাণী কর্ণাবতী এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভগিনী রাঠোর-রাজনন্দিনী উদয়সিংহ-জননী হুমায়ুন্‌কে যে রাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে রাখীদ্বয় গ্রহণ করিয়া হুমায়ুন্ ঐ দুই সম্ভ্রান্ত মহিলাদ্বয়ের ধর্ম্ম-ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং এ বিপদের সময় তিনি প্রাণোৎসর্গ না করিলে তিনি বীর-ধর্ম্মচ্যুত হইবেন। বীর প্রাণ দিতে পারেন কিন্তু বীরধর্ম্ম ছাড়িতে পারেন না।

হুমায়ুন রাজপুতমহিলার রাখীবন্দ ভাই।

রাজপুতমহিলারা রাখী উপহার দিয়া ধর্ম্ম-ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন। এই ধর্ম্ম-ভ্রাতৃগণকে তাঁহারা রাখীবন্দ

ভাই * বলিয়া আদর করিতেন। এই রাখীর বিনিময়ে "রাখী-বন্দ ভাই" ধর্ম্ম-ভগিনীকে কাঁচুলী ও সুবর্ণ মণি মুক্তাদির অলঙ্কার উপহার দিতেন। আজ এই উদয়-জননী এই প্রথা অনুসারে রাখী প্রেরণ দ্বারা হুমায়ুনকে ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন। হুমায়ুন্ বিয়ানাযুদ্ধে পিতার সঙ্গে থাকিয়া রাণা সঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাণা সঙ্গ ও তদীয় রাজপুতসৈন্যগণের বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাণাসঙ্গের মহাপ্রাণতার আরও অনেক পরিচয় পাইয়া হুমায়ুন্ তাঁহাতে মুগ্ধ ছিলেন। এই জন্য রাণাসঙ্গের পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিগণের বিপদে তাঁহার স্বতঃই সহানুভূতি উদ্ভূত হইল। তাহার উপর এই ধর্ম্মসম্বন্ধে সেই সহানুভূতি গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। আজ তিনি তাই সেই শ্রদ্ধা ও এই স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

---

* এই রাখীবন্দ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিত আছে। রাজপুতরমণীগণ প্রথমে বিপন্নাবস্থায় যবনসম্রাট্গণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া রাখীপ্রেরণ দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধে আবদ্ধা হইতেন। শেষে এই প্রথা অতি সাধারণ হইয়া পড়ে। যে সকল রাজপুত-রাজবংশ যবনসম্রাটগণকর্ত্তৃক অপহৃত-সর্ব্বস্ব ও হৃতরাজত্ব হইয়াছিল, এই রাখীবন্দ দ্বারা সেই সকল রাজবংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমৃদ্ধির অবস্থায় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। যবনসম্রাটগণ রাজপুতরাজগণের রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে কেবল রাজপুতরমণীর হস্ত-লিখিত একখানি চিঠি ও তাঁহার নিকট হইতে ভগিনীর আদরের কামনা করিতেন। হুমায়ুনের মহত্ত্বে ও আশ্রিত-বাৎসল্যে রাজপুতরমণীরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে উদয়পুর, বুন্দী ও কোটার রাণীগণ, এবং চাঁদবাই ও রাণার কুমারী ভগিনী সকলেই রাখীবন্দ দ্বারা তাঁহার সহিত ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজপুতানার সম্ভ্রান্ত সামন্ত

রাণাবিক্রমজিৎ চিতোরে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত।

একে একে তিনি সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বাহাদুরকে চিতোর হইতে তাড়াইয়া, মণ্ডুরাজ—বাহাদুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় রাজধানী মণ্ডুনগরী সবলে কাড়িয়া লইলেন। কাড়িয়া লইয়া সেই মণ্ডুরাজসিংহাসনে রাণা বিক্রমজিৎকে বসাইয়া মণ্ডুরাজ্য তাঁহাকেই অর্পণ করিলেন। তিনি অভিষেকের পূর্ব্বে স্বহস্তে রাণা বিক্রমজিতের কটিদেশে তরবারি বাঁধিয়া দিলেন। হুমায়ুনের ব্যবহারে সমস্ত রাজপুতানা মুগ্ধ হইল। রাজপুতরমণীগণের মন হইতে যবন-বিদ্বেষ অনেক পরিমাণে কমিল। কর্ণাবতী ও উদয়-জননীর দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া অনেক রাজপুতরাণী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার সহিত রাখীবন্দ-ভাই সম্বন্ধ পাতাইলেন *।

রাণা বিক্রমজিৎ স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন বটে, কিন্তু দারিদ্র্য ও বিপদে কিছুই শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও অতি দৃপ্ত ও মর্য্যাদালঙ্ঘন-

মহিলাগণও এইরূপে রাখীবন্দ দ্বারা তাঁহার সহিত ধর্ম্মভ্রাতৃ-ভগিনী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। হুমায়ুনের সহিত তাঁহাদিগের সকলেরই চিঠি পত্র লেখালিখি চলিত।

* হুমায়ুনের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া তদীয় পুত্র আকবর, এবং পর পর সম্রাটগণ—জাহাঁগীর, সাজীহান ও আওরঙ্গজীব ও মহান্ আল্লাদের সহিত রাজপুতরাণী ও মহিলাগণের 'রাখীবন্দ ভাই' হইয়াছিলেন। উদয়পুরের রাণীমাতা স্বহস্তে আওরঙ্গজীবকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন আওরঙ্গজীব অতি ভক্তিভাবে সে সকল পত্র পরিরক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে "ধর্ম্মশীলা প্রিয় ভগিনী" বলিয়া পত্রে সম্বোধন করিতেন। এই গুণেই মোগল সম্রাটগণ রাজপুতানা অধিকার করিয়াছিলেন।

কারী রহিলেন। পিতার বৃদ্ধ মন্ত্রিবর্গের প্রতি যে কিরূপ সম্মান করা উচিত তাহা তিনি জানিতেন না। প্রত্যুতঃ তিনি পদে পদে তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া বসিতেন। এক দিন তিনি প্রকাশ্য রাজসভায় তদীয় পিতার বিপদ্-বন্ধু আজ্মীরাধিপ বৃদ্ধ সামন্ত কেরেমচাঁদকে অবমাননা করায় সমস্ত অমাত্য ও সামন্তবর্গ একবাক্যে রাজসভা হইতে উঠিয়া চলিলেন। যাইবার সময় চন্দ্রাবতবংশনেতা সামন্তপ্রধান কণজি বলিয়া উঠিলেন "সামন্ত ভ্রাতৃগণ! এত দিন আমরা কেবল মুকুলের ঈষৎ গন্ধ পাইয়াছিলাম—এখন আমাদিগকে সেই প্রস্ফুটিত কুসুমের ফল খাইতে হইবে।" এই কথায় প্রমরবংশীয় সামন্ত উত্তর করিলেন—"কাল আমরা সে ফলের গন্ধ আঘ্রাণ করিব।" এই কথার পর সকলে একবাক্যে সেই রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রকৃত রাজা কে?

যদিও রাজপুতগণ রাজাকে দেবতাস্বরূপ মনে করেন, এবং রাজাদেশ পালন করিলে স্বর্গলাভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তথাপি রাজা যথেচ্ছাচারী ও লোকমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী হইলে, তাঁহাকে দণ্ড দিতে জানেন। লোকপালন ও লোক-মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই রাজার প্রয়োজন। যে রাজা দ্বারা তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে, তিনি রাজনামের ও রাজ-সিংহাসনের অযোগ্য। 'রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ'—প্রজার মনোরঞ্জন যিনি করিতে পারিলেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। কিন্তু যে রাজা যথেচ্ছাচারিতাদি দ্বারা প্রজাসাধারণের বিরাগভাজন হন, তিনি রাজপদের অযোগ্য। এই জন্যই এরূপস্থলে রাজপুতগণ সেই সেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতেন। রাজপুতানার স্বাধীনতার দিনে এরূপ ঘটনা

অনেক ঘটিয়াছে। রাজশক্তির অযথা পরিচালনের দণ্ড আপনাদের হস্তে ছিল বলিয়াই, রাজপুতগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমিক রাজবংশের বিরোধী ছিলেন না। পুরাতন রাজবংশে যদি যোগ্য রাজা পাওয়া যায়, তাহা হইলে নব রাজবংশ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কাহার সাধ হয়? যোগ্য রাজা না পাইলে, তাঁহারা নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইতেন না। ইহাতে রাজা ও প্রজা—উভয়েরই শক্তি পরিচালিত হইত। রাজা প্রজাবর্গের অনুরাগভাজন—এই জ্ঞানে উভয়ের মধ্যে একটী অচ্ছিদ্য প্রেম-বন্ধন স্থাপিত হইত। এই নির্ব্বাচন-শক্তি প্রজার হস্ত হইতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই, আজ ব্রিটন্-রাজশক্তি প্রজার এত বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িয়াছে; এবং এত অনিয়ন্ত্রিতভাবে যথেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়িয়াছে।

বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত ও তাঁহার মৃত্যু।

কিন্তু রাজস্থানের এরূপ অবস্থা ছিল না বলিয়াই—রাজা প্রজায় এত সদ্ভাব ছিল। রাজপুতেরা সেই জন্যই রাজাকে শাসনকর্ত্তা ও পিতা—এই দুই ভাবেই দেখিতেন; এবং রাজগণও প্রজাবর্গকে অনুশাস্য ও পুত্র—এই দুই ভাবেই দেখিতেন। ব্রিটনরাজশক্তি প্রজাবর্গকে কেবল অনুশাস্য ভাবে দেখেন বলিয়াই, প্রজারা তাঁহাকে শাসনকর্ত্রীমাত্র ভাবে দেখিয়া থাকে। এই জন্য উভয়ের মধ্যে প্রেমের বন্ধন নাই। কেবল শাসনের বন্ধন আছে। ইহা যেমন অপ্রীতিকর—তেমনই ক্ষণস্থায়ি।

আজ এই প্রেমের বন্ধনের অভাব হওয়ায় বিক্রমজিতে ও প্রজাবর্গে মানসিক অনৈক্য উপস্থিত হইল। এই মানসিক অনৈক্যের পরিণাম—রাষ্ট্রবিপ্লব। সামন্তবর্গ বিক্রমজিৎকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথ্বীরাজের অনুলোমপরিণয়জ তনয় বীরবর

বনবীরের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যের আর বিড়ম্বনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বনবীর অতি সুবোধ ছিলেন—এইজন্য ইহাতে প্রথমে অস্বীকার করিলেন; এ বিপদসঙ্কুল গৌরবের পদে আরোহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু সামন্তবর্গের আগ্রহাতিশয় তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা যখন দেখাইলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ না করিলে রাজ্য নষ্ট হয়, তখন বনবীর অগত্যা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত হইলেন। লতাকে যেমন সবলে আশ্রয়তরু হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে, তাহা আর বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ রাজাকে অপমানের সহিত সিংহাসন হইতে নামাইলে, রাজার প্রাণও আর বাঁচে না। সিংহাসনচ্যুতিও হইল, বিক্রমজিতের প্রাণবায়ুও দেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল! একদিকে বিক্রমজিতের পরিবারমণ্ডলীর হাহাকার-ধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অন্য দিকে বনবীরের মস্তকের উপর চাঙ্গী বা রাজচ্ছত্র উত্তোলনকালের জয়ধ্বনিতে সে আর্ত্তনাদের ধ্বনি অভিভূত হইয়া পড়িল! এ ধরাধামে শোক ও উল্লাস—এইরূপেই পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া দেখা দিয়া থাকে! একদিকে পুত্রশোকাতুরা জননী—পতিশোকবিধুরা নববিধবার আর্ত্তনাদ;—অন্যদিকে নবকুমারের জন্মজনিত আনন্দোৎসব—এ অপূর্ব্ব বিষম দৃশ্য আমরা প্রতিনিয়ত সম্মুখে দেখিতেছি। জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদের এই বৈষম্যভাবাক্রান্ত চিত্র জগতে না থাকিলে; জন্ম, সুখ, হর্ষাদির,—মৃত্যু, দুঃখ ও বিষাদাদির সহিত তুলনা না করিতে পারিলে কে অন্যতরে আনন্দ অনুভব করিত? জগদ্-বৈচিত্র্য একেবারে বিলুপ্ত হইত! অনন্তরূপীর খেলা বুঝা ভার!! আজ বৃক্ষচ্যুতা বল্লরীর ন্যায় বিক্রমজিৎ পদদলিত হইলেন। আজ বনবীর বা তৎপক্ষীয়-

গণ কর্ত্তৃক প্রেরিত ঘাতকের হস্তে রাণা সঙ্গের বংশধর হত হইলেন! আজ রাণাসঙ্গের অন্তঃপুরে গগণবিদারী শোকধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু সে শোকের ক্রন্দন আজ কে শুনে? আজ যে মিবারবাসিগণ বনবীরের অভিষেকোৎসবে প্রমত্ত রহিয়াছেন। আজ তাঁহাদের সে ক্রন্দনে যোগ দিবার অবসর নাই! হায় রে! এ ধরাধামে স্বার্থেরই পূর্ণ রাজত্ব!! এই স্বার্থে অন্ধ হইয়া মানুষ পিশাচ হইয়া যায়!!!

রাণা বনবীরসিংহ।

বনবীরসিংহের মনে সিংহাসনাধিরোহণের পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-ভাব ও সৌজন্য ছিল--সিংহাসনাধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তিরোভাব হইল। এখন ঘোরতর রাজ্যলালসা ও দুর্দ্দমনীয় আত্মাভিমান আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তিনি চিতোর রাজসিংহাসনে আপনার ও আত্মবংশের স্থায়ি স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাঁহারা তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ-রাজসম্মান দিতে ইতস্ততঃ করিতেন—বনবীর তাঁহাদিগেরও সমুচিত শাস্তিপ্রদান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

যখন অমাত্য ও সামন্তবর্গ একবাক্যে বিক্রমজিৎকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বনবীরকে সেই শূন্যসিংহাসনে বসাইলেন—তখন তাঁহাদিগের মনে মনে এই গূঢ় সঙ্কল্প ছিল যে উদয়সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই অধিকার প্রদান করিবেন। উদয়সিংহ তৎকালে ষষ্ঠবর্ষ-মাত্রবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে বনবীরকে দশবৎসরমাত্র চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিতে দিবেন। তাহার পরই তাঁহাকে নামাইয়া রাণাসঙ্গের সিংহাসনে তদীয় পুত্র উদয়সিংহকে বসাইবেন! তাঁহাদের মনের এ গূঢ়সঙ্কল্প তাঁহারা তৎকালে বনবীরকে জ্ঞাত করেন নাই। কিন্তু

সুচতুর বনবীর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিজ সৌভাগ্যপথের প্রধান কণ্টক উৎপাটন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তাই তিনি শিশু উদয়সিংহকে স্বহস্তে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া আপনার অভ্যুদয়পথ পরিষ্কৃত রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

ধাত্রী পান্নার অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি।

বনবীরের যে সঙ্কল্প—সেই কার্য্য। যে অভিষেক-রাত্রিতে কোন অজ্ঞাত ঘাতকের হস্তে বিক্রমজিতের গুপ্তহত্যা সাধিত হয়, সেই ভীষণ রাত্রিতেই বনবীর স্বহস্তে উদয়সিংহের প্রাণ-সংহার করিতে সংকল্প করিলেন।

ধাত্রী পান্নার নাম চিরদিন জগতে ঘোষিত হইবে। আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপিণী পান্না শিশু উদয়সিংহকে ও নিজ শিশু পুত্রকে লইয়া শয়নাগারে গিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। উদয়সিংহ দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। ধাত্রীর শিশুসন্তান এবং ধাত্রীও অকা-তরে ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময় অন্তঃপুরের আর্ত্তনাদে ধাত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই সময় এক নাপিত ভৃত্য উদয়-সিংহের উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া-ছিল। ধাত্রী তাহাকে এই আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যেকোন গুপ্তহত্যাকারীর অস্ত্রে রাণা বিক্রমজিতের প্রাণনাশ হইয়াছে। ধাত্রী তখনই বুঝিলেন যে এক হত্যার পর অপর হত্যার আর অধিক বিলম্ব নাই। যে হস্ত বিক্রম-জিতের প্রাণসংহার করিয়াছে—সেই হস্তই শিশু উদয়সিংহের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে—ইহা যেন কে তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া দিল। তখন প্রভুভক্তি জননী-স্নেহকে পরাজিত করিল। প্রত্যুৎপন্নমতি পান্না বুঝিলেন যে নিজ শিশুপুত্রকে বলি

না দিলে সঙ্গ-তনয় উদয়সিংহকে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। কারণ তিনি বুঝিলেন বনবীরের রক্তপিপাসা উক্ত রাজশিশুর হত্যা ব্যতীত নিবৃত্ত হইবার নহে। সুতরাং তিনি রাজশিশুর প্রাণরক্ষার জন্য আজ প্রাণপুত্তলী শিশু পুত্রকে বলি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রভুভক্তিই পান্নার একমাত্র ধর্ম্ম—আজ সেই পবিত্র ধর্ম্ম পালনের জন্য মানবরূপিনী দেবী পান্না উদয়সিংহের শয্যায় নিজপুত্রকে শয়ান করিয়া, একটী ফলের চুব্‌ড়ীর ভিতরে উদয়সিংহকে পূরিয়া পত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে ঢাকিয়া সেই বিশ্বস্ত নাপিত ভৃত্যদ্বারা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

পান্না উদয়সিংহকে বাহির করিয়া দিয়া তাঁহার শৈশব-দোলার উপর যেমন আপন পুত্রকে শয়ান করিয়াছেন, অমনি বনবীর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—'উদয়সিংহ কোথায়?' ধাত্রীর মুখে আর কথা আসিল না—অধরোষ্ঠ উত্তরদানে অস্বীকৃত হইল। তিনি কেবল সেই দোলার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। অমনই বনবীরের শাণিত অস্ত্র সেই দোলাস্থিত ধাত্রীপুত্রের হৃদয়ে নিহিত হইল। আজ ধাত্রী স্বচক্ষে নিজপুত্রের মৃত্যু দেখিলেন। উদয়সিংহের প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেন—এই আনন্দে আজ ধাত্রীর পুত্রশোক বিলীন হইল! ধন্য পান্না! ধন্য তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! ধন্য তোমার প্রভুভক্তি!

পাপিষ্ঠ বনবীর একবার তাকাইয়া দেখিতে সাহস করি-লেন না যে তিনি কাহাকে হত্যা করিলেন। পাপীর ন্যায় ভীরু ও অন্ধ জগতে আর কে আছে? তিনি ধাত্রীরঞ্জনকে হত্যা করিয়াই গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বতঃ প্রচারিত হইল যে বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই শোচনীয় সংবাদে অন্তঃপুরমধ্যে হাহাকার

ধ্বনি উঠিল। ক্রন্দনরোলে গগণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ধাত্রী পান্না প্রকৃত বৃত্তান্ত অতি কষ্টে গোপন রাখিয়া সেই কান্নায় যোগ দিলেন। ধাত্রী পান্না ক্ষত্রকুলোদ্ভবা। আজ এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ দ্বারা তিনি আজ আত্মবংশের পরিচয় দিলেন। পান্না অশ্রুজল দ্বারা পুত্রের চিতানল নির্ব্বাপিত করিয়া এবং অতি কষ্টে পুত্রশোক গোপন করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। যে উদয়সিংহ হইতে রাজরাজেশ্বরী চিতোর যবনের ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল, যে উদয়সিংহ কর্ত্তৃক মিবাররাজ্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, আজ সেই শিশু উদয়সিংহের রক্ষার্থ পান্না প্রাণপুত্তলীকে বলি দিয়া নগরের বাহিরের যেস্থানে সেই বিশ্বস্ত নাপিত তাঁহাকে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, পাগলিনীর ন্যায় তথায় ছুটিলেন।

বিশ্বস্ত নাপিত সেই রাজশিশুকে লইয়া বেরিস্ নদীর পুলিনদেশে অতি আগ্রহের সহিত পান্নার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই নদী চিতোর নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। সৌভাগ্য ক্রমে সেই রাজশিশু নগর হইতে অবতরণ করার পূর্ব্বে নিদ্রোত্থিত হয় নাই। তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া দেবলাভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং ইহার অধিপতি সিংহ রাওএর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে বীরবর বাঘ-জি রাও চিতোরের রক্ষানলে প্রাণাহুতি দিয়াছিলেন, সিংহরাও তাঁহারই উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি ধরাপড়ার ভয়ে এই গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং তাঁহারা ডোঙ্গারপুর নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাউল্ আইস্‌করণ্ তৎকালে এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দেবল্ রাজবংশের ন্যায় এই রাজবংশও চিতোর-রাজবংশের প্রবীণতর শাখা। তিনি রাণা সঙ্গের পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াও, নিজের ও রাজশিশুর প্রাণনাশের আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে নিজ ক্ষীণ মন্দিরে আশ্রয় দিতে সাহস করিলেন

না। সুতরাং তাঁহারা ঈদর ও আরাবলী পর্ব্বতের জটিল গুহার মধ্য দিয়া, ইহার আরণ্য ভিল অধিবাসিগণের রক্ষণে ও সাহায্যে, কমলমীর নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধাত্রী পান্না দেপ্রাজাতীয় জৈনধর্ম্মাবলম্বী আশাসা-নামক তথাকার শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। সাক্ষাৎকার হইলে তিনি রাজকুমারকে তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া তাঁহার ভবিষ্য রাজার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি প্রথমে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও ভয়চকিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের ভীরুতা দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"প্রভুপরায়ণতা কখন বিপদ বা কষ্টের দিকে তাকায় না। এই রাজকুমার রাণা সঙ্গের পুত্র, সুতরাং তোমার প্রভু। ইহার প্রাণরক্ষা করিলে ঈশ্বরকৃপায় তাহার ফল গৌরবপ্রসূ হইবে"।

সাহজী জননীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। অতঃপর সঙ্গতনয় সাহজীর গৃহে তদীয় ভাগিনেয়রূপে পরিচিত হইলেন। পাছে সাহজীর গৃহে রাজপুতরমণীর অবস্থানে লোকের মনে কোন সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়, এইজন্য প্রভুপরায়ণা পান্না রাজকুমারকে সাহজীর গৃহে রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

সর্ব্বদাই লোকে সাহজীর ভাগিনেয়-সম্বন্ধে নানাবিধ সন্দেহ করিত। অথচ মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না। কিন্তু একদিন এই রাজ-শিশুর সাহস দেখিয়া সকলের মনে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। একদা সাহজীর পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। রাজপুতগণ এক পংক্তিতে বসিয়াছেন, এবং সাহজীর স্বজাতীয় ধনবান্ বণিকেরা অপর পংক্তিতে বসিয়াছেন। একজন দধি পরিবেশন করিতেছিলেন, এমন সময়

রাজকুমার তাহার হস্ত হইতে দধি-পাত্র কাড়িয়া লইলেন। সকলে কত নিষেধ করিল, এবং কত ভয় প্রদর্শন করিল, কিন্তু তিনি বিদ্রূপ করিয়া সে সকল উড়াইয়া দিলেন। সাত বৎসর পরে উদয়সিংহের তেজস্বিতা ও স্বাধীন প্রকৃতি হইতে এই গুপ্ত কথা আপনিই প্রচারিত হইয়া পড়িল। এক সময় সোনিগুরা-অধিনায়ক, সাহজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। সাহজী তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উদয়সিংহকে প্রেরণ করেন। উদয়সিংহ এরূপ মর্য্যাদার সহিত সেই কর্ত্তব্য পালন করিলেন যে উক্ত সামন্তের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে—"এই বালক কখনই সাহজীর ভাগিনেয় নহে।" এই সংবাদ জনশ্রুতি দ্বারা সর্ব্বতঃ প্রসৃত হওয়ায় মিবারের সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ এবং কমলমীর নগরের অদূরবর্ত্তী সামন্তগণ রাণাসঙ্গের পুত্রকে অভিবাদন করিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সালুম্ব্রার সোহিদা-সামন্তগণ, চন্দবংশের প্রতিনিধি, চন্দাবতবংশের সামন্তগণ, বাগোরের সঙ্গ, কোটারিও এবং বৈদলার চোহানগণ, সোনিগুরার সামন্তপ্রবর প্রমর, সাঞ্চোরের সামন্ত পৃথ্বীরাজ, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সামন্তগণ এই বিষয়ের সত্য মিথ্যা নির্ণয়ার্থ কমলমীর নগরে গমন করিলেন। প্রভুপরায়ণা ধাত্রী পান্না ও সেই বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারের স্বাক্ষ্যে তাঁহাদিগের মনের সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইল।

একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, এবং সাহজী সেই সভার অধিনায়ক মিবারের সম্ভ্রান্ততম সামন্ত কোটারিয়ো চোহানের ক্রোড়ে চিতোরের রাজকুমারকে অর্পণ করিয়া নিজের গুরুতর দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এই সামন্তপ্রবর প্রথম হইতেই এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি এই রাজকুমারের রক্ষা সম্বন্ধে লোকের মনে যে শেষ সন্দেহ ছিল, তাহার অপনোদন-মানসে, রাজকুমারের সহিত এক-

পাত্রে বসিয়া ভোজন করিলেন। এ দিকে সোনিগুরা সামন্ত প্রমর তাঁহার কন্যার সহিত রাজকুমারের বিবাহ দিতে স্বীকার করিলেন। যদিও হামিরের সহিত বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় তিনি সোনিগুরাবংশের সহিত বিবাহ রাজাদেশ দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি মন্ত্রিসভা প্রমরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মন্ত্রিসভার উদ্যোগে কুম্ভনগরের দুর্গে উদয়সিংহের টীকাভিষেক সম্পন্ন হইল। তথায় মিবারের প্রায় সমস্ত সামন্ত তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন।

এই সংবাদ অবিলম্বে বনবীরের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বনবীর রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই নিজ দুর্ব্বিণীত ব্যবহারে সকলকেই বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত উত্তরাধিকারীর সমস্ত মর্য্যাদাও আচার ব্যবহার ধারণ করিয়াছিলেন। অধিক কি, যে সকল সম্ভ্রান্ত সামন্ত তিনি নীচ-জন্মা বলিয়া তাঁহার হস্তে দ্বূনা আহার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিতেও ভীত হইতেন না। পংক্তিভোজনের সময় রাজা ভোজ্যবস্তু হইতে অগ্রভাগ তুলিয়া স্বহস্তে যাঁহাকে পরিবেশন করিতেন, তিনিই আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন। কোন নিমন্ত্রণের সময় মিবারের সামন্তগণ রাজার সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবার অধিকার পাইতেন। সেই পংক্তিভোজনে সামন্তগণ আপন আপন পদমর্য্যাদা-অনুসারে পর পর বসিতেন। রাজা যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিবেন মনে করিতেন, তাঁহাকেই ঐ দ্বূনা প্রদান করিতেন। এই সহভোজনের সময় সামন্তগণ রাজার সহিত স্বাধীনভাবে কথোপকথন করিতে পাইতেন। তথাপি তাঁহারা আপন পিতার ন্যায় রাজার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত তাহার ক্রটী করিতেন না। এই প্রকার সামাজিক মিশ্রণে রাজা ও সামন্তবর্গের মধ্যে একটী সখ্যভাব সংস্থাপিত

হইত। রাজা যাঁহাকে দূ্যনা প্রদান করিতেন, তাঁহার তাহা গ্রহণ করিতেই হইত। নিজ পাচক দ্বারা রাজভোগের কিয়দংশ রাজা যাঁহাকে পাঠাইতেন তাঁহাকেও লোকে ধন্য বলিয়া মনে করিত। ইহার দ্বারা এই সঙ্কেত করা হইত যে তিনি রাজসমীপে আসিয়া কথোপকথন করিতে পারেন।

বিক্রমজিতের রাজত্বকালে কোন নিমন্ত্রণে. বিক্রমজিৎ কিসেনগড়ের রাঠোর-বংশীয় সামন্তকে এই দূ্যনা অর্পণ করিলে বিজোলী-সামন্ত তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কারণ বিজোলী সামন্ত মিবারের ষোলজন উচ্চশ্রেণীর সামন্তের অন্যতম। তিনি ইহাতে বিশেষ অপমান বোধ করিলেন। সুতরাং তিনি এই অপমান সহিতে না পারিয়া রাজার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন—"মহারাজ! আমি এখানে থাকিতে কচ্ছবহ বা রাঠোর সামন্তেরও এ সম্মান পাইবার অধিকার নাই। কিসেনগড়ের ঠাকুর ত আমার অনেক নিম্নে। সুতরাং আমার এই অবমাননা আমি এখানে বসিয়া দেখিতে পারিব না। সুতরাং আমি এখান হইতে চলিলাম।"

যে দূ্যনা পাইবার জন্য সামন্তগণের সকলেই লালায়িত, আজ দাসী শীতলসেনীর পুত্র বলিয়া বনবীর-প্রদত্ত দূ্যনা সামন্তগণ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। এক নিমন্ত্রণে রাণাবনবীর চন্দাবত সামন্তকে দূ্যনা অর্পণ করেন। তিনি তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠেন —"যে দূ্যনা বাপ্পা রাউলের সন্ততির হস্তে অতি পবিত্র ও সম্মানের বিষয়, তাহা দাসী শীতলসেনীর পুত্রের হস্ত দ্বারা প্রদত্ত হইলে অপমানের সামগ্রী হইয়া উঠে।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে সামন্তগণ সকলেই চন্দাবতসামন্তের অনুবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর

সকলে একবাক্য হইয়া কমলমীরে মিবারের প্রকৃত রাজা-রাজকুমার উদয়সিংহের নিকট গমন করিলেন।

সেই গুহাপথের মধ্য দিয়া পঞ্চশত অশ্ব ও দশ সহস্র বৃষের পৃষ্ঠে করিয়া কচ্ছদেশ হইতে বনবীরের কন্যার যৌতুকের জন্য বিবিধ পণ্য দ্রব্য লইয়া এক সহস্র গাড়ওয়াল রাজপুত গমন করিতেছিল। সামন্তগণ তাহাদিগের নিকট হইতে সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী কাড়িয়া লইলেন। বনবীরের আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্যের ইহা অপেক্ষা প্রমাণ আর কি হইতে পারে? রাণা উদয়সিংহের অনতিকালমধ্যেই ঝালোরের রাও এর কন্যার সহিত শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী সেই রাজকীয় পরিণয়কার্য্যে ব্যয়িত হইল। উক্ত বিবাহক্রিয়া ঝালোর রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ বাহ্লী-নগরে মহাসমারোহে নির্ব্বাহিত হইল। রাজস্থানের প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গ এই উপলক্ষে উদয়সিংহকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন বা পাঠাইয়া দিলেন। সামন্তগণের মধ্যে কেবল মাহোলীর সোলাঙ্কীবংশীয় সামন্ত ও টানার মালোজী এই উৎসবে যোগ দিলেন না। সুতরাং সমবেত সামন্তবর্গ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই যুদ্ধে মালজী হত হওয়ায়, সোলাঙ্কী আত্মসমর্পণ করিলেন। সুতরাং সর্ব্ব-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বনবীর কেবল রাজধানীতে আবদ্ধ রহিলেন। তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহার সাহায্যে সৈন্য আনয়ন করার ব্যপদেশে নগরীমধ্যে উদয়সিংহের প্রতি উৎসর্গী-কৃত-প্রাণ এক সহস্র সুদৃঢ় সৈন্য প্রবেশিত করাইলেন। তাহারা নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই নগরীর দ্বাররক্ষক-গণকে হঠধৃত ও নিহত করিল। অমনি 'রাণা উদয়সিংহের জয়!' ধ্বনিতে নব রাজত্ব উদ্‌ঘোষিত হইল। বনবীরকে ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া মিবার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিবার সুবিধা দেওয়া হইল। বনবীর মিবার হইতে পলা-

ইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এরূপ প্রবাদ আছে, যে নাগপুর রাজ্যের ভোনস্লাগণ এই বনবীরের বংশ হইতে সমুৎপন্ন।

এইরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৫৯৭ শকে (১৫৪১-২ খ্রীষ্টাব্দ) রাণা উদয়সিংহ মিবারের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। উদয়সিংহের রাজ্যাভিষেকে মিবারের সমস্ত প্রজা আনন্দে উৎফুল্ল হইল। এই সময় যে আনন্দগীতি প্রস্তুত হইয়া একতানে সর্ব্বত্র অভিগীত হইয়াছিল, উদয়পুরে আজও ঈশানী দেবীর মন্দিরে উৎসবকালে কুলবধুগণ একতানে গাইয়া থাকে। কিন্তু রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর হইতে মিবারের যে দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়াছে, উদয়সিংহের রাজসিংহাসনে আরোহণে তাহার পর্য্যবসান হইল না। রত্নের হঠকারিতা বিক্রমজিতের উচ্ছৃঙ্খলতা, বনবীরের নিষ্ঠুরতা ও রাণা উদয়সিংহের দুর্ব্বলতা—এই সমস্তই মিবারের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিল। অধিক কি, রাণা রত্ন ও বিক্রমজিতের পাপসকল রাণা উদয়সিংহের দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার সহিত তুলনায় পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতাই মিবারের পূর্ণধ্বংসের মূলকারণ হইয়া উঠিল। মিবারের ক্ষত্রিয়গণের মনে এতদিন যে জাতীয়তা ও অজেয়তার ভাব দৃঢ় অঙ্কিত ছিল, এতদিনে তাহা ক্ষালিত হইতে লাগিল।

নাবালগ বা স্ত্রীলোক যে রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, সে রাজ্যের আর দুর্গতির সীমা থাকে না। কিন্তু যে রাজ্যে নাবালগ ও স্ত্রীলোক—একসময়ে রাজত্ব করেন, সে রাজ্যের দুরবস্থা বর্ণনাতীত। এই সময়ে মিবারের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। মিবারের দুঃখের ভরা তাই পূর্ণ হইয়াছিল। উদয়সিংহের রাজোচিত কোন গুণই ছিল না। বিশেষতঃ যে বীরত্ব ও অদম্য সাহস ক্ষত্রিয়জাতির অমূল্য ও

অদ্বিতীয় পিতৃপৈতামহিক সম্পত্তি—রাণা উদয়সিংহ তাহাতে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন। তথাপি তিনি হুমায়ুনের রাজত্ব কালে, বা পাঠান সংঘর্ষ-সময়ে অনায়াসে সুখে ও সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ও রাজস্থানের, এবং হিন্দুজাতির দুরদৃষ্ট বশতঃ সেই সময় ভারতে এক নব যবনশক্তি আবির্ভূত হয়।

যে বৎসরে কমলমীরের মেঘমণ্ডিত প্রাসাদে রাণা উদয়-সিংহের উদ্ধারবিষয়িণী গীতিমালা অভিগীত হইয়াছিল, সেই বৎসরই আক্বরের জন্মের সংবাদ অমরকোটের প্রাচীর ভেদ করিয়া মরুভূমির বায়ুমুখে সমস্ত ভারতে প্রচারিত হয়। হুমায়ুন পলাইয়া—অনন্ত মরুভূমি পার হইয়া—পূর্ণগর্ভা মহিষীকে লইয়া এই নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তদীয় মহিষী এই পুত্ররত্ন প্রসব করেন। এই পুত্রই কালে ভারতের রাজচক্রবর্ত্তিগণের অগ্রণী হন। অমরকোট নগর ভারতীয় মরুভূমির অন্যতম ওয়েসিছ বা মরুদ্বীপ। প্রমর বংশের একটী শাখা সোকুদীবংশ। সেকন্দর সাহের দিগ্‌বিজয়কাল হইতে বা তাহার পূর্ব্ব হইতে এই বংশ এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। সেই সোকুদীবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে আক্বর সর্ব্বপ্রথমে আলোকের মুখ অব-লোকন করিলেন। তদীয় পিতা তথায় পলাতকভাবে অবস্থিত, তাঁহার মস্তক হইতে রাজমুকুট স্খলিত, এবং বাবরকর্ত্তৃক সে মুকুটলাভ অপেক্ষা, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি অভাবনীয়।

যে দশ বৎসর হুমায়ুন দিল্লীর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিরন্তর ষড়যন্ত্রে ও তাঁহাদিগের সহিত অবিরাম সংঘর্ষে এক দিন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। এই অন্তর্দৌর্ব্বল্যের অবস্থায় সের সাহ তাঁহাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিল্লীতে মোগল রাজ্যের ধ্বংস ও পাঠানরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কাণ্যকুব্জ রণক্ষেত্রে মোগল ও পাঠানের অদৃষ্ট পরীক্ষা হয়। এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী পাঠানদিগেরই অঙ্কশায়িনী হন। বিজয়ী সের-সাহ পরাজিত হুমায়ুনকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া প্রথমে আগ্রায়, ও তৎপরে লাহোরে লইয়া যান। তথা হইতে তাড়িত হইয়া হুমায়ুন নিজ পরিবার ও অল্পসংখ্যক অনুযাত্রিকবর্গ লইয়া সিন্ধুদেশে গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি কখন বা কোন হিন্দু নরপতির আশ্রয় প্রাপ্ত হন, এবং কখন বা অন্য কোন হিন্দু নরপতিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। সিন্ধুনদীর উভয় তীরের প্রতি দুর্গই তিনি বলে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিপদেই তিনি অকৃতকার্য্য হন। এই সময়ে তাঁহার অর্থাভাবজনিত কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার অনুযাত্রিকবর্গ অন্নাভাবে ও পথের কষ্টে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিয়া স্বজাতিদ্রোহী হিন্দুদিগের দয়ার উপরই নির্ভর করিলেন। কিন্তু কোথায়ও তাঁহার প্রার্থনা শ্রুত হইল না। তিনি জসলমীর ও যোধপুরের রাজার নিকট সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু তথায় সাহায্য পাইলেন না। ভট্টী ও রাঠোরেও এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলেন। অধিক কি মল্লদেব তাঁহাকে ধৃত করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুরাজন্যগণের এই অনতিথেয় ব্যবহারে হুমায়ুন মর্ম্মাহত হইয়া পলাইয়া মরুভূমির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথা অনেক দুঃখ কষ্ট সহিয়া অমরকোটের আতিথেয় সোড়াবংশীয় নরপতির আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

হুমায়ুনের পলায়ন।

এই পলায়মান যবন-নরপতির সৎসাহস ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি রাজোচিতগুণে সকলেই মুগ্ধ হইত। এই জন্যই তাঁহার কষ্ট-যন্ত্রণা বিশ্বজনীন সহানুভূতি উদ্দীপিত করিয়াছিল। হুমায়ুন নিজে জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তথাপি

তিনি নিজের অদৃষ্ট গণনা করিয়া দেখিতে বিস্মৃত হইলেন। তিনি যদি গণনা দ্বারা জানিতে পারিতেন যে তাঁহার এই উপস্থিত বিপৎ ভবিষ্য গৌরবের সূচনা মাত্র, তাহা হইলে তিনি কখনই অমরকোটের আশ্রয়দায়িনী সৈকত গিরিমালা পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পারস্যদেশে পলায়ন করিতেন না।

দিল্লীরসিংহাসনে পুনরধিরোহণ।

হুমায়ুন্ যেমন নিজে পিতার অধীনে শৈশবও বাল্যে বিপদ্বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পুত্র শিশু আকবরকেও সেইরূপ বিপদ্-বিদ্যালয়ে অধ্যাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৈতৃক রাজ্য অকুসিয়ানা, কান্দাহার ও কাশ্মীর, এবং পারস্যরাজ্যের মধ্যে তাঁহার অতি সুদীর্ঘ দ্বাদশবৎসর অদৃষ্টের বিবিধ বিবর্ত্তে অতিবাহিত হইল। এই কালের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে সেরসাহ হইতে সেকন্দর সাহ পর্য্যন্ত ছয় জন নরপতি অধিষ্ঠিত হন। শেষ পাঠান সম্রাট্ সেকন্দর সাহ হুমায়ুনের ন্যায় ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তর্বিচ্ছেদে জড়িত হইলেন। হুমায়ুন্ তৎকালে কাশ্মীরের অদূরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি এই আভ্যন্তরীণ বিবাদের সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদ উত্তরণপূর্ব্বক সার্হিন্দনগরের উপর আসিয়া পড়িলেন। সেকন্দর সাহ এই সংবাদ পাইবামাত্র মহতী সেনা লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অজাতশ্মশ্রু যুবরাজ আকবরের দুর্দ্দমনীয়তানিবন্ধন উভয় সৈন্যে অচিরাৎ ঘোরতর সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিশাল পাঠান সেনার সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া হুমায়ুনের রণপণ্ডিত প্রবীণ সেনাপতিগণের মতে উন্মত্ততামাত্র। কিন্তু হুমায়ুন তাহা মনে করিলেন না। তিনি নিজ বীর যুবা পুত্রকে অকুতোভয়ে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। আকবরের অসাধারণ বীরত্বে তদীয়

সেনা এরূপ উদ্দীপিত হইল, যে তাহারা পাঠান সেনার সংখ্যাধিক্য তুচ্ছ করিয়া, প্রচণ্ডবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বিজয়লক্ষ্মী বীরেরই অঙ্কশায়িনী হইয়া থাকেন। এই যুদ্ধে তিনি আক্‌বরের অতিমানুষবীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিলেন। পিতামহ বাবর যে দ্বাদশ বৎসরে ফার্ঘাণার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সেই দ্বাদশবৎসর বয়সেই আক্‌বর পিতার লুপ্ত সিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। এই বিজয়ই আক্‌বরের ধবল যশের পূর্ব্ব সূচনা। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র, এবং যোগ্যপুত্রের যোগ্য পিতা—হুমায়ুন্ সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া মহোল্লাসে ও মহোৎসবে দিল্লীতে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

হুমায়ুনের মৃত্যু।

কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে অধিক দিন এ সৌভাগ্যভোগ করিতে দেন নাই। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা অতি প্রবল ছিল। তাঁহার বংশের অন্যান্য নরপতির ন্যায় তাঁহারও জ্ঞানপিপাসা অতি প্রবল ছিল। রাজকার্য্য সমাপন করিয়া তিনি যে অবসর পাইতেন তাহা তিনি পাঠনায় অতিবাহিত করিতেন। একদিন তিনি নিজ পুস্তকালয়ে বসিয়া পাঠনায় নিমগ্ন ছিলেন, হঠাৎ কোন কারণে খোলা ছাদের উপর ধাবিত হওয়ায় তাঁহার পদস্খলন হইল। অমনি তিনি ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

আক্‌বরের দিল্লীর সিংহাসনাধিরোহণ।

আক্‌বরের পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়ার অব্যবহিত পরেই দিল্লী ও আগ্রা তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হয়। শেষে পঞ্জাবের এক কোণমাত্র তাঁহার রাজ্যে পর্য্যবসিত হয়। ঐতিহাসিকেরা আকবরকে ফরাশিরাজ চতুর্থ হেনরীর এবং

তদীয় মন্ত্রী বাইরাম খাঁকে উক্ত ফরাশিরাজের মন্ত্রী সলীর সহিত তুলিত করিয়াছেন। ইহাঁরা সমসাময়িক। বাইরাম খাঁর দুর্ণিবার বীরত্বে আকবরের লুপ্ত রাজ্য অচিরাৎ পুনরুদ্ধৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কাল্পী, চান্দেড়ী, কলিঞ্জার, সমস্ত বুন্দেলখণ্ড ও মালব অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। আকবর অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সাম্রাজ্যের সমস্ত ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।

রাজপুতগণের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান।

স্বরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন; মল্লদেব তাঁহার পিতার প্রতি অনতিথেয় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাঠোরবংশীয়গণের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন; এবং মাড়ওয়ারের দ্বিতীয় নগরী—মায়ের্ত্তা সবলে গ্রহণ করিলেন। অম্বররাজ বরমল্ল (Bharmul) দিল্লীশ্বরের অভিযানবার্ত্তা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। তিনি স্বয়ং ও তদীয় পুত্র ভগবান্‌দাস আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইলেন। অম্বরেশ যবনসম্রাটের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়া স্বরাজ্যকে তদীয় সাম্রাজ্যের অধান রাজ্য করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আক্‌বর উস্‌বেক্ সামন্তগণের বিদ্রোহ, ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিবারণ-মানসে এযাত্রা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীপ্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটাইয়া ও অন্তর্বিদ্রোহ নিবারিত করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চিতোরে রাণা উদয়সিংহ।

যে দেশে আইনের রাজত্ব বিদ্যমান ও যে দেশে রাজাই একমাত্র শাসনকর্ত্তা, সেই দেশই ধন্য। সে দেশের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ঘটিকাযন্ত্রের পেন্‌ডুলমের ন্যায় রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা দ্বারা সর্ব্বদা দোলায়মান নহে। এক নরপতির মহতী গুণ-পরম্পরা তাহাকে সৌভাগ্য-শিখরে তুলিয়া, আবার তাঁহার উত্তরাধিকারীর পাপে তাহাকে দুরবস্থাগহ্বরে প্রক্ষিপ্ত করিতে পারেনা। আক্‌বর ও উদয়সিংহ এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতিপোষকতা করিতেছেন।

দারিদ্র্যে কি ফললাভ করা যাইতে পারে, রাণা উদয়-সিংহের তাহা বুঝিবার উপযুক্ত বয়স হইয়াছিল। আর যদিও চিতোরের বীরচূড়ামণিগণ পুর্ব্বেই চিতোররক্ষানলে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, তথাপি উদয়সিংহকে এই বিষম সঙ্কটে—সদুপদেশ দিতে ও সৎপথে চালিত করিতে সক্ষম—মিবারে এরূপ লোকের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু দুর্ব্বল-মতি উদয়সিংহ কুসংসর্গে পড়িয়া সেই মতিমান্ ব্যক্তিগণের উপ-দেশ গ্রহণ করিলেন না। মিবারের দুর্ভাগ্যবশতঃ উদয়সিংহ কোন দুঃসাহসিনী কৌশলময়ী রমণীর হস্তে ক্রীড়নক-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। এই রমণীই অতঃপর উদয়সিংহের ও মিবারের নেত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন।

উদয়সিংহ ও আক্‌বর তুলিত।

যে বয়সে উদয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন তাহার অধিক বয়সেও আক্‌বর দিল্লীর সিংহাণ সনে আরূঢ় হন নাই। আক্‌বরের আশাতারাও উজ্জ্বলতর ছিল না। কিন্তু যে সুনক্ষত্রে তিনি সৈন্ধব মরুভূমিতে জন্ম গ্রহ-করিয়াছিলেন, সেই সুনক্ষত্রই আজ এই মহাপ্রাণ বাইরাম

খাঁকে, ও ধার্ম্মিকপ্রবর আবুল ফজল্‌কে তাঁহার মন্ত্রিরূপে প্রেরণ করিয়াছিল। উদয়সিংহ ও আকবর—দুইজনের সিংহাসনাধিরোহণের কালের সাম্য ব্যতীত—তাঁহাদের মধ্যে আর কোনও সাম্য ছিল না। ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিবর্ত্তনশীলতার বহুদর্শননিমিত্ত, আকবরের মনে মানব-প্রকৃতির সূক্ষ্মতত্ত্ব চির-অঙ্কিত হইয়াছিল। এদিকে উদয়সিংহের জন্মবৃত্তান্ত গুপ্ত থাকায় এবং তাঁহার শৈশবকাল কমলমীরের গুহা-প্রদেশে পরগৃহে অতিবাহিত হওয়ায় তাঁহার শিক্ষা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহার ভাগ্যে মানবচরিত্রপর্য্যবেক্ষণের সুবিধাও অল্প ঘটিয়াছিল।

আকবরই মোগলসাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজপুতস্বাধীনতার কৃতকার্য্যসংহর্ত্তা। মানবচরিত্র-নির্ব্বাচনে বিচক্ষণতা ও অসাধারণকার্য্যতৎপরতা নিবন্ধন, তিনি সহজেই অদম্য রাজপুতগণের পদে সুবর্ণশৃঙ্খল পরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুহকী আকবর ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে এই শৃঙ্খলের ভার বহনে সমর্থ ও সহিষ্ণু করিলেন; প্রত্যেক জাতির জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া এবং তাহাদিগের জঘন্য ভোগলালসা পরিতৃপ্তি করণের সাধনীভূত হইয়া প্রত্যেক জাতিকেই নিজের বশে আনিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তাঁহার শাণিত করবাল সেই বীরদলকে ক্রমে নির্ম্মূল করিতে লাগিল।

আকবরের অমিত পরাক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়বীর্য্যবহ্নি, নির্ব্বাপিত হইল। ক্ষত্রিয়তেজ নির্ব্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হইল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আকবরের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইলে, তিনি প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয় মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। রাজোচিতগুণে তিনি ভারতীয় ভূত ও ভবিষ্যৎ কোন নরপতিরই ন্যূন ছিলেন না।

যদিও তিনি দুর্দ্দমনীয় রাজ্যপিপাসায় উন্মত্ত হইয়া সাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন প্রভৃতি ভারতের ধ্বংসকারী বিজেতৃগণের ন্যায় একলিঙ্গের মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে ও সেই সেই উপাদানে কোরাণপ্রচারবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তথাপি বিজয় সমাপ্ত হইলে তিনি বিশ্বজনীন সদ্ব্যবহারে ও অবিচলিত অপক্ষপাতিতায় হিন্দুদিগের হৃদয়ক্ষত আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোটী কোটী ভারতবাসী হিন্দু তাঁহাকে একবাক্যে 'জগদ্‌গুরু' এই মহা গৌরবের উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। অধিক কি তাঁহারা—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—এই বাক্যে তাঁহাকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অদ্যাবধি কোন যবন-নরপতিই হিন্দুগণ কর্ত্তৃক এরূপ ঐকতানিক যশোগীতি দ্বারা অভিগীত হন নাই।

এদিকে মিবাররাজ রাণা উদয়সিংহে রাজোচিত গুণের পূর্ণ অসদ্ভাব মিবারের দুঃখভরা পূর্ণ করিল। সিসোদিয়াবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাতা ভবানী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন যে যত দিন বাপ্পারাউলের কোন বংশধর, তাঁহার সেবায় রত থাকিবেন, ততদিন তিনি চিতোরের মহাগৌরবের অধিত্যকাপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া কখনই যাইবেন না। আল্লা কর্ত্তৃক চিতোরের প্রথম আক্রমণ কালে দ্বাদশজন মুকুটী মিবারের লোহিত পতাকা করে লইয়া চিতোররক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে করিতে সমরশায়িত হন। দ্বিতীয়বার যখন মালবাধিপতি বাজবাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন, তখনও মিবার-রাজবংশের শাখাসম্ভূত দেবল-সামন্ত চিতোররক্ষানলে আত্মাহুতি দিয়া স্বদেশের জন্য উৎসৃষ্টপ্রাণ—এই গৌরবের উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

চিতোরের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর অন্তর্ধান।

কিন্তু এই তৃতীয় ও বিশালতম সংঘর্ষের সময় কোনমুকুট-ধারী চিতোরদেবীর চরণে বলি পড়িয়া তাঁহাকে প্রসন্না করিতে সমুদ্যত হইলেন না। যে দেবী ভবানীর কটাক্ষপাতে শত্রুসেনা চিতোরের প্রাকারমালার পাদদেশে আসিয়াই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইত, আজ সেই দেবী রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতা হইয়া চিতোরনগরী হইতে সহসা অন্তর্হিতা হইলেন। যাঁহার অধিষ্ঠানে এতদিন চিতোরবাসিগণ আপনাদিগকে অজেয় বলিয়া মনে করিতেন, আজ সেই মোহিনীশক্তি অন্তর্হিতা হইলেন। যে দেবীমূর্ত্তি সেই গভীরা রজনীতে সমর-শ্রীর শয়নমন্দিরে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন "তোমার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু গৌরব-রবি অস্তমিত হইবে।" সেই দেবী আজ নিজ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবার মানসেই যেন কাপুরুষ উদয়সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। চিতোরের যে প্রাকারমালা এতদিন গৌরবমণ্ডলের ন্যায় ইহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, এবং যে প্রাকারাবলী এত দিন কাল স্ফীতবক্ষে রাজপুতগণের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মকে শত্রুর করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ দেবীর তিরোধানে তাহা যেন অরক্ষিতা ও চ্যুতগৌরবা হইয়া পড়িল।

দেবীর অন্তর্ধানে চিতোরের অরক্ষণীয় অবস্থা।

জাতীয় বিশ্বাস যে জাতীয় মহতী অবদানপরম্পরার মূল, অতীতস্বাক্ষী ইতিহাস তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। বিশেষতঃ ইহা যে মিবারের জাতীয় গৌরব ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রধান উদ্দীপক, ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিতেছে। এই বিশ্বাস—যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির প্রধান প্রতিরোধক বলিয়া,

দার্শনিক ও মানবপ্রেমিকগণ ইহার সবিশেষ সমর্থন করিয়া থাকেন। এই অন্ধ বিশ্বাস জাতীয় গাথার আচ্ছাদনে আবৃত থাকিয়া জাতীয় কার্য্যের উদ্দীপনা করিয়া থাকে। এই জাতীয় বিশ্বাসের উপলময়ী প্রাচীরাবলী চূর্ণীকৃত কর, দেখিবে যে জাতীয় জীবনও তাহার সহিত চূর্ণীকৃত হইবে। এই বিশ্বাসের বলে এত দিন চিতোরবাসিগণ চিতোরনগরীকে অজেয় বলিয়া মনে করিতেন, দেবীর অন্তর্ধানের সহিত সে বিশ্বাসও আজ অপনীত হইল। আজ তাঁহারা সেই চিতোরনগরীকে অরক্ষণীয়া বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যে চিতোরনগরী সহস্র বৎসর ধরিয়া বিখ্যাতনামা নৃপতিবৃন্দের বীরত্ব-বিলসনভূমি ছিল, এবং যে নগরী সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতীয় নগরীমালার শীর্ষস্থানীয় ছিল, আজ কি না সেই চিতোর-নগরী আরণ্য জন্তুগণের আবাসভূমি হইয়া উঠিল! ইহার যে দেবমন্দির সকলে ভগবান্ এক লিঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তথায় সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূকাদি হিংস্র জন্তুগণ আশ্রয় পাইল! যে চিতোর এক দিন সর্ব্ব সৌভাগ্যের আধারভূমি ছিল, আজ তাহা অলক্ষ্মীর আলয় বলিয়া বিবেচিত হইল! অধিক কি বিজয়ের পর যে চিতোর-প্রবেশকালে একদিন মিবারের রাণাগণ আনন্দে ও উৎসবে মাতিয়া উঠিতেন, আজ তাহাতে তাঁহাদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া উঠিল! এ বিবর্ত্তনশীল জগতেও এরূপ পরিবর্ত্তন অতি বিরল ও অতি শোচনীয়।

আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ।

যবন ঐতিহাসিক ফেরিস্তা আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোরের একবার মাত্র আক্রমণের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজস্থানের ঐতিহাসিকেরা তৎকর্ত্তৃক চিতোরের দুইবার আক্রমণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। রাণার অপ্রশস্ত-

পরিণীতা রাণীর অতিমানুষবীরত্বেই চিতোর প্রথমবার আক্বরের করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। উক্ত রাণী এক দল আক্রমণকারী সৈন্যের শীর্ষস্থানীয়া হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া আক্বরের শিবির পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। আক্বর প্রতিকৃত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগত হন। দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ রাণা ঘোষণা করেন যে তাঁহার রাণীর বীরত্বেই এ যাত্রা চিতোর শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইল। এই ঘোষণায় মিবা-রের সামন্তবর্গ আপনাদিগকে নিতান্ত অবমানিত মনে করি-লেন, এবং এই অবমাননার মূলীভূত কারণ উন্মূলিত করিবার মানসে সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া সেই বীরা রাণীর প্রাণবধ করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহাদিগের সহিত রাণার ঘোরতর মনোবাদ বাধিয়া উঠিল। সুচতুর আক্বর এই অন্তর্ব্বিচ্ছেদের সংবাদ পাইয়া দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ ও অবরোধ করিলেন। আক্বর জীবনের পঞ্চবিংশ সোপানে পদার্পণ করিয়াই 'চিতোরবিজয়ী'—এই গৌরবের উপাধি লাভের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া দ্বিতীয়বার চিতোরের তোরণদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। লোকে আজও তাঁহার শিবিরসন্নিবেশের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার সৈন্যাবাস পাণ্ডোলী গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া বুসী পর্য্যন্ত দশমাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। যে স্থানে আক্বরের নিজের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, সে স্থানে এখনও একটী মার্ব্বেল-প্রস্তরময় কীর্ত্তিস্তম্ভ নিখাত আছে। ইহাকে লোকে আজও আকবরকা দেওয়া বা আক্বরের দীপ বলিয়া থাকে।

উদয়সিংহের চিতোর পরিত্যাগ।

আক্বর চিতোরের তোরণদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইবা-মাত্র কাপুরুষ রাণা উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া

পলায়ন করিলেন। সামন্তগণের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার পর হইতেই তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আজ আকবরের আগমন তাই তিনি অনুকূল গলহস্ত বলিয়া মনে করিলেন। আজ আবশ্যকতা তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত হওয়ায় তিনি পিতৃপৈতামহিক রাজধানী মহাগৌরবান্বিতা চিতোরনগরীকে শত্রুকবলে নিক্ষেপ করিয়া অনায়াসে চলিয়া গেলেন। ধিক্ উদয়সিংহ। শতধিক্ তোমার জীবনে!! রে ক্ষত্রিয়াপসদ! তোর পাপেই আজ সোনার ভারতভূমি শত্রু-পদদলিতা!!!

সামন্তগণ কর্ত্তৃক চিতোর রক্ষা।

কাপুরুষ ক্ষত্রকুল-কলঙ্ক উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, চিতোরের বীরবৃন্দও চিতোররক্ষার্থ সুসজ্জিত হইলেন। বীরচূড়ামণি সহিদাস চন্দবংশীয় বীরদল লইয়া ‘সূর্য্য-তোরণ-মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। থার্ম্মোপিলি গিরিগুহামুখে বীরবর লিয়োনিডাস্ ও তদীয় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ তিনশত স্পার্টানবীরের ন্যায় সেই তোরণমুখে সহিদাস ও তদীয় বীরদল প্রচণ্ড শত্রুসেনাতরঙ্গিনীর গতিরোধ করিতে গিয়া সমরশায়িত হইলেন! তাঁহাদিগের রুধির-বিধৌত শিলাপটে সহিদাসের সমাধিমন্দির আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদিগের অনন্ত কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এদিকে মাদারিয়াধিপতি রাউৎ দুদা সঙ্গ-বংশীয় বীরদল লইয়া রণে অগ্রসর হইলেন। আর দিল্লীশ্বর-পৃথ্বীরাজের বংশে উৎপন্ন বৈদল ও কোটারীয় সামন্তদ্বয়, বিজোলীসামন্ত প্রমর ও সদ্রী-সামন্ত ঝাল প্রভৃতি মিবারের সামন্তগণ নিজ নিজ বীরত্বে স্ব স্ব সৈন্যগণকে অনুপ্রাণিত করিলেন। এতদ্ভিন্ন দেবলের অন্যতম পুত্র সোনিগুরাবংশোদ্ভব ঝালোরাধিপতি রাও,

রাঠোরাধিপতি ঈশ্বরীদাস, কচ্ছবাহ সামন্ত করম্‌চাঁদ, সেকাবত সামন্ত দুদাসদনী, এবং গোয়ালীয়ারাধিপতি—বহিশ্চর এই কয়জন বীর আসিয়া তাঁহাদিগের বলবৃদ্ধি করিলেন।

কিন্তু এই শত শত বীরতারা মিবারগগণের যে অন্ধকার বিদূরিত করিতে পারিলেন না, বেদনোরের জয়মল্ল ও কৈলবের পুত্ত—মিবারের রবিচন্দ্র—যুগপৎ উদিত হইয়া সে অন্ধকার বিদূরিত করিলেন। ইহাঁরা মিবারের ষোলজন প্রথম শ্রেণীর সামন্তের মধ্যবর্ত্তী। মিবারের ইতিহাসে এই দুই বীরচূড়ামণির অতিমানুষবীরত্বের অপূর্ব্বকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। অধিক কি চিতোরবিজয়ী আকবর স্বলেখনী দ্বারা ইহাঁদিগের যশোগান করিয়া ইহাঁদিগকে অমর করিয়া গিয়াছেন। জয়মল্ল মৈত্রিয়ার রাঠোরবংশ হইতে সমুৎপন্ন—এবং মিবারের সামন্তবর্গের মধ্যে সাহসিতম। পুত্ত চন্দ্রবংশের প্রধান শাখা যুগাবৎ বংশের শীর্ষস্থানীয়। 'জয়মল্ল ও পুত্ত'—এই দুই নাম আজও মিবারের প্রতিগৃহে প্রাতঃস্মরণীয়। যত দিন রাজপুতগণের স্মৃতিপটে অতীত গৌরবের রেখামাত্রও অঙ্কিত থাকিবে, ততদিন তাঁহারা কখনই এই দুই পবিত্র নাম বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যদি চিতোরাধিরাজ উদয়সিংহ আজ রণস্থলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে বীরত্বের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করিতেন, তাহা হইলে মিবারের ইতিহাস ও ভারতের অদৃষ্ট যে কিরূপ উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা এই উদ্দীপনা প্রাপ্ত না হইয়াও এই রণস্থলে যেরূপ অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে অতি বিরল। অধিক কি, ইহাঁদিগের বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া চিতোরের বীরনারীগণ সমরসাজে সজ্জিত হইয়া অসিহস্তে প্রচণ্ডবেগে সমরপ্রাঙ্গণে আসিয়া অবতীর্ণা হইলেন।

বীরবর পুত্ত সৈন্যাপত্যে বৃত এবং মাতা ও পত্নীসহ রণে হত।

সালুম্ব্রাধিপতি সূর্য্যতোরণ-মূলে পতিত হইলে পর কৈলব-সামন্ত পুত্তের উপর মিবারের সৈন্যাপত্য অর্পিত হইল। পুত্ত তখন ষোড়শবর্ষীয় যুবকমাত্র। তাঁহার পিতা পূর্ব্ব আক্রমণের সময় সমরশায়িত হন। তদবধি তদীয় জননী তাঁহার লালন পালন করিয়া আসিতেছিলেন। একমাত্র বংশধর হইলেও স্পার্টান্ রমণীর ন্যায় পুত্তজননী কর্ম্মদেবী প্রাণপুত্তলীকে স্বহস্তে সমরসাজে সাজাইয়া চিতোরের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য সমরপ্রাঙ্গণে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং সমরসাজে সাজিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া চরিত্র-মাহাত্ম্যে স্পার্টান্ রমণীকেও অতিক্রম করিলেন। পাছে তাঁহাদের শোকে পুত্রবধূ অধীরা হইয়া পড়েন, এই জন্য তিনি সেই জগল্ললামভূতা বালার হস্তে শাণিতফলক বর্ষা দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া চিতোরশিখর হইতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। বীরা সতী অতিমানুষবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া পতির ও শ্বশ্রূমাতার পার্শ্বেই সমরশায়িতা হইলেন। কর্ম্মদেবীও পুত্র ও পুত্রবধূর ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিলেন না। রাজপুতবীরবৃন্দ রাজপুতবীরনারীগণের তাদৃশ বীরত্ব দেখিয়া, রণোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। মাতাপুত্র প্রচণ্ড অসি-প্রহারে অগণ্য যবন সংহার করিয়া চিতোররক্ষানলে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন। ধন্যা কর্ম্মদেবী! ধন্যা পুত্তবধূ!! ধন্য বীরচূড়ামণি পুত্ত!!!

জয়মল্ল সৈন্যাপত্যে বৃত ও রণে নিহত।

পুত্তের পতনে জয়মল্লের উপর সৈন্যাপত্য প্রদত্ত হইল। এতদিন তাঁহারা প্রাণপণে চিতোরের রক্ষা কার্য্যেই নিযুক্ত

ছিলেন। শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণের চিন্তাও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। এমন সময় হঠাৎ একটী জ্বলন্ত গোলা আসিয়া জয়মল্লকে আহত করিল। গোলার আঘাত সাংঘাতিক মনে করিয়া, আর চিতোর রক্ষার কোনও আশা নাই দেখিয়া, তিনি বীরের ন্যায় মরিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদাদেশে অষ্ট সহস্র রাজপুতবীর সমরাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা শেষ সহভোজনে তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া মিবারের তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। তাঁহাদিগের প্রচণ্ড অসিপ্রহারে যবনকুল নির্ম্মূল হইতে লাগিল। কিন্তু অবিরাম যুদ্ধে অবশেষে তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অগণ্য যবন পড়িয়া সেই বীরদলকে সমূলে নিহত করিল। সেই পীতাম্বরা চির-রাজরাজেশ্বরী মিবার নগরীকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিবার কলঙ্কভোগ করিবার জন্য সেই বীরবৃন্দের কেহই জীবিত রহিলেন না। 'মানবজাতির অভিভাবক, এই গৌরবান্বিত উপাধিধারী আক্‌বর সেই পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করিয়া ত্রিশ সহস্র নিরীহ অধিবাসীকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় রাজ্যপিপাসা অগণ্য মানবের রুধিরে অতঃপর নিবারিত হইল।

চিতোরের ধ্বংস।

এই বিষম সমরে বড় বড় গৃহের অধিনায়কগণ ও মিবার রাজবংশের শাখাপ্রশাখা-সম্ভূত সপ্তদশ শত সামন্ত নিহত হন। এতদ্ভিন্ন নয়জন রাণী পাঁচ জন রাজকন্যা, দুইটী রাজশিশু, এবং প্রধান প্রধান সামন্তগণের পরিবারবর্গ সমরাঙ্গনে বা জোহরানলে আত্মাহুতি প্রদান করেন। কেবল তুয়ারবংশীয় গোয়ালিয়ারাধিপতি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। আজ

আদিত্যের দিনে মিবারের স্বাধীনতা-সূর্য্য চিতোরশিখরে শেষ কিরণ বিকীরণ করিয়া অস্তমিত হইলেন। হায়! আর সে সূর্য্যের উদয় হইল না। শত শত মুকুটীর বলভিত্তি চিতোরনগরী আজ ভূমিসাৎ হইল। ইহার অগণ্য দেব-মন্দির ও প্রাসাদাবলী ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। অধিক কি, ইহার অবনতি ও নিজ বিজয় পূর্ণ করিবার মানসে আক্‌বর ইহার রাজচিহ্নসকল হরণ করিয়া লইলেন। যে নকড়া চিতোরের রাণাগণের নগরপ্রবেশ ও নগরীবহির্গমনেরকালে প্রতিহত হইয়া এই বার্ত্তা কত কত মাইল দূর ব্যাপিয়া উদ্ঘো-ষিত করিত, সে নকড়াবাদ্য চিতোরে আজ হইতে রহিত হইল। আজ পর্য্যন্তও তাহা বাজিল না, আর বাজিবে কি না কে বলিতে পারে? যে মাতা ভবানী তাঁহার করাল অসি বাপ্পারাউলের কটিদেশে বিলম্বিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং যে অসি লইয়া বাপ্পারাউল চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, আজ আক্‌বর সেই দেবীর মন্দিরকে ইহার বহুমূল্য ঝাড় লণ্ঠন হইতে বিচ্যুত করিলেন। আর ইহার দুঃখের ভরা পূর্ণ করি-বার জন্যই যেন আক্‌বর ইহার তোরণদ্বারগুলি লইয়া স্বপ্রতিষ্ঠাপিত নগরী আক্‌বরাবাদের শোভা সম্বর্দ্ধন করি-লেন। চ্যুতাভরণা মলিন-বসনা আলুলায়িতকেশা ঝরিত-নয়না ধরণীপ্রোথিতনয়না নবীনা নব বিধবাকে দেখিলে পাষাণও যখন গলিত হয়, আজ চ্যুত-গৌরবা ত-সর্ব্বস্বা চূর্ণীকৃতা-ভরণা রাজরাজেশ্বরী চিতোর নগরীকে দেখিয়া ভাবুকের হৃদয় যে গলিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আক্‌বর স্বহস্তে বীরবর জয়মল্লকে বধ করার গৌরব দাবী করিলেন। যবন ঐতিহাসিক আবুল্ ফজল্ ঘটনার সত্যতা নিজ ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর যে বন্দুক লইয়া আক্‌বর জয়মল্লের প্রাণবধ করিয়াছিলেন, আক্‌-বর জয়মল্ল সিংগ্রামের নামে যে তাহার নাম সিংগ্রাম রাখি-

য়াছিলেন—জাহাঙ্গীরনামাতেও তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আকবর যে চিতোরবিজয়ী হইয়া কেবল নিজের গৌরব ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে। তিনি দিল্লীতে নিজ তোরণদ্বারের সম্মুখে জয়মল্ল ও পুত্তের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া নিজ গুণগ্রাহিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

যখন কার্থেজিনীয় সেনাপতি বীরবর হ্যানিব্যাল্ সুপ্রসিদ্ধ কাণী সমরে জয় লাভ করিয়াছিলেন, তখন সেই মহারণে নিহত রোমীয় সৈনিকগণের অঙ্গুলি হইতে সংগৃহীত অঙ্গুরীয়কের পরিমাণ অনুসারে আপনার বিজয়ের পরিমাপ করিয়াছিলেন। আজ আকবর সেইরূপে এই মহাসংঘর্ষে হত রাজপুত বীরবৃন্দের কণ্ঠদেশ হইতে উন্মোচিত হারের হীরক পান্না প্রভৃতির গুরুত্ব অনুসারে আপনার বিজয়ের গুরুত্ব নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এই মূল্যবান্ হীরা জহরাদির ওজন ৭৪॥০ মণ হইয়াছিল। অতঃপর রাজ-স্থানের বণিকেরা পত্রাদির খামের উপর এই ৭৪॥০ সংখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সঙ্কেতের অর্থ এই যে যিনি তৎসংখ্যাঙ্কিত পত্র খুলিবেন, চিতোরধ্বংসের পাপ তাঁহাতে অর্শিবে।

রাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে।

পাঠক! এস আমরা প্রকৃতের অনুসরণ করি। দেখি এস! সেই কাপুরুষ রাণা উদয়সিংহ এখন কোথায়? ঐ দেখ! তিনি চিতোর হইতে পলাইয়া রাজপিপ্পীর অরণ্যে গোহিলগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথা হইতে তিনি আরাবলীর গিরিগুহা বহিয়া, চিতোর বিজয়ের পূর্ব্বে বাপ্পারাউল যে, গুপ্ত স্থান আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই স্থান আসিয়া অধিকার করিলেন। এই দুর্ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে এই গিরিগুহার

মুখে রাণা স্বনামে 'উদয়-সাগর' নামে এক প্রকাণ্ড হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন। এই হ্রদ অদ্যাপি 'উদয়-সাগর' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সেই হ্রদের অদূরে চতুর্দ্দিকে গিরি-বেষ্টিত স্থানে উদয়সিংহ 'নচৌকি' নামে নিজ প্রাসাদ নির্ম্মা-পিত করিলেন। অচিরকালমধ্যে ইহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অসংখ্য অট্টালিকানির্ম্মিত হইয়া গেল। তখন রাণা উদয়-সিংহ এই নব-নির্ম্মিত নগরীর নিজ নামে নামকরণ করি-লেন। এই উদয়পুর অতঃপর মিবারের রাজধানী হইল। চারিবৎসরমাত্র উদয়সিংহ চিতোরচ্যুতিজনিত শোক ভোগ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে গোগুণ্ডানগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই বয়সেই তিনি ইচ্ছা করিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন ও গৌরব-বর্দ্ধন করিয়া যাইতে পারিতেন।

রাণা উদয়সিংহ পঞ্চবিংশ ঔরসপুত্র রাখিয়া যান। ইহাঁ-দিগের অধিকাংশই শিশু ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিত। তাঁহাদিগের বংশপরম্পরাক্রমে 'বাবা' নামে আখ্যাত হইল। এই 'বাবা' বংশ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমে রাণাবত, পুরাবত, ও কণাবত—এই তিন নাম ধারণ করিল।

উদয়সিংহ জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ জীবিত থাকিতেই প্রিয়-তম ও অন্যতমপুত্র যুগমল্লকে আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথির রজ-নীতে যখন প্রতাপসিংহ ও মিবারের সামন্তবর্গ উদয়সিংহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে যুগমল্ল মহোৎ-সবে উদয়সিংহের রাজপ্রাসাদে তদীয় সিংহাসনে অধিরো-হণ করিলেন। যখন রাজপ্রাসাদ আনন্দবাদ্যধ্বনিতে ও 'মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন' এই জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সেই সময়েই—উদয়সিংহের চিতারপার্শ্বে

প্রতাপকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য সামন্তগণের ষড়-যন্ত্র চলিতে লাগিল। উদয়সিংহ সোনিগুরা রাজকন্যার পানি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পরিণয়ের ফলে রাণা প্রতাপ। তাই ঝালোর রাও ভাগিনেয়ের জ্যেষ্ঠাধিকার সমর্থন করি-বার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি চন্দাবতবংশের অধি-নায়ক সামন্তপ্রবর কৃষ্ণকে বলিলেন—'আপনারা এরূপ অবিচারের সমর্থন করিলেন কিরূপে?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন—'যদি কোন রুগ্ন প্রাচীন ব্যক্তি মৃত্যু-শয্যায় দুগ্ধ-পান করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধ কি কখন লঙ্ঘন করা যায়? যাহা হউক প্রতাপই আমার মনোনীত রাণা, এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করিব না।' এই বলিয়া তাঁহারা রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

প্রতাপের অভিষেক।

তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়া দেখিলেন যে প্রতাপ নগর হইতে যাইবার জন্য দ্রব্যসামগ্রী গুছাইতেছেন, আর যুগমল্ল রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। রাউৎ কৃষ্ণ, গোয়া-লিয়ারাধিপতি ও প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া রাজদরবারে গমন করিলেন। কৃষ্ণ ও গোয়ালিয়ারাধিপতি দুইজনে অভ্যর্থনচ্ছলে যুগমল্লের দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে সিংহাসন হইতে নামা-ইয়া সম্মুখের আসনে বসাইলেন এবং বলিলেন 'মহারাজ! জ্যেষ্ঠ উপস্থিত থাকিতে রাজসিংহাসনে বসা আপনার সঙ্গত নয়। ঐ স্থানে বসিবার আপনার জ্যেষ্ঠেরই অধিকার।' এই বলিয়া সকলে প্রতাপকে রাজ-সিংহাসনে বসাইলেন, এবং তাঁহাকে সকলেই একবাক্যে মিবারের রাণা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

চতুর্দ্দিক মাঙ্গল্যবাদ্যের নির্ঘোষে ও জয়ধ্বনিতে উদ্ঘোষিত হইল। আজ প্রতাপ নির্ব্বাসিত না হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন! আজ যোগ্যে যোগ্য স্থান পাইল বলিয়া মিবারবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

প্রতাপের অভিষেকের পর সামন্তবর্গ তাঁহাকে লইয়া সেই দিনই মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। সেই মৃগয়া-উপলক্ষে প্রতাপ যে কৃত্রিম রণ-কৌশল ও বীরত্ব দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্য কার্য্যক্ষেত্র সংসূচিত হইল।

রাণা প্রতাপসিংহ।

ঐ যে সম্মুখে করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কুশাসনে বসিয়া দেবমূর্ত্তি যোগীর ন্যায় ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন উনি কে? উনি কি যোগী—তাই আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন আছেন? না তাহা হইতে পারে না। কারণ উহাঁর মুখমণ্ডলে বিষাদ-রেখাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন অতীত দুর্ঘটনার বিষাদময়ী ছবি যেন উহাঁর আননদর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে! উহাঁর সর্ব্বশরীরে যেন স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের ভাব মাখান রহিয়াছে। অতীত জাতীয় মাহাত্ম্যের স্মৃতির সহিত বর্ত্তমান জাতীয় অধঃপতনের জ্ঞান উহাঁর বদনমণ্ডলে যেন বিসদৃশভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। উহাঁর অন্তরে এই দুই ভাবের এখনও সামঞ্জস্য হইতেছে না বলিয়াই যেন তথায় বিজাতীয় যাতনার তরঙ্গ উঠিয়াছে। সেই তরঙ্গতাড়নে তিনি যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। ও চিন্তা নয়—বিভিন্ন ও অসামঞ্জসীভূত ভাবদ্বয়ের ঘাতপ্রতিঘাত-জনিত অভিভূতি! আহা! এই ঘাতপ্রতিঘাতে এই দেবমূর্ত্তি হইতে কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃপুঞ্জ বিনির্গত হইতেছে! দেব! তুমি কে? যেন শূন্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—'উনি রাজর্ষি ক্ষত্রিয়কুলতিলক রাণা প্রতাপ'।

প্রতাপ মিবারের রাজসিংহাসনে নবাধিরূঢ় হইয়াছেন! মিবারের সেই অপূর্ব্ব রাজধানী চিতোরনগরী মোগলগণ কর্ত্তৃক ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। মিবারের ধনাগার শূন্য: রাজপুতগণ—কুটুম্ব ও সামন্ত সকলই—পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ভগ্নাশ—এবং অধিকাংশ সেই কুহকী যবন সম্রাট্ আকবরের নিকট আত্মবিক্রীত। কিন্তু কোন বাধা বিপত্তিতেও প্রতাপের মন বিচলিত হইবার নহে। পিতা রাণা

উদয়সিংহের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ ও চিতোরের উদ্ধার-সাধন—এই দুই ব্রতপালনে প্রতাপ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিরূপে সেই ব্রতপালন করিবেন—তাহারই জন্য তিনি ভগবতী মহাশক্তির মানস-পূজা করিতেছেন।

ঐ দেখ! প্রতাপ ভগবতী মহাশক্তি কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত ও অভীষ্ট সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিতেছেন। দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতাপ মোগলের অনন্ত শক্তিকে উপহাস করিতেছেন। পূর্ব্বপুরুষগণের অতিমানুষবীরত্বের অগণ্য কাহিনী তাঁহাকে এই কার্য্যে উদ্দীপিত করিতেছে। চিতোর একাধিকবার শত্রুগণের কারাগারে পরিণত হইয়াছিল, আবার সেই কারাগারে যে পরিণত হইবে না কে বলিল? প্রতাপের বিশ্বাস, যে অবশ্যই হইবে। প্রতাপ জানিতেন, ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা—চিরদিন যে তিনি দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি প্রসন্না থাকিবেন এরূপ হইতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস যে ভাগ্য-বিবর্ত্তন যদি তদীয় চেষ্টার সহায়তা করে, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ দিল্লীর অস্থির সিংহাসনকে অপার জলধিজলে নিমগ্ন করিতে পারিবেন। প্রতাপের অন্তরে এই বিশ্বাস এতদুর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তিনি মন্ত্রগুপ্তিরূপ রাজধর্ম্ম ভুলিয়া মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট নিজের লক্ষ্য ও সাধন ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

ধূর্ত্ত যবনসম্রাটের কর্ণে এ সমস্ত প্রবেশ করিল। তিনি কৌশলে সমস্ত রাজপুতগণকে নিজ অধীনতায় আনিতে লাগিলেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীয়ার, অধিক কি, চির-বন্ধু বুন্দীর অধিপতি পর্য্যন্ত একে একে সকলই আকবরের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—প্রতাপের নিজ সহোদর সাগরজি পর্য্যন্ত আকবরের পতাকা-মূলে গিয়া স্বজাতিদ্রোহিতার ধ্বজা উত্তোলন করিলেন, এবং

সেই জাতীয়বিশ্বাসহননের পুরস্কার-স্বরূপ চিতোর-নগরী ও তৎসংলগ্ন রাজোপাধি ও রাজ্যসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয় কিছুতেই টলিবার নহে। বিপদের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের হৃদয়ের দৃঢ়তা ও অবিচলিততা বাড়িতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে—ততদিন মিবারের লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'—তাঁহার সঙ্কল্প হইয়া উঠিল। প্রতাপ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনও করিয়াছিলেন। তিনি একাকী শতাব্দী-চতুর্থাংশকাল সমবেত মোগলসেনাসাগরের গতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কখন তিনি সমতলক্ষেত্রে পড়িয়া শত্রুসেনার করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজ্যের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি ভগবান বিশ্বাবসুর উদরসাৎ করিতেছেন—কখন বা গিরিশৃঙ্গ হইতে গিরিশৃঙ্গান্তরে ও গুহা হইতে গুহান্তরে পলায়ন করিয়া শত্রুগণের তীব্র অনুসরণ হইতে আপনাকে ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতেছেন। সেই ভীষণ সময়ে তিনি মিবারের ভবিষ্য গৌরবরবি যুবরাজ শিশু অমরসিংহকে এবং সুকুমারবপু রাজমহিষী ও রাজনন্দন ও রাজনন্দিনীগণকে বন্য ফল মূল খাওয়াইয়া বনের পশুগণের এবং তদপেক্ষাও দুর্দ্দান্ততর পার্ব্বতীয় জাতিগণের মধ্যে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বাপ্পারাওএর বংশধরগণ—কোন মানুষের নিকট মস্তক অবনত করিবে'—এ চিন্তা তাঁহার অসহনীয়। এই জন্য তিনি অগণ্য-নরপতি-কিরীট-ভূষিত-চরণ দিল্লীশ্বর আকবরের আহ্বান বার বার প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। আকবর তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার জন্য অনেক অনুনয় করিয়া কতবার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ প্রতিবারই ঘৃণার সহিত সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

এই পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া প্রতাপ যে সকল অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ—যে সকল অতিমানুষ অবদান-পরম্পরার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, মিবারের প্রত্যেক গুহা তাহার স্বাক্ষ্য দান করিতেছে। আত্মোৎসর্গের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতি বিরল। প্রতাপের দেবোচিত আত্মোৎসর্গের অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী স্বজাতিপ্রেমিক রাজপুতমাত্রেরই হৃদয়ে রুধিরাক্ষরে লিখিত আছে। বিজেত্রী যবন জাতির ইতিহাসও প্রতাপের সেই সকল গৌরবকাহিনীতে সুশোভিত রহিয়াছে। এই সময়ে প্রতাপ যে সকল কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—যেরূপ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে মিবার ভূমি উজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন—তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে—তাঁহাকে উপন্যাসের নায়ক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আজও মিবারের প্রত্যেক গৃহে প্রতাপের যশোগান গীত হইয়া থাকে। আজও প্রতাপের বংশধরগণ প্রতিদিন প্রতাপের নামকীর্ত্তন করিয়া গলদশ্রু হইয়া থাকেন।

যদিও রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্যের অধিপতিগণের ও সামন্তবর্গের অনেকেই ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদার আকর্ষণ পরিহার করিতে সক্ষম হন নাই, তথাপি মিবারের সামন্তবর্গ প্রতাপের আত্মোৎসর্গের মোহিনীশক্তিবলে পার্থিব সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রতাপের সঙ্গে স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য আত্মবলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ছিলেন। জয়মল্লের পুত্রগণ, পুত্তের বংশধরগণ, এবং সালুম্বা ও চন্দার অধিপতিগণের নাম ইতিহাসে প্রতাপের নামের পার্শ্বে অনন্তকালের জন্য সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ও রাজভক্তির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে মিবারভূমি উদ্দীপিত করিবার জন্য—একে একে আত্মরুধিরে জননী ভারতভূমির বক্ষঃদেশ অভিষিঞ্চিত করিতে লাগিলেন। আত্মত্যাগের এমনই শক্তি যে কয়েক জন

সামন্ত প্রতাপের দুরবস্থা দেখিয়া গলিতহৃদয় হইয়া তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিবার জন্যই তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে দালওয়ারার সামন্তই প্রধান। অবিচলিত রাজ-ভক্তি নিবন্ধন তিনি প্রতাপের দক্ষিণবাহুস্বরূপ হইলেন।

বস্ত্রালঙ্কারবিবর্জ্জিতা বিধবারমণীর ন্যায় সর্ব্বসৌন্দর্য্য-বিচ্যুতা যবনদলিতা চিতোরনগরীর দৃশ্য প্রতাপের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। পিতৃরাজধানী অমরাবতীসদৃশী সেই চিতোরনগরীকে যতদিন তিনি পূর্ব্বাবস্থায় না আনিতে পারিবেন, ততদিন প্রতাপ আপনাকে ও আপনার বংশধর-গণকে সর্ব্বসুখে স্বেচ্ছাবঞ্চিত করিলেন। যতদিন না সেই চিতোর নগরীকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার পরিহার করিলেন। সৌবর্ণ ও রৌপ্য থাল, বাটী এবং গেলা-সের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্র ও পর্ণপুট ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কুশাসন ও কুশশয্যা স্বর্ণাসন ও দুগ্ধফেণনিভ শয্যার স্থান অধিকার করিল। কেশশ্মশ্রু ও নখাদিতে তাঁহাদের দেহের জ্যোতিঃ অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর আদেশ হইল যে যতদিন চিতোরের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার না হইবে, ততদিন অভিযানসময়ে মিবারের রণবাদ্য (নকড়া) আর পূর্ব্বের মত সম্মুখে অভিবাদিত হইবে না। এই সকল আদেশ আজও প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অভিযানসময়ে মিবারের নকড়া আজও সৈন্যগণের পশ্চাতে বাজিয়া থাকে। আজও প্রতাপের বংশধরগণ মিবারের অবনতিদ্যোতিক কেশ শ্মশ্রুনখাদি ধারণ করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহারা আহার ও শয়ন বিষয়ে সে কঠোরতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা সৌবর্ণ ও রৌপ্য পত্রের সহিত বৃক্ষপত্র মিশা-ইয়া ভক্ষণ করিয়া এবং দুগ্ধফেণনিভ শয্যার নিম্নে কুশাবলী

সন্ন্যস্ত করিয়া প্রতাপের গৌরব ও মিবারের অধঃপতনের স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন।

প্রতাপ খেদ করিয়া সর্ব্বদা বলিতেন 'যদি মহাপ্রতাপ-রাণা সঙ্গ ও প্রতাপের অভ্যন্তরে উদয়সিংহ আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে আজ তুর্কেরা রাজস্থানের বিধি-নিয়ন্তা হইত না।' বস্তুতঃ হিন্দুসমাজ পূর্ব্বশতাব্দীর মধ্যে এত পুষ্টাবয়ব হইয়া পড়িয়াছিল, যমুনা হইতে গঙ্গাপর্য্যন্ত প্রদেশ সকল ধীরে ধীরে এরূপ উন্নত ও উপচিতবল হইয়াছিল, এবং আম্বার ও মেওয়ার এরূপ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যে উপযুক্ত নেতৃ-পরিচালিত হইলে এই সমবেত হিন্দুশক্তির নিকট যাবনীশক্তি কয় দিন টিকিতে পারিত? একাকী মেওয়ারই সম্রাট সের সাহের গতি রোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এদিকে চম্বল নদীর উভয়তীর বর্ত্তী সামন্তবর্গও ক্রমে প্রবল-প্রতাপ হইয়া উঠিলেন। এই সময় মহম্মদীয়গণের হস্ত হইতে ভারতের শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য কেবল একজন অসাধারণ প্রতিভা-শালী রাজার প্রয়োজন হইয়াছিল। রাণাসঙ্গে সে অভাবও দূরীকৃত হইয়া ছিল। স্বতঃপ্রণোদিত অধীনতা আকর্ষণ করার শক্তি তাঁহাতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে ছিল। হিমালয় হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দু রাজা বংশমর্য্যাদায় ও চরিত্রগৌরবে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত। সুতরাং সকলেই এক বাক্যে তাঁহার অধীনতা স্বীকারে প্রস্তুত। এই সকল রাজ্যের অধিকাংশই প্রায় যবনপদদলিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই সকল রাজ্যের উদ্ধারের জন্য তদধিপতিগণের রাণা সঙ্গের পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়ার গুরুতর প্রণোদক কারণ ছিল। এই সমবেত মহতী হিন্দুশক্তি লইয়া রাণা সঙ্গ যবনতেজকে কিছুকালের জন্য নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি প্রতাপ রাণা সঙ্গের পরই মিবারের সিংহা-

সনে অধিরূঢ় হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর চিতোরের ধ্বংস দেখিতে হইত না; আকবর কর্ত্তৃক রাজপুতানার স্বাধীনতা অপহৃত হইত না! তাহা হইলে হয় ত ভারতের ইতিহাস আজ অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? বিলাসজীবন ক্ষত্রিয়াপসদ উদয়সিংহ রাণা সঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মিবারের গৌরবরবি চিতোরকে যবনরাহুগ্রাসে পাতিত করিলেন, এবং ঐশ্বর্য্য সম্পদ সমস্তই হারাইলেন। আর আর্য্য স্বাধীনতার স্তম্ভীভূত রাজপুতবীরমণ্ডলীও বীরনারীগণ সেই নরমেধযজ্ঞে বলি পড়িলেন। হায়! কি কুক্ষণেই রাণা উদয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন! কি কুক্ষণেই আকবরের ন্যায় অসাধারণপ্রতিভাশালী নরপতি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন!

প্রতাপ কতিপয় বিচক্ষণ ও বহুদর্শী সামন্ত লইয়া মিবারের শাসনপ্রণালীকে নূতন আকার প্রদান করিলেন। ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সেই সঙ্কটকালের নিজ স্বল্পীভূত আয়ের উপযোগী করিলেন। নূতন নূতন সামন্তকে নূতন নূতন জায়গীর প্রদত্ত হইল, এবং তদ্বিনিময়ে যে যে রাজকার্য্য করিতে হইবে—তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। বর্ত্তমান রাজধানী কমলমীর ও গোগুণ্ডা প্রভৃতি গিরিদুর্গসকল দৃঢ়ীকৃত ও সুসংরক্ষিত হইল। প্রতাপ দেখিলেন যে সমতলক্ষেত্রে তিনি যবনসেনার সহিত সম্মুখসংগ্রামে পরাস্ত হইবেন। এই জন্য তিনি পার্ব্বত্যপ্রদেশে রণস্রোত লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পাছে যবনসেনা আসিয়া সমতলবাসী অরক্ষিত প্রজাবৃন্দের উপর উৎপীড়ন করে, এই জন্য তিনি সমস্ত প্রজাকে অধিত্যকাপ্রদেশে গিয়া বসতি করিতে আদেশ করিলেন। পাছে তাঁহার আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত না হয়, এই জন্য তিনি আদেশ লঙ্ঘনের জন্য প্রাণদণ্ড

ব্যবস্থা করিলেন। এই কঠিন দণ্ডের ভয়ে সকলেই পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিল। এই সুদীর্ঘ সংঘর্ষকালে বুনাস্ ও বেরিস্ প্রবাহিত মিবারের সমস্ত উর্ব্বর ও সমতলক্ষেত্র একেবারে নিষ্প্রদীপ হইয়া পড়িয়াছিল। আর পশ্চিমে আরাবলী গিরিমালা ও পূর্ব্বে উপত্যকা প্রদেশ—ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থলে একটী বাতী জ্বালিতে দেখা যায় নাই।

প্রতাপ অতি কঠোর শাসন দ্বারা প্রজাবৃন্দকে তাঁহার এই কঠোর রাজনীতির অধীনতায় আনিয়াছিলেন। তিনি কতিপয়মাত্র অশ্বারোহী-সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে স্বয়ং সেই সকল প্রদেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেন। যদি কেহ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত, তিনি স্বহস্তে তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিতেন। তাঁহার সেই কঠোর শাসনে শস্যশালিনী ও ধনজনপূর্ণা মিবারভূমিতে সতত মরুভূমির নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তরঙ্গায়িত শ্যামল শস্যরাজির পরিবর্ত্তে তথায় তৃণরাজি বিরাজিত হইল। সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত রাজপথ সকল কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়িল। যেখানে প্রজাবৃন্দের আবাস ছিল, সেখানে হিংস্র জন্তু সকল আসিয়া বসতি করিতে লাগিল। এই অনন্ত ধ্বংসের মধ্যে—বুনাস নদীর তীরে আন্‌তলার মাঠে একদিন এক সাহসী মেষপাল মেষদল চরাইতেছিল। দৈবগত্যা অশ্ববেষ্টিত ও অশ্বারূঢ় প্রতাপ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই একটী প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর না পাইয়া প্রতাপ তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন. এবং ভয়প্রদর্শনার্থ সেই মৃত দেহ তথায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। প্রতাপের এই স্বদেশ-হিতৈষণা-প্রণোদিত কঠোরতায় রাজস্থানের উদ্যানভূত মিবারের সমতলভূমি ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইল। সুতরাং সেই অপূর্ব্ব রাজ্য-বিজেত্রী যবন-

জাতির কোন কাজেই আসিল না। বরং মিবারের মধ্য দিয়া সুরাট বন্দর হইতে দিল্লীতে এবং দিল্লী হইতে সুরাট বন্দরে যে সকল পণ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী চলিতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। কারণ প্রতাপের লোকেরা সেই সকল দ্রব্য লুঠ করিয়া পথে কাড়িয়া লইতে লাগিল। এইরূপে ইউরোপের সহিত বহির্বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় দিল্লীশ্বরের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল।

সুতরাং আকবর স্বয়ং প্রতাপের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আজমীরে আসিয়া সৈন্যাবাস সন্নিবেশিত করিলেন। এই নগরের বিখ্যাত দুর্গে অল্পদিন পূর্ব্বে যবনসেনা লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে। যে নগর একদিন আকবরের দ্বাবিংশ সুবার অন্যতম হইবে, যে নগরে একদিন সম্রাটের প্রতিনিধির প্রাসাদ বিরাজিত হইবে, সে নগর এখনও মাড়ওয়ারাধিপতি মল্লদেবের রাজধানী রহিয়াছে। যে মহাবল মল্লদেব একদিন সের সার বলদর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন, আজ সেই মহাপ্রাণ মল্লদেব ক্ষত্রিয়াধম অম্বরাধিপতি ভগবান দাসের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তন করিয়া আজ আকবরের পাদমূলে দণ্ডায়মান! সে অধিক দিন নয়—প্রতাপের সিংহাসনাধিরোহণের দুই বৎসরপরে মাত্র—মল্লদেব মায়ের্ত্তা ও যোধপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে যবনসেনার বিরুদ্ধে ঘোরতর রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী যবনাঙ্কশায়িনী হওয়ায়, নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য নিজপুত্র উদয়সিংহকে সম্রাটের নিকট অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আকবর যখন আজমীরাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময় অভিযান-পথে নাগোর নগরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। সেই উপলক্ষে মন্দোরের রায়বংশ রাজোপাধিতে ভূষিত হয় ও যুবরাজ উদয়সিংহ 'মুতা রাজা' এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই উদয়সিংহই সর্ব্বপ্রথমে তুর্ককে কন্যাদান করিয়া

মাড়ওয়াররাজবংশে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করেন। অসামান্য-রূপ-লাবণ্যবতী উদয়সিংহনন্দিনী যোধবাইএর * বিনিময়ে পিতা বিশলক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়ের ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। গোদগড়, উজ্জয়িনী, দেবলপুর, ও বুধনাগড়—এই চারিটী রাজ্য এই বিবাহ দ্বারা মাড়ওয়ার রাজ্যের সহিত সংলগ্ন হইল। এইরূপে মাড়ওয়ারের আয় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। অম্বর ও মাড়ওয়ারের প্রবলতর দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে রাজস্থানের অধিকাংশ সামন্তবর্গ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিল। এই রাজপুত সামন্তবর্গ এখন হইতে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভীভূত হইয়া দাঁড়াইল।

এই সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া প্রতাপের পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ তদ্বিরুদ্ধ-পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ আত্মাবনতিজ্ঞানে ও প্রতাপের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাবে এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, যে প্রতাপের উচ্ছেদসাধনে তাহারা প্রাণপণ করিয়াছিল। প্রতাপের মহাপ্রাণতা—প্রতাপের স্বদেশানুরাগ—ও প্রতাপের আত্মোৎসর্গের অনুকরণে অসমর্থ হইয়া—সেই ক্ষত্রিয়াপসদেরা স্বজাতির কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ—জাতীয় স্বাধীনতার একমাত্র অবলম্বনীভূত এই মহাপুরুষের ধ্বংসবিধানে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হইল! হায়! ভারতের ভাগ্যদোষে জয়চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সংখ্যাতীত জাতীয়বিশ্বাসহন্তৃগণ কর্ত্তৃক ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন বিজেতৃ-হস্তে সমর্পিত হইতেছে! কে জানে কোন্ পাপে আমরা বিদেশীয়-চরণে আত্মবিক্রীত হইয়া থাকি! ভারতের সমবেত শক্তির নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারে, পৃথি-

---

* জাহাঙ্গীরের জননী যোধবাইএর প্রকাণ্ড ও রমণীয় সমাধি-মন্দির আগ্রার নিকটবর্ত্তী সেকন্দ্রাতে আকবরের সমাধির পার্শ্বে আজও বিদ্যমান আছে।

বীতে আজও এমন শক্তি আবির্ভূত হয় নাই! তথাপি কেন আমরা আজ পথের ভিখারী? কোন্ পাপে আমরা আজ বিজেতৃচরণদলিত সর্ব্বমানবিবর্জ্জিত দাসাধিদাস ঘৃণিত জাতি? এ প্রশ্নের একই মীমাংসা। আমরা কর্ম্মফলে কুক্কুর জাতির ন্যায় স্বজাতিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছি। এত যে অবমানিত হইতেছি, এত যে পাদুকাঘাত সহ্য করিতেছি, তথাপি আজও পরস্পরকে ভাল বাসিতে শিখিলাম না—আজও প্রেমভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারিলাম না! হা বিধি! জানি না অদৃষ্টে আরও কি লিখিয়াছ?*

এরূপ মহতী বিসম্বাদিনী শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াও প্রতাপ দলিত ফণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভয় কাহাকে বলে প্রতাপ তাহা জানিতেন না। বুন্দীর অধিপতি ভিন্ন রাজস্থানের আর সমস্ত ক্ষত্রিয়ই যবন-সংসৃষ্ট হইয়া পড়ায় তিনি তাঁহাদিগের সহিত সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। দিল্লী, পত্তন, মারওয়ার, ও ধারের—এই কয়েকটী দুঃস্থ প্রাচীনবংশকে তিনি নিজ রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর অধিবাসির তালিকাভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাদিগের সহিতই আদান প্রদান আরম্ভ, করিলেন। প্রতাপ ও তদীয় বংশধরগণের পক্ষে ইহা অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে যে তাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপর্য্যন্ত ও শুদ্ধ তাঁহাদিগের সঙ্গে কেন, তৎসংসৃষ্ট মাড়ওয়ার ও অম্বর রাজবংশের সহিত কোন প্রকারে বৈবাহিক বা সামাজিক সংস্রবে সংশ্লিষ্ট হন নাই। উক্ত বংশদ্বয়ের তিলকস্বরূপ বকেট সিংহ ও জয়সিংহের স্বহস্তলিখিত পত্র দ্বারাই ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে। যখন তাঁহারা রাজসম্মানে ও ধনসম্পত্তিতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের প্রাণভূত হইয়াছিলেন, সেই ঐশ্বর্য্যের ও পদমর্য্যাদার সময়েও তাঁহাদিগকে সমাজে উঠিবার জন্য মিবাররাজবংশের নিকট

দীনভাবে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিগতকল্মষ হইয়া সেই পবিত্র মিবারবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যবনসম্রাট্‌গণকে কন্যা প্রদানের যে প্রথা তাঁহাদিগের মধ্যে এক শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, সেই প্রথা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল; প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল; এবং মিবাররাজনন্দিনীর গর্ভজাত কুমার থাকিতে আর কাহারও রাজসিংহাসনে অধিকার থাকিবেনা, এই নিয়মে আবদ্ধ হইতে হইল; তবে তাঁহারা মিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবার অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। মোগলসাম্রাজ্য তৎকালে পতনোন্মুখ হইয়াছিল, সুতরাং উক্ত রাজন্যবর্গকে এ সকল নিয়ম আর ভঙ্গ করিতে হয় নাই। সুতরাং এতদিনে দারিদ্র্য ধর্ম্ম বা আত্মত্যাগ পার্থিব বিষয়লোভের উপর জয় লাভ করিল!

যাবনিক সংস্রবের উপর প্রতাপের বদ্ধমূল বিদ্বেষের একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ এই ঘটনাই প্রতাপের যাবদীয় কষ্টের মূল বলিতে হইবে। যবনগণের সহিত ব্যবহিত বা অব্যবহিত সম্বন্ধে মিবাররাজকুল যাহাতে দূষিত না হয়, তজ্জন্য প্রতাপ যবন-সংস্রব-দুষ্ট মাড়ওয়ার প্রভৃতি রাজবংশের সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। অম্বরের রাজসিংহাসনে যত রাজা অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা মানসিংহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতেই অম্বর রাজ্যের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। বাবর রাজপুতবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজের সিংহাসন সুদৃঢ় করার যে উদার রাজনীতি অবতারিত করেন, অম্বরবংশই তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে কার্য্যে পরিণত হইতে দেন। কারণ অম্বর-রাজ ভগবান্ দাসই রাজপুতদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে যবনকে কন্যা দান করেন। মোগলসম্রাট বাবর-

নন্দন হুমায়ুন্ তাঁহার জামাতা এবং মোগল-কুল-গৌরব আক্বর তাঁহার দৌহিত্র। সুতরাং রাজা মানসিংহ সম্বন্ধে আক্বরের অতি ঘনিষ্ঠ। এইজন্যই তাঁহাদের মধ্যে সহজেই অতি প্রগাঢ় সখ্যভাব সংস্থাপিত হইল। মানসিংহের লোকাতীত সাহস ও অসাধারণ রণবিষয়িণী প্রতিভা এই প্রাকৃতিক সম্বন্ধের সহিত মিলিত হইয়া যেন সোণায় সোহাগা-স্বরূপ হইয়াছিল। আক্বরের সেনাপতিগণের মধ্যে মান-সিংহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই এক মানসিংহের নিকটই আক্বর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেকের জন্য ঋণী। চিরহিমানীসমাচ্ছাদিত ককেসস্ হইতে সুবর্ণমণ্ডিত খার্সো-নীজ্ পর্য্যন্ত, এবং এক দিকে কাবুল ও আলেক্জাণ্ডারের প্যারোপামিসান্, এবং অন্যদিকে ভারত-মহাসাগরের উপ-কূলবর্ত্তী আরাকান্ এই সমস্ত রাজ্যই একাকী মানসিংহ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন *। আক্বর মানব-হৃদয় এরূপ বুঝিতেন যে অদ্ভুত কৌশলে তিনি বংশ-মর্য্যাদাভিমানী বীরদর্পী রাজপুতজাতিকে আপনার ক্রীড়নক-

* রাজা মানসিংহ হিন্দুসংস্কারবশতঃ সিন্ধুনদী পার হইয়া যাইতে অস্বীকৃত হন। তিনি লিখিয়া পাঠান যে হিন্দুরপক্ষে তাহার উদিকে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা আছে। এই প্রতিবন্ধকতাকে তিনি আটক নামে অভিহিত করেন। আক্বর তদুত্তরে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিয়া পাঠান।—

সব হীন্ ভূম্ গোপালকা।
জিস মি আটক্ কহা।
জিস্কা মন্ মে আটক হায়।
সো ই আটক্ হোয়্গা।

মানসিংহ এই কবিতার মর্ম্ম বুঝিলেন, সুতরাং তিনি আর আপত্তি করিলেন না।

স্বরূপ করিয়া তুলিলেন। যে বীর রাজপুতজাতিকে পাশব বলে আজও কেহ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, আক্‌বরের মোহমন্ত্রবলে সেই রাজপুতজাতি এখন তাঁহার পদানত দাস স্বরূপ হইয়া পড়িল। বিধির কি বিড়ম্বনা! কুহকীর মন্ত্রের কি অপূর্ব্ব শক্তি!

রাজা মানসিংহ দিল্লীর সম্রাটের নিকট যতই আদরণীয় হউন্ না কেন, স্বজাতিপ্রেমিক ও স্বদেশানুরাগী প্রতাপের চক্ষে তিনি স্খলিত-ধর্ম্ম যবন-সংস্রব-দুষ্ট দাস বই আর কিছুই নহেন। প্রতাপ তাঁহার নিকট দেবতা কিন্তু তিনি প্রতাপের নিকট দানব। উভয়ের মনেরভাব ব্যক্ত হইতেও অধিক বিলম্ব হইল না। রাজা মানসিংহ সোলাপুর জয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিয়া আসিবার কালে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কমলমীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতাপ উদয়-সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সেই হ্রদের তীরে মৃত্তিকা-স্তূপের উপর অম্বরাধিপতির জন্য আহার সামগ্রী সকল বিস্তারিত হইল। সমস্ত আয়োজন হইলে অম্বররাজ প্রতাপকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রতাপ কুমার অমরসিংহকে অতিথি সৎকারের জন্য তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন। অমরসিংহ আসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন 'মহারাজ! পিতৃদেবের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি আসিতে পারিবেন না, এই জন্য আমায় প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছেন; আর তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিবেন না, আহার আরম্ভ করুন্।' রাজা মানসিংহ সসম্মান অথচ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—'যুবরাজ! আমি রাণার শিরঃপীড়ার কারণ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তিনি যদি আমার পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে স্বীকৃত না হন, তবে আর কে হইবে?' তখন প্রতাপ দেখিলেন আর হৃদয়-ভাব গোপন করা

অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তিনি তখন অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে—'যে রাজপুত যবনকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন ও সম্ভবতঃ তাহার সহিত একত্র আহার করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তিনি একত্র আহার করিতে পারেন না।' রাজা মানসিংহের তখন চৈতন্য হইল। তিনি নিবুর্দ্ধিতা বশতঃ অকারণে এই অপমান আহ্বান করিলেন। যদি প্রতাপ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এরূপ অপমান করিতেন, তাহা হইলে আমরা প্রতাপকে দোষী করিতাম। কিন্তু তিনি স্বয়মাগত হইয়া প্রতাপকে আপনার সহিত আহার করিতে অনুরোধ করিয়া অতি অদূরদর্শীর কার্য্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক রাজা মান হতমান হইয়া আহার সামগ্রী স্পর্শ মাত্র করিয়া সহসা উঠিয়া পড়িলেন, তিনি কেবল শতান্নমাত্র অন্নদেবকে দিয়াছিলেন, কিন্তু একটী অন্নও উদরে দেন নাই। উঠিয়াই তিনি এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন—এমন সময় প্রতাপ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতাপকে দেখিবামাত্র তাঁহার নয়ন-যুগল দিয়া যেন অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধভরে তাঁহাকে বলিলেন—'প্রতাপ! আমি যদি তোমার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি রাজা মানই নহি'। প্রতাপও তাঁহাকে বীরোচিত উত্তর প্রদান করিলেন—বলিলেন যে 'তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন'। যে স্থানে মানসিংহের জন্য আহার-সামগ্রী বিস্তারিত করা হইয়াছিল, সে মৃত্তিকা স্তূপকে অপবিত্রজ্ঞানে ভগ্ন করা হইল, এবং তথায় গঙ্গাজল প্রক্ষেপ করা হইল। যে সকল সামন্তেরা সেই আহারস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে অপবিত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং বহিঃশুদ্ধির নিমিত্ত স্নাত হইলেন ও বসন পরিত্যাগ করিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার

আনুপূর্ব্বিক আকবরের নিকট নিবেদিত হইল। তিনি এ অপমান নিজের অপমান বলিয়া মানিয়া লইলেন, এবং ভীত হইলেন যে তিনি এযাবৎকাল যে সকল হিন্দুকুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিবার এতদুর চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, সে সমস্ত চেষ্টা বুঝি বিফল হইয়া যায়। এই জন্য তিনি সেই সকল কুসংস্কার স্থায়ীকৃতকরণের মূলীভুত মিবাররাজবংশের ধ্বংসবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আকবরের আদেশে সমস্ত যবনশক্তি অচিরাৎ হলদিঘাটরণক্ষেত্রে যুবরাজ সেলিমের অধিনায়কত্বে ও মানসিংহের তত্ত্বাবধায়কত্বে কেন্দ্রীকৃত হইল। যেন বিধাতা প্রতাপের নাম ভারতবক্ষে রুধিরাক্ষরে অঙ্কিত করিবার জন্যই—যেন প্রতাপের জন্য ভারতবক্ষে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিবার জন্য—এই হল্‌দিঘাট মহাসমরের অবতারণা করিলেন। যতদিন সীসোদিয়াবংশ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবে, যতদিন একটীমাত্রও কবি মিবাররাজ্যে লেখনী চালনা করিবেন, ততদিন হল্‌দিঘাট মিবারবাসীর অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইবে না! হল্‌দিঘাট—ভারতের থার্ম্মোপিলি—ভারতবাসীর পক্ষে মহাতীর্থস্থল। প্রত্যেক স্বজাতিপ্রেমিক ও স্বদেশানুরাগী ভারতবাসীর সেই মহাতীর্থ জীবনে অন্ততঃ একবার দেখা উচিত। একবার সেই পবিত্র রুধির-প্লাবিত রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিত-দেহ হইয়া এই ক্ষীণ ধমনীতে রক্তসঞ্চার করা উচিত। আর সেই তীর্থস্থলে গিয়া মহাপ্রাণ প্রতাপের পূজা করা উচিত। যতদিন এই মহাপ্রাণপূজা ভারতে অবতারিত না হইতেছে, ততদিন ভারতের আর কোন আশা নাই!

হলদিঘাটের মহাসমর।

পাঠক! চল একবার কল্পনাবলে সেই বীরভূমি রাজস্থান—সেই পুণ্যপুঞ্জ মহাসাগর রাজপুতানা—সেই অগণ্য-

কীর্ত্তি-মহাক্ষেত্র পবিত্র ক্ষত্রভূমি পর্য্যটন করিয়াআসি। চল! একবার সেই পবিত্র তীর্থস্থল হলদিঘাটে—সেই ভারতীয় থার্ম্মোপল্লিতে—রাজসন্ন্যাসী ক্ষত্রিয়কুল-গৌরব মহাপ্রাণ রাণা প্রতাপ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ দ্বাবিংশসহস্রমাত্র রাজপুতসৈন্য লইয়া বীরচূড়ামণি ক্ষত্রকুলাঙ্গার মানসিংহ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত আকবরতনয় সেলিম্ ও তদীয় অগণ্য সৈন্য-সাগরের সম্মুখীন হইয়া কেমনে অতিমানুষবীরত্বের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আসি; চল পাঠক! কল্পনাদেবীর সাহায্যে সেই মহাদিনে,—যে দিনে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত বীর স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে অনন্তকালের জন্য হিন্দুজাতিকে ইহজীবনের কর্ত্তব্য শিখাইবার জন্য—সমরে অদ্ভুত শৌর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক একে একে নিজ নিজ রুধিরে জন্মভূমিকে উক্ষিত করিতেছেন—চল! সেই মহাদিনে (১৬৩২শক ৭ই শ্রাবণ—১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ ৭ই শ্রাবণ) চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা-পরিশোভিত সঙ্কীর্ণ চতুষ্পথ-গম্য চত্বারিংশবর্গ ক্রোশ পরিমিত সেই হলদিঘাট মহাক্ষেত্র বা মহাশ্মশান পরিদর্শন করিয়া আসি। চল! যেখানে রাণা প্রতাপ স্বজাতির জন্য ও স্বদেশের জন্য অতিমানুষবীরত্বের সহিত আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, একবার সেই স্থলে গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দিব্যচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসি। ঐ দেখ! প্রতাপ কাপুরুষ কুলাঙ্গার মানসিংহের স্বজাতিদ্রোহিতার সমুচিত শাস্তিবিধানের নিমিত্ত নির্ভীকচিত্তে মোগল সৈন্য-ব্যূহ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। মত্তমাতঙ্গ যেমন বনস্পতিগণকে উন্মূলিত করিয়া চলিয়া যায়, ঐ দেখ প্রতাপও সেইরূপ গতিরোধকারী শত্রুসৈন্যগণকে ধরাশায়ী করিতে করিতে একাকী ঐ মোগলসৈন্যবন আলোড়ন করিয়া

বেড়াইতেছেন, কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেছে না। ঐ দেখ! কাপুরুষ মানসিংহ প্রাণভয়ে এক-স্থান হইতে অন্যস্থানে সেনাসাগরের অভ্যন্তরে লুকাইয়া বেড়াইতেছে। রণোন্মত্ত প্রতাপের শাণিত অসির সম্মুখীন হইতে কিছুতেই সাহসী হইতেছে না। ঐ দেখ! ক্রোধোন্মত্ত প্রতাপ মানসিংহের অনুসন্ধানে বিফলমনোরথ হইয়া যুবরাজ সেলিমের অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। ঐ দেখ! তাঁহার প্রচণ্ড অসি একে একে সেলিমের সমস্ত দেহ-রক্ষকগণকে ধরাশায়ী করিল—শেষে সেলিমের মাহুতও নিহত হইল। ঐ দেখ! সেলিমের মত্তমাতঙ্গ বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় আত্মরক্ষণে অসমর্থ সেলিমকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছে। যদি সেলিমের হাওদা কঞ্চুকপরিরক্ষিত না হইত, তাহা হইলে প্রতাপের চালিত বর্ষা নিশ্চয় তাঁহার দেহ ভেদ করিত। এইরূপে দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সেলিম্ দৈববলে আজ প্রতাপের উদ্যত বর্ষার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন। ঐ দেখ! মোগলেরা অসহায় প্রতাপকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া ঘিরিবার উপক্রম করিতেছে। প্রতাপ তথাপি রাজচ্ছত্র ও লোহিত পতাকা স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ! ঐ সুবর্ণসূর্য্যনিভ রাজচ্ছত্র লক্ষ্য করিয়া সমস্ত মোগল সৈন্য তাঁহারই অভিমুখে দৌড়িতেছে। ঐ দেখ! ঝলাধিপতি সামন্তপ্রবর মান্না প্রভুর আসন্ন বিপদ দেখিয়া নিজে স্বদলে তাঁহার রক্ষার্থ গমন করিতেছেন। ঐ দেখ! আত্মোৎসর্গ ও রাজভক্তির অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে রাখিবার জন্যই যেন তিনি প্রতাপের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া সেই রাজচ্ছত্র নিজ হস্তে লইলেন—এবং প্রভুকে সৈন্যব্যূহ হইতে অতিকষ্টে অপসারিত করিলেন। ঐ দেখ! সমস্ত মোগলসৈন্য এক্ষণে ছত্রলক্ষণে তাঁহাকেই প্রতাপ-ভ্রমে তাঁহারই উপর আসিয়া পড়িল। ঐ দেখ! তদীয়

সৈন্যগণ অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক অবশেষে অগণ্য মোগলসৈন্যে পরিবেষ্টিত ও অভিভূত হইয়া একে একে রণ-ক্ষেত্রের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। ঐ দেখ! একে একে প্রতাপের সেই দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুতের মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত ভারতজননীর গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে করিতে তদীয় অঙ্ক-শায়ী হইলেন! মাটীর দেহ মাটীতে মিশিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই দেহ-নিহিত শৌর্য্য-বীজ ও মহাপ্রাণ আত্মোৎসর্গের উপাদানসামগ্রী—অনন্ত কালের জন্য ভারতক্ষেত্রে পরিরক্ষিত হইল!

কই আমাদের প্রাণের প্রাণ—ভারতের জীবন প্রতাপ কোথায়? আর সেই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহাবল প্রভুপরায়ণ তদীয় নীলঅশ্ব—যে অশ্ব সম্মুখের পাদদ্বয় সেলিমের হস্তীর মস্তকে উত্তোলিত করিয়া প্রতাপকে হস্তীপকের সম্মুখীন করিয়াছিল—সেই বিশ্বস্ত অশ্ব প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া রণস্থল হইতে কোথায় পলায়ন করিল? ঐ দেখ! প্রতাপ একাকী রণস্থল হইতে পলায়ন করিতেছেন! ঐ দেখ! অনুসরণকারী যবনদিগের হস্ত হইতে প্রতাপকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্ববর এক উল্লম্ফে ঐ গিরি নির্ঝরিণী পার হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। আহা! প্রতাপ শত্রুনিপাতনকালে শত্রুগণ হইতে যে তিন বর্ষাঘাত, একগুলির আঘাত ও তিন অসি-প্রহার পাইয়াছিলেন, সূর্য্যা-লোকের প্রতিফলনে সেই সপ্তবীরলাঞ্ছনে তাঁহার দেহ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! প্রভুপরায়ণ অশ্ববর চৈতক যদিও নিজে আহত হইয়াছে—তথাপি পাছে শত্রুরা আসিয়া প্রভুকে ধরে, এই ভয়ে নিজের প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া—অথবা নিজের প্রাণের জন্য এক মুহূর্ত্তও না ভাবিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে! আজ যদি সমস্ত রাজপুতানা প্রতা-পের প্রতি এইরূপ প্রভুভক্তি দেখাইত—তাহাহইলে ভারতের

ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত! আহত চৈতকের প্রাণ-বায়ু ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। ঐ দেখ! চৈতকের গতি ক্রমশঃ মন্দা হইয়া আসায় অনুসরণকারীরা প্রতাপের অতিনিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। গিরিপ্রস্তর-খণ্ডের সহিত অশ্বখুরের সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরিত হইতেছে দেখিয়া প্রতাপ বুঝিলেন—অনুসরণকারীরা সমীপ-বর্ত্তী হইয়াছে। সহসা এক কর্ণবিদারী শব্দ পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া সবেগে প্রতাপের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল—'হো! নীলা ঘোড়ারা স্বোয়ার'—'ওহে! নীল ঘোটকের আরোহী।' এই শব্দে ঐ দেখ! প্রতাপের দৃষ্টি যেন রশ্মি-সংযত হইয়া সেই দিকে নীত হইল। প্রতাপ দেখিলেন—এক জন মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার দিকে ছুটিতেছেন—অচির-কাল-মধ্যে অশ্বারোহীও তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। প্রতাপ দেখিলেন তাঁহার চিরশত্রু প্রতিদ্বন্দ্বী তদীয় ভ্রাতা শক্ত আজ বহুদিনের পর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

আজ শক্ত জ্যেষ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু নহেন। শক্ত দূর হইতে দেখিয়াছিলেন যে প্রতাপ নীল অশ্বে আরোহণ করিয়া রণস্থল হইতে একাকী পলায়ন করিতেছেন, এবং যবনেরা তাঁহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। আজ শক্তের হৃদয় ভ্রাতার ভাবী বিপ-দের আশঙ্কায় বিগলিত হইল। আজ ভ্রাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাসে তিনি ভ্রাতৃঅনুসরণকারী যবনদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটি-লেন। তিনি প্রতাপকে ধরিবার জন্য ছুটিতেছেন মনে করিয়া মোগল সেনা তাঁহার গতিরোধ করিল না। কিন্তু শক্ত আজ স্বজাতিদ্রোহিতা ও জ্যেষ্ঠমর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন সেই অনুসরণকারী যবনসৈন্য-গণকে একে একে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। আজ বস্তুতঃই তিনি প্রতাপের প্রাণরক্ষা করিলেন। ঐ দেখ!

প্রতাপ আজ ভ্রাতার এই অপূর্ব্ব ভ্রাতৃপ্রেমে মুগ্ধ ও বিগলিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বাবতীর্ণ ভ্রাতাকে প্রাণ-ভরে আলিঙ্গন করিতেছেন। ঐ দেখ! দরবিগলিত আনন্দাশ্রুতে উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে!

আর ঐ দেখ! প্রভুপরায়ণ চৈতক প্রভুর অবতরণের পরই ধরাশায়ী হইয়াছে। প্রতাপ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জিন খুলিয়া দিতেছেন। কিন্তু চৈতকের আজ জীবনের কার্য্য পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রভুর জীবন রক্ষা হইল—এখন চৈতক এ পাপপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিল। ঐ দেখ! চৈতক চিরকালের জন্য নয়ন নিমীলিত করিল। ঐ দেখ! প্রতাপ অতি কষ্টে চৈতকের মৃত্যু-জনিত শোক সম্বরণ করিয়া ঐ স্থানেই চৈতকের দেহ সমাধি-নিহিত করিলেন—এবং সেই সমাধির উপর একটী মন্দির নির্ম্মিত করাইলেন। ঐ সমাধি-মন্দির আজও 'চৈতক কা চাবুত্রা' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহা জারোলের (Jarrole) অদূরে অবস্থিত।]

শক্ত ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিয়া অঙ্কারো-নামক নিজ অশ্ব ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং স্বহস্ত-নিহত খোরাসানী সেনাপতির অশ্বে আরোহণ করিয়া যুবরাজ সেলিমের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ দেখ! দুই ভাই বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া নক্ষত্রবেগে দুই দিকে ছুটিতেছেন!

চল আমরা প্রথমে ভ্রাতৃ-প্রাণ-দাতা শক্তের সঙ্গে গমন করি। ঐ শুন! শক্ত সেলিমের নিকট গিয়া কি বলিতেছেন—'প্রতাপ তাঁহার অনুসরণকারী সৈন্যগণকে নিহত করিয়াছেন এবং তদীয় অসি আমারও উপর উত্তোলিত করিয়াছিলেন—কিন্তু আমি উল্লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করায় সেই উত্তোলিত অসি আমার অশ্বোপরি পতিত হইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করে। আমি নিহত খোরাসান-সৈনানায়কের অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া আসি-

য়াছি, এক্ষণে প্রভুর যাহা আদেশ। মুখ-ভঙ্গিতে বোধ হই-তেছে সেলিম্ শক্তের একথা বিশ্বাস করিলেন না। পাঠক! শুনিলে সেলিম্ কি বলিলেন।—'শক্ত! তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না—তুমি সত্য কথা বল—আমি তোমায় অভয় দিতেছি।" শক্ত আর সত্যগোপন করা অনাবশ্যক মনে করিলেন। ঐ শুন! শক্ত গুরুগম্ভীরস্বরে কি উত্তর দিতে-ছেন—'আমাদের পিতৃ-পৈতামহিক রাজ্যের রক্ষার ভার আমার ভ্রাতার মস্তকে রহিয়াছে। সুতরাং ভ্রাতাকে রণস্থল হইতে অসহায় পলায়ন করিতে দেখিয়া আমি অনুসরণকারী যবনসেনার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।' সেলিম্ তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন, কিন্তু শক্তকে বিদায় দিলেন। শক্তের মনে এখন ভ্রাতৃপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ জ্বলন্তভাবে বিদ্যমান ছিল; সুতরাং তিনি ইহাতে পরম প্রীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। শক্ত সেলিমের নিকট বিদায় হইয়া এখন প্রতাপের অভিমুখে ধাবিত হই-লেন। চল! আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাই। শক্ত যাইবার সময় অদ্ভুত বীরত্বের সহিত ভ্রাতৃ হস্তচ্যুত ভিন্‌স্রোর নগর পুনরাধিকৃত করিয়া ভ্রাতৃ-চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঐ দেখ! প্রতাপ চরণে লুণ্ঠিত-শির শক্তকে তুলিয়া আলি-ঙ্গন করিলেন, এবং পুনরাধিকৃত ভিন্‌স্রোরের অধিপতিত্ব পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য তাঁহারই হস্তে সম-র্পণ করিলেন। প্রতাপ এখন উদয়পুরে ছিলেন। তাঁহার জননী বাইজিরাজও এতদিন উদয়পুরেই অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শক্তের প্রতি অধিকতর স্নেহ বশতঃ তিনি আজ হইতে শক্ত-নগরী ভিন্‌স্রোরে গিয়া পুত্রের গৃহ-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। আজ হইতে শক্তবংশ শক্ত-ওয়াৎবংশ নামে প্রখ্যাত হইল—এবং শক্ত 'খোরাসানী মুল্-তানীকা আগ্‌গল' খোরাসান্ ও মুল্‌তানের গতি-রোধক উপা-

ধিতে ভূষিত হইলেন। এইরূপে শক্তবংশ প্রতিষ্ঠাতার অপূর্ব্ব ভ্রাতৃ-প্রেমের ও স্বদেশানুরাগের মহিমায় অনন্তকালের জন্য মিবারক্ষেত্রে পূত হইয়া রহিল। এইরূপে ভীষণ ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ স্বদেশানুরাগ ও ভ্রাতৃপ্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়া গেল।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলন হইল—এখন চল! আমরা ত্বরিত-গতিতে সেই মহাশ্মশান হল্‌দিঘাট রণক্ষেত্রে গমন করি। দেখিয়া আসি সেই মহাক্ষেত্রে কোন্ কোন্ মহারথী সমর-শায়ী হইয়াছেন। অহো! কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! ঐ দেখ! হলদিঘাট গিরিশঙ্কট দিয়া রুধির-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হই-তেছে। ঐ তরঙ্গিণী মিবারের উৎকৃষ্ট রক্ত বাহিয়া লইয়া মিবারের ক্ষেত্র সকলকে উর্ব্বরা করিতেছে। ঐ দেখ! পাঁচ শত মিবার-রাজবংশীয় বীরপুরুষ রণে নিহত হইয়া পড়িয়া আছেন। ঐ দেখ! গোয়ালিয়ার-রাজ রামসহায়, ও তদীয় পুত্র খান্দি রাও সার্দ্ধ ত্রিশত অনুযাত্রিকবর্গসহ সমরশায়ী হইয়া ধরাতলে পতিত আছেন। বাবর কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ইহাঁরা মিবারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিবাররাজ ইহাঁদিগকে নিজ ক্ষীণ রাজস্বের অংশ দিয়া আতিথ্য-ধর্ম্মের সম্মাননা রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ ইহাঁরা সেই উপকারের প্রতিশোধ দিবার জন্যই প্রতাপের জন্য হল্‌দিঘাট রণক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্গ করিলেন। আর ঐ দেখ! রাজভক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ ঝলাধিপতি মান্না সার্দ্ধ একশত সৈন্য-সামন্ত-সহ রণস্থল উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। আর ঐ যে অগণ্য শবশ্রেণী মাতৃক্রোড়ে শায়িত রহিয়াছে দেখিতেছ—উহার মধ্যে মিবারের প্রত্যেক গৃহস্বামী আপন আপন গৃহকে অনাথ করিয়া—বীরপ্রসবিনী ভারত-জননীকে বীরশূন্যা করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন! আহা! আজ মিবারভূমি নব বিধবাগণের আর্ত্তনাদে, পুত্রশোকাকুল

জননীগণের বক্ষতাড়নে ও পিতৃহীন বালক বালিকাগণের হৃদয়-বিদারি ক্রন্দনরোলে—সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে!!!

এক দিকে যেমন শোকের তামসী নিশি সমস্ত মিবারভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে তদ্বিপরীতে বিজয়-লক্ষ্মীর আনন-কিরণে সমস্ত মোগলসৈন্যাবাসে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ময়ী শোভা সমুদিত হইয়াছে। আমোদ প্রমোদ ও বিজয়োল্লাসে ঐ দেখ! মোগল সৈন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে রজনী মিবারের পক্ষে কালরজনী, সেই রজনীই আবার সেলিম্ ও তদীয় সৈন্যের পক্ষে যেন মহোৎসব-রজনী! শোকের পার্শ্বে উল্লাস, ধ্বংসের পার্শ্বে অভ্যুদয়, এবং শ্মশানের উপরে প্রমোদনৃত্য! হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? অথবা তোমার মহিমা কে বুঝে? নিশা অবসান হইল—মোগল-সৈন্যাবাসেও শান্তিরবি সমুদিত হইল। বিজয়দর্পে অন্ধ হইয়া সেলিম্ সৈন্যাবাস ভাঙ্গিয়া অভিনন্দন পাইবার জন্য পিতৃ-সমীপে চলিলেন। ঐ দেখ! তদীয় সেনা-তরঙ্গিণী দিল্লী-অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। যেন হল্‌দিঘাট গিরিসঙ্কট হইতে একটী নবনির্ঝরিণী নির্গত হইয়া দিল্লী-অভিমুখে যাইতেছে।

এই যে, দেখিতে দেখিতে বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে বুঝি মোগলেরা এ সময়ে আর গিরিগুহা-সঙ্কুল প্রদেশে আগমন করিল না। আহা! প্রতাপ কয়মাসের জন্য বিশ্রাম করিতে পাইলেন। কিন্তু বসন্তাগমে মোগ-লেরা আবার যে এই মিবারভূমি আক্রমণ করিল। আবার যে যবনেরা প্রতাপকে পরাজিত করিল*। ঐ দেখ! প্রতাপ রণস্থল হইতে পলাইয়া কমলমীর নগরে গিয়া আশ্রয় লইয়া

* এই যুদ্ধ ১৬৩৩ শকের ৩রা মাঘ সংঘটিত হয়। ১৬৩৩শক-১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

ছেন। কিন্তু মোগলেরা নিবৃত্ত হইবার নহে। ঐ দেখ! মোগল-সেনাপতি কোকবংশীয় সাবাজ খাঁ প্রতাপকে ঘিরিয়া ফেলিল! কিন্তু ঐ দেখ! প্রতাপ অতিমানুষবীরত্বের সহিত ক্রমাগত তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিতেছেন। দিনের পর দিন যাইতেছে—তথাপি প্রতাপ ক্লান্ত হইতেছেন না। মোগলের অধীনতা-স্বীকার প্রতাপের নিকট মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। তাই তিনি মৃত্যুকে প্রফুল্লচিত্তে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছেন—তথাপি মোগল-সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। মোগল-সেনাপতি বীরত্বে পরাস্ত হইয়া এক্ষণে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইতে প্রস্তুত হইলেন। নগরের একমাত্র বারিনিকেতন নোগম্ কূপে দুর্গন্ধময় পতঙ্গপুঞ্জ প্রক্ষিপ্ত হইল। একমাত্র পানীয় দূষিত হওয়ায় প্রতাপকে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। আবুনগরাধিপতি দেওরা সামন্ত আক্বরের অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকা দ্বারা এই নারকীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রতাপ পলাইয়া মিবারের দক্ষিণপশ্চিম চপান নামক অধিত্যকাপ্রদেশে অবস্থিত চাওন্দনামক নগরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই অধিত্যকাপ্রদেশে সার্দ্ধ তিনশত গ্রাম ও নগরী আছে। সকলগুলিতেই ভিল্‌দিগের অধিবাস। ঐ দেখ ভিল-অধিনায়ক সনিগুরা সামন্তপ্রবর প্রগাঢ় ভক্তিভাবে প্রতাপকে নগর-মধ্যে গ্রহণ করিলেন, এবং সেই নগর প্রাণপণে রক্ষা করিতে গিয়া মোগলদিগের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। অতিথিসৎকার ব্রতের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদ্যাপনা আর কি হইতে পারে? এই যুদ্ধে মিবারের প্রধান কবিও নিহত হন। প্রতাপের বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের গীতি গাইতে গাইতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। প্রতাপের গুণ-গায়ী কবির মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু সে কবিত্বের বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। রাজা প্রজা, হিন্দু মুসলমান এক-

বাক্যে ও সমস্বরে প্রতাপের যশোগীতি গাইতে লাগিলেন। সেই গীতিতে সমস্ত রাজপুতানা উদ্দীপিত হইল।

প্রতাপের জীবনের শেষাঙ্ক।

চল পাঠক! আমরাও প্রতাপ-জীবনের শেষাঙ্ক অনুসরণ করি। কমলমীরের পতনের পর ধর্ম্মেতী ও গেহগুণ্ড দুর্গ রাজা মান কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। মহাবেৎ খাঁ উদয়পুর অধিকার করিলেন। খাঁ ফেরিদ চম্পন প্রদেশ আক্রমণ করিয়া দক্ষিণ হইতে চোয়ান্দ নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অগুণপানোরার অধিবাসিবৃন্দ যে পথ দিয়া প্রতাপকে খাদ্যসামগ্রী সংযোজনা করিতেছিল—একজন মোগল-বংশীয় রাজকুমার সে পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ, ও গিরিগুহা হইতে গিরিগুহান্তরে অনুসৃত হইয়াও প্রতাপ দৈববলে ও ভিল প্রজাবৃন্দের অপূর্ব্ব রাজভক্তির সাহায্যে অভাবনীয়রূপে এক একটী করিয়া সমস্ত বিপদ্ কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুসরণকারীরা কোন মতেই তাঁহার সন্ধান পাইতে পারিল না। তিনি কোন অনির্দ্দিষ্ট গিরিগুহায় বিশ্রামসুখে নিমগ্ন আছেন—শত্রুরা এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যখন বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করে, প্রতাপ সেই সময় গৈরিক সঙ্কেত দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া অতর্কিত ও অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থিত শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে লাগিলেন। মোগলের ধৈর্য্য তাহাতেও নির্ব্বাপিত হইবার নহে। সেনাপতি ফেরিদ তথাপি প্রতাপকে জীবিত অবস্থায় ধৃত ও কারারুদ্ধ করিবার জন্য দিন রাত্রি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শয়নে স্বপনে তাঁহার কেবল এই একই মাত্র চিন্তা। কিন্তু ঐ দেখ! প্রতাপ এমনই কৌশলে তাঁহাকে এক সঙ্কীর্ণ গুহামধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন,

যে তাঁহার আর পলাইবার উপায় নাই। তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার রক্ষার্থ যেমন সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অমনই একে একে সকলেই বলি পড়িতেছে। মোগলসৈন্যেরা গৈরিক যুদ্ধপ্রণালীতে দীক্ষিত ছিল না। সুতরাং তাহারা ক্রমেই ভগ্ন-হৃদয় ও ভগ্নাশ হইয়া পড়িল। অদৃশ্য শত্রুর অনুসরণে তাহারা ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠিল। এদিকে বর্ষাগমে গিরিনদীসকল ক্রমেই স্ফীতাবয়ব হইতে লাগিল। গুহার জলাধার ধাতব বিষে পরিপূরিত হইয়া উঠিল, এবং প্রচণ্ড জলপ্রপাতসকল হইতে দূষিত বাষ্প সকল উদ্গীরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পীড়া ও মৃত্যু বিস্তার করিতে লাগিল। এত বিভীষিকার মধ্যে বেতনভুক্ সৈন্যেরা আর কয় দিন টেকিতে পারে? ঐ দেখ! যবন-সেনা দলে দলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতেছে! এইরূপে প্রকৃতিদেবী প্রসন্না হইয়া প্রতাপকে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম প্রদান করিলেন।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ও বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল. এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের দুঃখের ভার বাড়িতে লাগিল। ক্রমেই এক একটী করিয়া সমস্ত প্রদেশগুলি শত্রুহস্তগত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের আয়ও কমিতে লাগিল। প্রতাপ নিজের দুঃখ কষ্টকে তৃণবৎ বোধ করিতেছেন, কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের দুঃখে তিনি অভিভূত হইতেছেন। বিশেষতঃ পাছে তাহারা যবনদিগের হস্তে পতিত হয় এই ভয়ে তিনি আকুল হইতেছেন। যিনি পারিবারিক গৌরবের মর্ম্ম বুঝেন, তিনিই প্রতাপের অন্তরের বর্ত্তমান যাতনা বুঝিতে পারিবেন। যিনি রাজপুত রমণীকে মোগলসম্রাটের আদরিণী মহিষী করিতেও বিজাতীয় যাতনা অনুভব করেন, কোন্ প্রাণে তিনি সেই দেবের আরাধ্যা রাজপুতরমণীকে যবনবন্দিনী দেখিতে প্রস্তুত হইবেন? প্রতাপের আশঙ্কা যে অমূলক, তাহাও

নহে। ঐ দেখ! ধূর্ত্ত যবনেরা শৃগালের ন্যায় প্রতাপের স্ত্রী-পুত্রকন্যাগণকে অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু ঐ দেখ! রাজ-ভক্ত ও রাজকার্য্যে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ভিলেরা বেতের ঝুড়িতে তুলিয়া তাঁহাদিগকে মাথায় করিয়া লইয়া সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে শত্রুগণের নিরন্তর অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া ঐ দেখ সেই সকল ঝুড়ির বোঝা লইয়া জাওয়ার টিন্ খনির অভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ দেখ! ভিলেরা খাদ্যসামগ্রী লইয়া গিয়া সেই সুগভীর খনিপ্রদেশেও রাজমহিষী, রাজকুমার ও রাজ-কুমারীগণকে অতি যত্নে খাওয়াইতেছে, ও ভক্তিভাবে তাঁহা-দিগের পরিরক্ষণ করিতেছে। আজ এই অসভ্য ভিলেরাও প্রভুভক্তি ও অতিথি-সৎকারধর্ম্মে রাজপুতানার অন্যান্য সুসভ্য রাজপুতগণকে পরাজিত করিল। এক দিন নয়—কত দিন—এইরূপে তাহারা রাজপরিবারের শুশ্রূষা ও পরিরক্ষণে নিযুক্ত রহিল। শুদ্ধ যে তাহারা অনুসরণকারী যবনগণের হস্ত হইতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছে তাহা নহে। ঐ যে বৃক্ষশাখাবিলম্বী বৃত্তমালা * ও বৃক্ষশাখাসংলগ্ন অর্গলাবলী দেখিতেছ, ঐ গুলিতে ভিলেরা মিবারের ভবিষ্য আশাস্থল রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণকে ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি হিংস্র জন্তুদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ঝুড়িতে পুরিয়া দড়ি দিয়া সেই ঝুড়ি গুলি ঐ সকল বৃত্তে ও অর্গলে † রাত্রিতে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দেয়। যে সুকুমার-বপু রাজপুত্র ও রাজ-কন্যাগণ দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ বোধ করিতেন, আজ এই বেত্রশয্যাও তাঁহাদিগের নিকট পরম

* Rings.

† Bolts. আজও ঐ সকল বৃত্ত ও অর্গল সেই সেই বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত হইয়া প্রতাপের অলৌকিক আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিতেছে।

উপাদেয় বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব সহন-শীলতা!

এত বিপদ্-পরম্পরা ও কষ্ট-রাশির মধ্যেও প্রতাপের ধৈর্য্য বিচলিত হইল না। আকবরের হৃদয় প্রতাপ-মাহাত্ম্যে বিগলিত হইল। বলে যাহা সাধিত হইল না, আকবর মিষ্ট বাক্যে তাহা সাধিত করিবার চেষ্টা করিলেন। আকবরের দূত প্রতাপকে অনেক বুঝাইয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিবার অনুরোধ করিল। কিন্তু উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মনীষীর মন তাহাতে বিচলিত হইল না। দূত দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন যে সেই নির্জ্জন গৈরিকাবাসেও প্রতাপ রাজোচিত আচার ব্যবহার সমস্ত পরিরক্ষিত করিতেছেন। ভোজনমণ্ডলীতে রাণা পূর্ব্বের মত যোগ্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে স্বহস্তে দ্বিগুণিত আহার পরিবেশন করিতেছেন। যদিও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়—বিবিধ আহারের স্থল এক্ষণে বন্য ফলমূল অধিকার করিয়াছে, তথাপি মিবারের সম্ভ্রান্তবর্গ রাজদত্ত প্রসাদ অতি ভক্তি ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। দূতের মুখে প্রতাপের তাদৃশ দুঃখের অবস্থাতেও এই মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া আকবরের পাষাণহৃদয়ও গলিত হইল। শুদ্ধ আকবর কেন—আকবরের অনন্তসামন্তশ্রেণী প্রতাপের এই মাহাত্ম্য-কাহিনী শুনিয়া বিস্ময় ও ভক্তিভাবে বিগলিত-হৃদয় হইলেন। যে সকল কুলাঙ্গার রাজপুত স্বদেশের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়াও প্রতাপকে পরিত্যাগ করিয়া রাজপ্রসাদলোভে আকবরের চরণে শরণ লইয়াছিলেন, সেই ক্ষত্রিয়াধমেরা প্রতাপকাহিনী শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। অধিক কি, সম্রাটের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রতিনিধি খান্‌খানন্ প্রতাপের কীর্ত্তি-কলাপে এতদূর বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে তিনি প্রতাপকে ধর্ম্মের পথে আরও উত্তেজিত ও অধ্যবসায়শীল করিবার জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে তাঁহাকে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠান,—

"পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। বিষয়সম্পত্তি ও ধনরত্ন সকলই অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু মহাত্মার ধর্ম্মের কাহিনী অনন্তকাল রহিয়া যাইবে। প্রতাপ ভূমি ত্যাগ করিয়াছেন, ধন সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আজও কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। সুতরাং ভারতীয় রাজবৃন্দের মধ্যে একমাত্র তিনিই কেবল ক্ষত্রিয়বর্ণের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।"

কিন্তু মহাত্মার জীবনেও দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়। যে প্রতাপ রণস্থলে জ্বলন্ত গোলক ও জ্বলজ্জিহ্ব তরবারির সম্মুখীন হইতে বিন্দুমাত্র ভীত হন না, অনাহার ও অনিদ্রায় বিন্দুমাত্র কাতর হন না, দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়নে অভ্যস্ত হইয়াও অনাচ্ছাদিত স্থণ্ডিল শয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন, সেই পরম সন্ন্যাসী দেবপ্রকৃতি প্রতাপও প্রাণসমা ভার্য্যা ও প্রাণাধিকা পুত্রকন্যাগণের কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়েন। যখন তিনি দেখিলেন যে তাহাদিগকে গিরিশিখরে অধিক কি গিরিগুহাতেও লুকাইয়া রাখিয়াও নিস্তার নাই; যখন তিনি দেখিলেন, যে বার বার আহার প্রস্তুত করিয়াও প্রাণপুত্তলীগণকে খাওয়াইতে পারিতেছেন না, আর তাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আহারের জন্য কাঁদিতেছে, তখন সেই মহাপুরুষেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। ঐ দেখ! পঞ্চস্থানে তাঁহাদের জন্য আহার প্রস্তুত হইয়া ভোজনের আয়োজন হইল, আর পঞ্চ স্থানেই অনুসরণকারী মোগলেরা আসিয়া পড়িল। কাজেই তাঁহাদিগকে আহার ফেলিয়া পলায়ন করিতে হইল। আবার রাজমহিষী ও রাজপুত্রবধূ প্রান্তরের তৃণের বীজের ময়দায় পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া এক এক খানি সকলকে দিয়া অর্দ্ধেকখানি এখন খাইতে ও অর্দ্ধেক বৈকালিক আহারের জন্য রাখিতে বলিয়াছেন, এবং বালকবালিকারা তদনুরূপ করিয়াছে, এমন সময়

ঐ দেখ! এক ভীষণ বন্য বিড়াল আসিয়া বৈকালিক আহা-রের জন্য সঞ্চিত পিষ্টকভাগ হইতে কয়েক খানি তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। ইহাতে ক্ষুধাতুরা রাজকুমারী উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রতাপ এতক্ষণ গভীরচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। দুহিতার ক্রন্দনে তাঁহার চৈতন্য হইল। দুহি-তার আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সবি-শেষ অবগত হইয়া তিনি দুঃখভরে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এতদিন প্রতাপের হৃদয়ের দৃঢ়তা অবিচলিত ছিল—কিন্তু আজ প্রতাপ সামান্য বিষয়ে বালকের ন্যায় অধীর হইয়া পড়ি-লেন। যে প্রতাপ রণস্থলে পুত্র ও জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুও অম্লান-বদনে দেখিয়াছেন—এবং বলিয়াছেন যে "ইহারই জন্য—রণ-স্থলে প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্যই—রাজপুতের জন্ম";—আজ সেই প্রতাপ আহারের জন্য সন্তানের ক্রন্দনে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আজ তাঁহার হৃদয় ধৈর্য্যসীমা অতিক্রম করিয়া দুঃখোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া গেল। আজ তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, 'যে রাজসম্মান ও রাজসিংহাসন এই সকল কষ্টের বিনিময়ে লভ্য, তাহাতে ধিক্! আমি আর তাহা চাহি না!' প্রতাপ এই বলিয়াই যে ক্ষান্ত হইলেন এরূপ নহে। আজ প্রতাপ আকবরের নিকট শান্তিভিখারী হইয়া দূত দ্বারা পত্র প্রেরণ করিলেন—লিখিয়া পাঠাইলেন যে যদি শান্তিও না পাওয়া যায়, তথাপি আকবরের অনুসরণের কঠোরতা যেন কিঞ্চিৎ শিথিলিত হয়! আজ প্রতাপসূর্য্য ক্ষণকালের জন্য যেন রাহুগ্রস্ত হইল!

প্রতাপ অবনত হইয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া আকবরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সম্রাটের আদেশে চতু-র্দ্দিকে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। আকবর আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হইয়া পৃথ্বীরাজকে প্রতাপের পত্র দেখাইলেন। পৃথ্বী-রাজ বিকানীয়ারাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে মাড়ওয়ারিধিপতি মল্লদেবের

দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। বিকানীয়াররাজ-বংশ মাড়ওয়ারের রাঠোর-রাজবংশের একটী শাখা। সেই সূত্রে ও বিকানীয়ার-রাজ্যের সমতলক্ষেত্রত্ব নিবন্ধন ইহা অধিকতর অরক্ষিত থাকায় তাঁহাদিগকে অগত্যা মাড়ওয়ার-রাজবংশের অনুবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পৃথ্বীরাজের নিকট এ অবস্থা অতি কষ্টের অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি নিজে তদানীন্তন কালের এক জন অদ্বিতীয় বীর ও সুকবি বলিয়া ঘোষিত ছিলেন। যাঁহার হৃদয় বীর-জনোচিত সৎসাহস ও সহৃদয়তায় পরিপূর্ণ, দাসত্ব তাঁহার নিকট যে বিষবৎ প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? তিনি স্বাধীনতার বিনিময়ে সেই পদমর্য্যাদা—রাজ্য ধন-সমস্ত কেবল যন্ত্রণার কারণ বলিয়া মনে করিতেন। আবদ্ধ পক্ষী স্বকীয় কারা-স্বরূপ সুবর্ণ-পিঞ্জর ও বন্ধনভূত সুবর্ণ শৃঙ্খলকে যে ভাবে দেখে, মহাপ্রাণ পৃথ্বীরাজও সম্রাটের প্রসাদ-লব্ধ ঐশ্বর্য্য ও ভোগসামগ্রীকে সেই ভাবে দেখিতেন। এই জন্য প্রতাপের সেই পত্র দর্শনে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। সহসা তাঁহার যেন ইহাতে প্রত্যয় হইল না, এই ভাবে তিনি আক্‌-বরের নিকট তদীয় বিশ্বস্ত দূত পাঠাইয়া ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে যদি ইহা সত্য হয়, প্রতাপকে উদ্দীপনাবাক্যে এ কলঙ্ক, হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি প্রতাপচরিত্রের মাহাত্ম্য ও দৃঢ়তা জানিতেন। বুঝিয়াছিলেন যে প্রতাপ সময়োচিত দুঃখভারে অভিভূত হইয়া হঠাৎ এরূপ পত্র লিখিয়া থাকিবেন, কিন্তু চৈতন্য হইলেই তিনি ইহার জন্য পরিতাপ করিবেন। এই বুঝিয়া পৃথ্বীরাজ নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটী কবিতা লিখিয়া দূত দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন ঃ—

"হিন্দুর আশা হিন্দুর উপরই নির্ভর করিতেছে। ইহা জানি-য়াও রাণা সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক

প্রতাপের জন্যই আক্‌বর সমস্ত ভারতকে সমতলক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। আমাদের সামন্ত গণ বীরত্ব, ও রমণীগণ সতীত্ব হারাইয়াছেন। ক্ষত্রিয়কুলের হাটে এখন আক্‌বর একটী কুহকী দালাল। তিনি সে বাজারে সকলই কিনিয়াছেন—কেবল উদয়সিংহের পুত্র প্রতাপকে ক্রয় করিতে পারেন নাই। প্রতাপ অমূল্য ধন—প্রতাপকে ক্রয় করেন—আক্‌বরের এমন সম্পত্তি নাই। প্রকৃত ক্ষত্রিয় কয় জন নয়দিনের (নরোজার) মেলায় কুলসম্মান বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইবেন? অথচ কয় জন না সেই আনন্দের হাটে অপার্থিব কুলগৌরবের বিনিময়ে পার্থিব ধন সংগ্রহ করিয়াছেন? যখন সকল ক্ষত্রিয় তাঁহাদিগের প্রধান পণ্য দ্রব্য এই হাটে বিক্রয় করিয়াছেন, তখন চিতোরবংশধরও কি সেই হাটে নামিবেন? যদিও প্রতাপ তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তিতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তথাপি এতদিন তিনিই কেবল এই অমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছেন। হতাশতায় তাড়িত হইয়া অনেককে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই হাটে আসিয়া জাতীয় দুর্গতি ও জাতীয় অসম্মান প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে; এই কলঙ্ক ও অপযশ হইতে হামীরের উত্তরাধিকারীই কেবল পরিরক্ষিত হইয়াছেন। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিতেছে—প্রতাপ এ গুপ্ত সাহায্য কোথায় হইতে পাইতেছেন? আমি জানি প্রতাপ হৃদয়ের মাহাত্ম্য ও নিজ বাহুবল ভিন্ন আর কোন গুপ্ত সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। ইহা দ্বারাই তিনি এতদিন ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কার ও ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যে কুহকী দালাল এই হাটে ভারতের জাতীয় গৌরব সামান্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছে, তাহাকে এক দিন আমরা অবশ্যই অতিক্রম করিতে পারিব। সে কিছু চিরদিনের জন্য ভারতের মৃত্তিকা ক্রয় করে নাই। এক দিন তাহাকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে। তখন ভারতের মরুভূমিতে ক্ষত্রিয়বীজ বপন

করিবার জন্য ক্ষত্রিয়-কুল প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। সেই বীজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে তাকাইয়া আছে। প্রতাপ কর্তৃক বীজের পবিত্রতা রক্ষা হইলে—তাহা আবার একদিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।" দশ সহস্র সৈন্যবল অপেক্ষা পৃথ্বীরাজের এই উদ্দীপনাবাক্য প্রতাপের উপর অধিকতর প্রভাব প্রকাশ করিল। প্রতাপের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নিকে ইহা সন্ধুক্ষিত করিল—প্রতাপের অবসন্ন স্নায়ুমণ্ডলীতে ইহা নববল যোজনা করিল—প্রতাপের জড়প্রায় দেহকে ইহা আবার কার্য্য-প্রবণ করিয়া তুলিল। সমস্ত ক্ষত্রিয় ক্ষত্রগৌরব রক্ষার জন্য তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে—এই চিত্রে প্রতাপের মন আবার তেজঃপুঞ্জময় হইয়া উঠিল। আবার তিনি ক্ষত্রোচিত বীরকীর্ত্তির জন্য প্রস্তুত হইলেন। উদ্দীপনাময়ী রচনার কি অপূর্ব্ব শক্তি! ইহা মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করে! পতিত জাতিকে আবার জাতীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করে!

যখন আকবরের দূত পৃথ্বীরাজের উদ্দীপনাময়ী পত্রিকা লইয়া প্রতাপের নিকট আসিল, তখন প্রতাপ আরাবলী গিরিমালার অধিত্যকাপ্রদেশে অবস্থিত। পৃথ্বীরাজের পত্রিকা তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। তিনি অবিশ্রান্ত সমরে ক্লান্ত হইয়া আকবরের নিকট শান্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন; ইচ্ছা ছিল শান্তি লাভ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই অধিত্যকাপ্রদেশে ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন থাকিবেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের উদ্দীপনাবাক্যে তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প ওতঃপ্রোত করিয়া দিল। তিনি যবনের নিকট শান্তি ভিক্ষা লইয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করা এখন অতি লজ্জার বিষয় মনে করিলেন। অথচ সেই প্রবলতর তরঙ্গের বিরুদ্ধে আর অধিক দিন দাঁড়াইতে পারিবেন না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজ অভিনানুষচরিত্র ও সেই সঙ্কট সময়ের উপযোগী

এক অপূর্ব্ব সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। যে মিবার একদিন রাজস্থানের উদ্যান বলিয়া প্রথিত ছিল, এবং যে মিবার এখন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী মিবার-ভূমি, এবং যে চিতোরনগরী একদিন বিক্রমে ও ঐশ্বর্য্যে রাজরাজেশ্বরী ও বীরপুরুষ ও বীর রমণীগণের লীলাস্থলী ছিল, এবং যে চিতোরনগরী এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে, ও সেই ভগ্নস্তূপ বীরপুরুষ ও বীরারমণীগণের পবিত্র রক্তে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে; আর এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা শোচ্যা চিতোর-নগরী—প্রতাপ হৃদয়ের এই দুই প্রিয়তম বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পরিবারবর্গকে ও সিসোদীয়বংশধরগণকে লইয়া সিন্ধুনদীর তীরাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। ইচ্ছা জলবেণী-বেষ্টিত সোগদীরাজের রাজধানীতে গিয়া নিজ লোহিত ধ্বজা নিরাপদে উড়াইবেন। কারণ মধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ ভীষণ মরুভূমি সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুর গতিরোধ করিবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রাণপ্রিয়া রাজমহিষী ও প্রাণাধিক রাজনন্দন ও রাজনন্দিনীগণকে—এবং মিবারের সম্ভ্রান্তশ্রেণী—সামন্তবর্গ ও অধীন জমিদারগণ—উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরদল—যাঁহারা অধীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা নির্ব্বাসন শ্রেয়ঃ মনে করিলেন—সকলকে লইয়া আরাবলী গিরিমালা হইতে অবতরণ করিলেন; অবতরণ করিয়া মরুপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাঁহাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্বপুরুষগণের আবাসভূমি মিবারভূমির অধিবাসী হইয়া থাকিতে হইল। প্রতাপ এত যে কঠোর শাসন করিতেন, তাহাতেও তাঁহার প্রজাবৃন্দের অবিচলিত রাজভক্তির হ্রাস হয় নাই। কারণ সকলেই বিশ্বাস করিত যে প্রতাপ, যাহা করিতেছেন, তাহা মিবারের মঙ্গলের জন্যই। সকলেই তাঁহাকেই পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাঁহার অলৌকিক

আত্মোৎসর্গ দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে মানবরূপী দেবতা বলিয়া মনে করিত। এই জন্য প্রতাপকে মিবার ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়া প্রতাপের মন্ত্রীর আজ হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে মিবারের মন্ত্রী। সুতরাং রাজকীয় প্রসাদ-লব্ধ ধনে তাঁহাদের ভাণ্ডার পরিপূরিত। তিনি সে সমস্ত ধন প্রতাপের চরণে অঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসন হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। এরূপ অভাবনীয় ও অলৌকিক রাজভক্তিতে প্রতাপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যে দেশের এরূপ রাজভক্তির জগতে তুলনা নাই—সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রতাপের আর প্রবৃত্তি হইল না। আজ মন্ত্রি-কুল-তিলক ভাম সাহার অতিমানুষ আত্ম-ত্যাগে মিবার রাজ্য রক্ষা পাইল। ভাম সাহার নাম অনন্ত-কালের জন্য ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। আজ ভাম সাধু প্রতাপের চরণে যে ধন অঞ্জলি প্রদান করিলেন তাহা দ্বারা পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য দ্বাদশ বৎসর প্রতি-পালিত হইতে পারে। মন্ত্রিবরের অসাধারণ প্রভুভক্তিতে ও পৃথ্বীরাজের কবিতাময়ী উদ্দীপনাতে উত্তেজিত হইয়া প্রতাপ মিবারের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য আবার প্রাণপণ করিলেন।

এই সময় মোগল সেনাপতি সাহবাজখাঁ দেবীরে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন প্রতাপ এত দিনে মরুপার হইয়া গমন করিতে-ছেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া উৎসবে দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময় প্রতাপ-বাহিনী সহসা স্বদেশাভি-মুখিনী হইল। মোগল-সেনাপতি এ সংবাদ না পাইতেই প্রতাপ সেই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীরদল লইয়া প্রচণ্ডবেগে মোগল-সৈন্যাবাসে আসিয়া পড়িলেন। সেই বীরদলের তর-বারির আঘাতে মোগল-সৈন্যগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। অতি-

অল্পসংখ্যক মাত্র মোগল সৈন্য পলাইয়া আমাইতের দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু ক্ষত্রিয়বীরদল মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় গিয়া তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরিত করিলেন। তাঁহারা বিশ্রাম না করিয়া কমলমীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিমেষ-মধ্যে সে দুর্গও আক্রান্ত ও পুনঃ গৃহীত হইল। দুর্গাধিপতি আব-দুল্লা ও তদীয় দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ সকলেই প্রতাপের করাল অসিমুখে পতিত হইল। কমলমীরের পর একে একে দ্বাত্রিংশৎটী দুর্গ আক্রান্ত ও গৃহীত হইল। প্রতাপের কঠোর আদেশে সেই সকল দুর্গের সমস্ত অধিবাসী শমন-সদনে প্রেরিত হইল। প্রতাপকে দেখিয়া বোধ হইল যেন পশুপতি সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহসা মিবার-মরুক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া-ছেন—যেন যবনকুল ধ্বংস করিবার জন্য কালান্তক যম সহসা মিবারভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! এই দুর্দ্দর্শ অথচ অনিবার্য্য ঘাতন-কার্য্য দেখিয়া জগৎ স্তব্ধ হইল! বোধ হইল যেন প্রতাপ সর্ব্বসংহারিণী নিজ অসিদেবীর মুখে মিবারের সমস্ত জীবই বলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রতাপের এই অতিমানুষ অবদানপরম্পরায় এক সমরাবলীতেই (১৫৮৬ শকাব্দা-১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মিবার রাজ্য পুনরাধিকৃত হইল। রাজা মানসিংহ প্রতাপকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে চিরদিন বিপদে কাটাইতে হইবে এবং যে ভয় প্রদর্শন তিনি অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন—সেই ভয় প্রদর্শনের প্রতিশোধ লইবার জন্য আজ প্রতাপ তদীয় বিজয়-প্রদীপ্ত সৈন্যগণ লইয়া অম্বররাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থান মালপুরা নগরী অবরোধ করিলেন।

উদয়পুর সর্ব্বশেষে পুনরাধিকৃত হইল। উদয়পুর পুনরা-ধিকৃত করিতে প্রতাপকে সবিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। কারণ প্রতাপের সৈন্য উদয়পুরের তোরণদ্বারে উপস্থিত

হইবামাত্র যবনেরা ইহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। প্রতাপকে যবনেরা যেন এখন হইতে কালান্তকযমোপম দেখিতে লাগিল। দেবীরের যুদ্ধে প্রতাপের ও তদীয় অজেয় সেনার অলৌলিক বীরত্বের, ও সেই নরমেধযজ্ঞে সমস্ত যবন-সেনার বলি পড়ার কাহিনী সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইল। উদয়পুরস্থ যবনসেনা সেই জন্য আর প্রতাপের করাল-বদনে পতিত হইতে সাহস করিল না। সিংহের সম্মুখে মেষপালের ন্যায় পলাইয়া গেল।

এই ঘটনার পর আকবর আর প্রতাপকে যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রতাপের দেবদুর্ল্লভ আত্মোৎসর্গে আকবরের কঠিন হৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। তিনি ও তদীয় হৃদয়বান্ খান্‌খানা এখন হইতে প্রতাপের স্তুতিবাদক হইয়া উঠিলেন। কোন্ পাষাণ-হৃদয় প্রাণোৎসর্গের পূজা না করিয়া অধিক দিন থাকিতে পারে? "কঃ ইপ্সিতার্থ স্থির নিশ্চয় মনঃ। পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ" আর অভিলষিত বিষয়ে স্থির-সঙ্কল্প ব্যক্তির ও সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতিই বা কে রোধ করিতে পারে?

প্রতাপ জীবনের অবশিষ্টাংশ শান্তিতে কাটাইলেন। আকবরের ঔদার্য্যই যে শুদ্ধ এই শান্তির মূল তাহা নহে। আকবরের সেনার ও সেনানায়কগণের মধ্যে রাজস্থানের ক্ষত্রিয়গণই প্রধান। তাঁহারা স্বজাতিপ্রেমিক ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ প্রতাপের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং আকবরকে প্রতাপ-নির্যাতন হইতে অতঃপর একেবারেই নিবৃত্ত হইতে হইল।

কিন্তু এ শান্তি প্রতাপের নিকট যন্ত্রণার কারণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে গিরিপথ দিয়া উদয়পুরে প্রবেশ করিতে হয়, এবং যে গিরিমালা উদয়পুরের দুর্গস্বরূপ হইয়া ইহাকে

রক্ষা করিতেছে, সেই গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া প্রতাপ যখন শত্রু-হস্তগতা চিতোর-নগরীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন প্রতাপের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। সেই অমরাপুরীর ভগ্নস্তূপের দিকে দৃষ্টি করিলে প্রতাপের হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। পিতৃ-পৈতামহিক রাজধানী সেই চিতোর নগরীতে তিনি আর এ জীবনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না,—এ চিন্তা প্রতাপের নিকট অসহনীয়া। যে প্রতাপ-হৃদয় জাতীয় লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্নিময় হইয়া আছে, সে প্রতাপ-হৃদয়ে শত্রুর দয়া—যে দয়া সে হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—শত্রুর সেই দয়া মৃত্যু অপেক্ষা অসহনীয়। ক্ষুধাতুরের সম্মুখে খাদ্য রাখিয়া তাহাকে খাইতে না দিলে তাহার যে কষ্ট, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ ব্যক্তির সম্মুখে জল রাখিয়া তাহাকে সে জলপান করিতে না দিলে তাহার যে কষ্ট, এই শান্তির অবস্থায় প্রতাপ তাহা অপেক্ষায় শতগুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

পাঠক! একবার কল্পনাবলে প্রতাপমূর্ত্তি তোমার মানস-নয়নের সম্মুখে আনিয়া সেই মহাপ্রাণ মহাবীরের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার তাৎকালিক অন্তর্বাহ্য অবলোকন কর, দেখ', কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! বীরবর এখনও প্রৌঢ়াবস্থায় অবস্থিত, অথচ উঁহার মুখ-কান্তিতে কি গভীর চিন্তার রেখাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তাঁহার হৃদয়ের প্রধান আকাঙ্ক্ষা এখনও পূর্ণ হয় নাই। আর তপ্তকাঞ্চননিভ ঐ দেহে যে সকল কৃষ্ণ লাঞ্ছন দেখিতেছ, সে গুলি প্রহরণক্ষতচিহ্ন। ঐ দেখ প্রতাপ উদয়পুরের গিরিশৃঙ্গে উপলখণ্ডে বসিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে চিতোরনগরীর দিকে তাকাইয়া আছেন। যে চিতো-রের প্রস্তরময় ভগ্নাবশেষের উপর এখনও পিতৃপুরুষগণের রুধির পতিত রহিয়াছে, যে চিতোরের প্রত্যেক স্থান বীরা নারী ও বীরপুরুষগণের অলৌকিক আত্মোৎসর্গে ও বীরত্বে

পূত হইয়া রহিয়াছে,—সেই চিতোরের সহিত তাঁহার নয়নদ্বয় যেন রশ্মি-সংযত হইয়া রহিয়াছে। যে চিতোরে বীরচূড়ামণি বাদল ও বাপ্পারাও রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; যে চিতোরের অধিপতি রণপণ্ডিত সমরসিংহ ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দৃশদ্বতী-নদী-তীরে যাবনিক গতিরোধ করিতে গিয়া ভারত-রত্ন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের পার্শ্বে রণাঙ্গনে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; যে চিতো-রের অধিত্যকা-প্রদেশ হইতে লোহিত পতাকা হস্তে করিয়া উর্শীর দ্বাদশ পুত্র রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া শত্রু দলন করিয়া আবার সগৌরবে সেই অধিত্যকা-প্রদেশে উঠিয়াছিলেন; যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভবানী অধিত্যকা-প্রদেশ হইতে ভীষণ কটাক্ষ নিক্ষেপণ দ্বারা শত্রুদিগকে প্রহরণ-পাতের অগ্রেই নিহতপ্রায় করিয়া থাকেন; যে চিতোর নগরীতে দেওলা-সামন্ত জয়মল্ল ও পুত্ত আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখা-ইয়া গিয়াছেন; যে চিতোর-নগরীতে চন্দ্রাবতরমণী প্রাণা-ধিকা দুহিতা সঙ্গে রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এবং সেই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ অনন্ত-কালের জন্য রাজপুত-পুত্র ও রাজপুত-স্বামিগণের চির-অনু-করণীয়া হইয়া রহিয়াছেন,—সেই অতীত দিনের চিতোর নগরীর সঙ্গে তিনি বর্ত্তমান তমসাচ্ছন্ন ভগ্নাবশেষ চিতোর-নগরীর গম্ভীরভাবে তুলনা করিতেছেন। তাই ঐ দুই নীলোৎ-পল ফাটিয়া যেন রক্ত বাহির হইতেছে। তাই আজ ঐ বিশাল বক্ষে ঘন ঘন তরঙ্গ উঠিয়া উহাকে অনবরত বিকম্পিত করি-তেছে। আবার সেই দুর্দ্দিন—যে দুর্দ্দিনে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চিতোর-দুর্গ-রক্ষার ভার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন—সেই দুর্দ্দিন—যে দিন, হইতে চিতোরের পতন আরম্ভ হইয়াছে, সেই দুর্দ্দিন যখন কল্পনায় তাঁহার হৃদয়-ফলকে আবির্ভূত হইতেছে, তখন জীবন তাঁহার নিকট যেন

বিড়ম্বনার সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হইতেছে! আবার ঐ দেখ! পিতৃদেব উদয়সিংহ যবন-হস্তে, চিতোরনগরী সমর্পণ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতেছেন। কল্পনা যখন এই চিত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিতেছে, তখন ক্রোধ ও ক্ষোভে তাঁহার অধরোষ্ঠ বিকম্পিত হইতেছে! এই সকল চিত্র শেলসম তাঁহার বক্ষে বাজিতেছে! এ সকলের প্রতিবিধান না করিয়া আজ তিনি যবনের অনুগ্রহে শান্তি ভোগ করিতেছেন—এ চিন্তা—তাঁহাকে যেন লৌহ কটাহে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। শত্রুর অনুকম্পায় শান্তি-সুখ ভোগ করা বীরের পক্ষে—স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ প্রতাপের পক্ষে—নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষাও সহস্র গুণে ক্লেশকর। শত্রুর অনুকম্পা, শত্রুর শাণিত তরবারি অপেক্ষা বীরের নিকট অধিকতর ভয়াবহ! ঐ দেখ! আজ তাই প্রতাপের মুখ-কান্তিতে এত যাতনার রেখা প্রতিভাত হইতেছে!

যে জীবন নিরন্তর সংঘর্ষে অতিবাহিত হইয়াছে—যে বীরদেহ কষ্টশৈলে নিরন্তর প্রতিহত হইয়াছে—যে হৃদয় কষ্টের উপর কষ্টের আঘাতে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া গিয়াছে,—সে জীবনে অবিশ্রান্ত শান্তি, সে দেহে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম, ও সে হৃদয়ে শত্রুর অনুকম্পা অসহনীয় হইয়া উঠিল। অসহ্য সহিতে সেই অমূল্য জীবন অবসন্ন-প্রায়, সেই সুদৃঢ় বীরদেহ জীর্ণপ্রায় ও সেই তেজঃপুঞ্জময় হৃদয় নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিল। প্রতাপ বুঝিলেন মৃত্যু আসন্নপ্রায়। বুঝিয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট কয় দিন প্রিয়তর পুত্র ওমরাকে শত্রু নিসূদন-রূপ কৌলিক ব্রতে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিউমিডিয়াধিপতি হামিল্‌কার জীবনের শেষ দিনে বীরপুত্র হানিবাল্‌কে দেবালয়ে লইয়া গিয়া যেমন রোমের বিরুদ্ধে চির-রণ-খ্যাপনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন, প্রতাপও যবনের বিরুদ্ধে চিরদিন অস্ত্র ধারণ

রক্ষা করিবার জন্য পুত্রকে বার বার প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে বলিলেন। কিন্তু হামিল্‌কার হানিবলের নিকট যে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন, প্রতাপের ভাগ্যে সে প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্তি ঘটিল না। প্রতাপ বুঝিলেন ওমরা শান্তি-সুখের চরণে জাতীয়-গৌরব ও পিতৃ-নাম বলি দিবেন। বুঝিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার অতিশয় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়।

ঐ দেখ! পেশোলাহ্রদের তীরে পর্ণ-কুটীরে * কুশশয্যায় দেবীর-বিজয়ী বীরকুল-চূড়ামণি রাজর্ষি প্রতাপ জীবনের মধ্যাহ্ন-ভাগে চিন্তাজ্বরাক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যু-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। অমাত্য ও সামন্তবর্গ—যাঁহারা কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল অবস্থায় ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন—চতুঃপার্শ্বে তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। জীব জন্তু নিস্তব্ধ! সেই তরঙ্গময় হ্রদ তরঙ্গলীলা-শূন্য! আশ্রমের বৃক্ষের সেই গম্ভীর ও শোকাবহ সময়ে—তদীয় দুর্দ্দিনের বা গৌরবদিনের সহচর-বৃন্দ নির্নিমেষ লোচনে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। সেই মহাপ্রাণ সেই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া কখন পলায়ন করিবেন সকলে উৎসুক ও কাতর অন্তরে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন—এমন সময় প্রতাপের মুখ হইতে কাতরতাসূচকধ্বনি উদ্গীরিত হইল।

সালুম্ব্রাধিপতি অতিকাতর ও বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেব! এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আপনি এত

---

* অতিমনোহর হ্রদ পেশোলার তীরে কুটীরাবলী নির্ম্মাণ করিয়া রাজর্ষি প্রতাপ ও তদীয় সামন্তগণ যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। প্রতাপের প্রতিজ্ঞা ছিল যে যতদিন চিতোর পুনরধিকৃত না হইবে, ততদিন তাঁহারা এই অবস্থায় কালযাপন করিবেন। সেই হ্রদ এখন চতুর্দ্দিকে মনোহর প্রস্তরময়ী হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত হইয়াছে।

যন্ত্রণা পাইতেছেন কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"যতক্ষণ না আমার আত্মা এই প্রতিশ্রুতি পাইতেছেন—যে আমার দেশ তুর্কের হস্তে পতিত হইবে না—ততক্ষণ আমার আত্মা এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছেনা।" এমন সময় ঐ দেখ! যুবরাজ অমরসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দেখ! কুটীরের একখানি বংশ-খণ্ডে অমরের উষ্ণীশ সংলগ্ন হইয়া গেল। উষ্ণীশ বংশ-খণ্ডে ঝুলিতে লাগিল, আর অমর অনাবৃত মস্তকে কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ দেখ! অমরের মুখ-কান্তিতে রাগ ও বিরক্তির চিহ্ন প্রতিভাত দেখিয়া প্রতাপের নয়নযুগল হইতে স্ফাটিক বিন্দু সকল নির্গত হইতেছে। প্রতাপ বুঝিলেন তাঁহার অমর এ কঠোর-ব্রত রক্ষা করিতে পারিবেন না। বুঝিলেন অমর ব্যক্তিগত সুখে অভিভূত হইয়া পিতার প্রতি ও স্বদেশের প্রতি যবনেরা যে সকল নির্যাতন করিয়াছে—সে সমস্ত ভুলিয়া যাইবেন। এই ভাবিয়া তিনি নিদারুণ ব্যথিত হইলেন। ঐ শুন তিনি অমাত্য ও সামন্তবর্গকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছেন—"বন্ধুগণ! এই যে কুটীরাবলী দেখিতেছ, আমার মৃত্যুর পর এ গুলির উপর অপূর্ব্ব সৌধমালা বিরাজ করিবে। সেই সৌধমালায় বিলাসপ্রিয়তা রাজত্ব করিবে, এবং সেই বিলাস-প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুযাত্রিকবর্গও আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন মিবারের স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতার জন্য আমরা শিরা চিরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছি—সেই অমূল্য স্বাধীনতা উৎসর্গীকৃত হইবে, এবং অমাত্য ও সামন্তগণ! তোমরাও সেই বিষাক্ত দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিবে"—বলিতে বলিতে ঐ দেখ! প্রতাপের অশ্রুজলে তদীয় কুশশয্যা ভাসিয়া গেল। তখন তদীয় অমাত্য ও সামন্তবর্গ এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং যুবরাজ অমরসিংহও যে সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিবেন তদ্বিষয়েরও ভার লইলেন—তাঁহারা বাপ্পারাওএর সিংহাসনের

নামে শপথ গ্রহণ করিলেন যে যতদিন মিবারের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে পুনর্লব্ধ না হইবে, ততদিন তাঁহারা সেই কুটীরাবলীর উপর সৌধমালা নির্ম্মাণ করিতে দিবেন না। এই বাক্যে প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন। ঐ দেখ! ঐ নীল নলিনদ্বয় অনন্তকালের জন্য নিমীলিত হইল। ঐ দেখ! ও মুখকান্তিতে আর বিষাদের ছবি প্রতিবিম্বিত নাই। এতক্ষণে প্রতাপের পবিত্র আত্মা সুখে সেই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন! ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! ধন্য তোমার আত্মবিস্মৃতি!! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ!!!

এইরূপে বীরপ্রসবিনী রাজপুতানা হইতে বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ অন্তর্হিত হইলেন। প্রতাপের তিরোভাবে সমস্ত মিবাররাজ্য শোকে অভিভূত হইল। প্রত্যেক প্রজা আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এক প্রতাপচন্দ্রে সমস্ত রাজপুতানা জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, সেই চন্দ্রের তিরোভাবে সমস্ত রাজপুতানা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। শত শত ক্ষত্রিয়নক্ষত্রে সে তম নিরস্ত হইল না। সেই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক রাজপুতের অন্তরে প্রতাপ-স্মৃতি কেবল দীপ্তিমতী রহিল। যতদিন রাজপুত-হৃদয়ে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সে স্মৃতির দীপ নিভিবে না! নিভিতে পারেও না!!

পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ আক্‌বরের দিগ্বিজয়িনী অনন্ত অনীকিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার দর্প খর্ব্ব করিবার জন্যই যেন ভারতে প্রতাপের আবির্ভাব হইয়াছিল। রণপাণ্ডিত্যে ও সংখ্যার আনন্ত্যে যে সেনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে জগতে এরূপ সেনার অস্তিত্ব তৎকালে ছিল না, প্রতাপ সামান্য রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া—শূন্যপ্রায় ধনাগার ও অস্ত্রাগার এবং দশমাংশ মাত্র সৈন্য লইয়া সেই সেনার গতিরোধ

করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের কাহিনী ইতিহাসের বর্ণনীয় আর হয় নাই।

যদি মিবারে থিউসিডাইডিস্ বা ঝিনোফনের মত ঐতিহাসিক আবির্ভূত হইতেন, তাহা হইলে প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী পিলোপনিসস্ সমরাবলী বা দশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের প্রতিযান-কাহিনীকে নিজ গৌরব-চ্ছায়ায় বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারিত। নির্ভীক বীরত্ব, অদমনীয় সহিষ্ণুতা, অবিচলিত ও কলঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য অধ্যবসায়, পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, এবং স্বদেশের প্রতি জ্বলন্ত ভক্তি—এই সকল মহীয়ান্ গুণে প্রতাপ ও তদীয় সহচর-বৃন্দ,—আক্বরের গগণ-স্পর্শিনী আকাঙ্খা, অতুলনীয় রণ-বিষয়িণী প্রতিভা, অসীম ও অনন্ত সামরিক উপাদান-সামগ্রী, এবং তদীয় সৈন্যগণের অগ্নিময় ধর্ম্মোন্মাদ—এ সমস্তই বিফল করিতে পারিয়াছিলেন। আরাবলী গিরিমালার মধ্যে এমন গিরি-পথ ছিলনা, যাহার প্রত্যেক বিন্দু প্রতাপের বীরত্বে পূত হয় নাই। কি জয়ে কি পরাজয়ে—প্রতাপের অলৌকিক রণপাণ্ডিত্য ও অসাধারণ আত্মোৎসর্গ তদীয় কীর্ত্তিকে মিবার-ভূমিতে অনন্ত-কাল-স্থায়িনী করিয়া রাখিয়াছে। হল্‌দীঘাট মিবারের থার্ম্মোপিলি; এবং দেবী-রণ-ক্ষেত্র মিবারের ম্যারাথন্! প্রতাপ! একবার আবার ভারতে আসিয়া এ পতিত জাতিকে উদ্ধার কর! একবার তোমার সেই রাজপুত-সৈন্যে তোমার সেই অমিত-তেজ সংক্রামিত কর! আইস! এবার সমস্ত ভারত-বাসী হল্‌দীঘাটে ও দেবীরে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত আছে। ঐ দেখ! তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী যবন-সেনা আত্ম-দ্রোহিতাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তোমার পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইবার জন্য সোৎসুক নেত্রে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে! আর ঐ ক্ষত্রসেনা—তদীয় অজেয়

অক্ষৌহিণী—এবার যবনসেনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! এবার তাহারা পরস্পর-প্রতি-দ্বন্দ্বী নহে। এবার তাহারা পরস্পরের মর্ম্মপীড়ায়—দাসত্বের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে—পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে জড়িত, ও এক স্বার্থে অনুস্যূত! প্রতাপ! একবার আসিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ! তুমি আবার আসিয়া জাতীয় অধিনেতৃত্ব গ্রহণ কর! আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল হউক্!

রাণা অমরসিংহ।

প্রতাপের সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে অমরসিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সুতরাং জ্যেষ্ঠাধিকার-নিয়মে প্রতাপের সিংহাসনে তিনিই আরূঢ় হইলেন। অমর অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কি বিপদে, কি সম্পদে—কি অরণ্যে, কি নগরে—কি গিরিগুহায়, কি রাজপ্রাসাদে—কি শান্তি-ক্রোড়ে, কি সমরাঙ্গনে—সতত পিতার সহচর ছিলেন। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর বিপদ্-পরম্পরায় ও তদানুসঙ্গিক কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে অতিবাহিত হইয়াছিল। সেই দেবোপম পিতা কর্তৃক সেই নবীন বয়সেই তিনি গৈরিকসমরপ্রণালীতে দীক্ষিত, এবং সর্ব্ববিধ বিপদে বীরের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণকালে তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন মাত্র। প্রকৃতি ও শিক্ষা তাঁহাকে অনন্তবলশালী করিয়া তুলিয়াছে। বিধাতা যেন তাঁহাকে পিতৃ-সঙ্কল্প সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়াছেন, এবং সেই সঙ্কল্প-সাধনের জন্যই যেন তাঁহাকে বীরপুত্রগণে বিভূষিত করিয়াছেন।

সময়ও এই সঙ্কল্প-সাধনের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। মিবারের প্রবল শত্রু আকবর প্রতাপের মৃত্যুর পর আট বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই আট বৎসর কাল তিনি সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যাপৃত থাকায় মিবার-আক্রমণ হইতে বিরত ছিলেন। সুতরাং অমরসিংহ এ আট বৎসর গভীর শান্তিতে অতিবাহিত করিলেন। 'এই অবসরে অমরসিংহও স্বরাজ্যে নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন; জমির

উপর নূতন কর নির্দ্ধারণ করিলেন; জমিদারি-গুলির নূতন নিয়মে বন্দোবস্ত করিলেন; কোন্ জমিদারকে কোন্ কোন্ সময়ে কিরূপ সাহায্য করিতে হইবে, তাহার সুন্দর নিয়ম করিয়া দিলেন। তিনি রাজ্যের সম্ভ্রান্তশ্রেণী ও সামন্তবর্গের মধ্যে পদমর্য্যাদার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-ক্রমে নিয়মাবলী স্থাপন করিলেন। অমর-প্রতিষ্ঠাপিত পদমর্য্যাদার এই ক্রম ও নিয়মাবলী মিবারে আজও প্রচলিত রহিয়াছে। কিরূপে কাহাকে উষ্ণীশ বাঁধিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্তও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল আদর্শ মিবারের স্তম্ভ সকলে আজও অঙ্কিত রহিয়াছে। আজও মিবারের রাণা ও সামন্তগণ উৎসবোপলক্ষে, অমরসাহী উষ্ণীশ পরিধান করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই শান্তি-সুখই কাল হইল। প্রতাপ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন এতদিনে তাহা ফলবতী হইতে চলিল। যে দারিদ্র্য ও আত্মত্যাগ—প্রতাপকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, প্রতাপের হৃদয়ে ও বাহুযুগলে অতিমানুষ বল দিয়াছিল, এবং প্রতাপের অমর-কীর্ত্তির স্তম্ভীভূত হইয়াছিল, অমর এই দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি-সুখে বিহ্বল হইয়া পিতৃ-গৃহীত সেই দারিদ্র্য ও আত্মত্যাগ-ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।

এখন তিনি পিতৃ-নিষেধের বিরুদ্ধে সেই সুন্দর হ্রদের তীরে, পিতৃ-সন্ন্যাস-ক্ষেত্র সেই কুটীরাবলীর স্থানে "অমর-মহল" নামে এক অপূর্ব্ব ও সৌন্দর্য্যময় প্রাসাদ নির্ম্মাপিত করিলেন। সেই প্রাসাদের দুই ধারে হ্রদের তীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এখন যে রমণীয় মার্ব্বলময় সৌধাবলী উঠিয়াছে, এবং যে গুলিকে এখনকার রাণারা বিলাস-ভবন করিয়াছেন, 'অমর-মহল' সৌন্দর্য্যে ও দৃঢ়তায় আজও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে।

এই বিলাসভবনের সঙ্গে সঙ্গে—দারিদ্র্য ও আত্মত্যাগ-ব্রত-স্খলনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ—সর্ব্ববিধ বিলাসপ্রিয়তা ও সর্ব্ববিধ

সুখ শান্তির স্পৃহা অমরসিংহকে আসিয়া গ্রস্ত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল। প্রতাপের ন্যায় অমর-সিংহ আর রণস্থলকে সুখ-প্রাঙ্গন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন না। স্বাধীনতা ও বীর-সম্মানকে তিনি আর প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাসিতে লাগিলেন না। সমস্ত মিবার যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের বিষময় প্রভাবে দুষ্ট হয় হয় হইয়া উঠিল।

এই সময়ে আকবর-তনয় সেলিম্ জাহাঁগীর নাম ধারণ করিয়া চারি বৎসর মাত্র পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ থামাইয়া একমাত্র রাজ্য—যাহা এতদিন পর্য্যন্ত মোগল-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আসিয়াছে—সেই এক মাত্র রাজ্য পুণ্য-ভূমি মিবারকে অধীনতায় আনিয়া নিজ রাজত্বকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশে তিনি সমস্ত মোগলসেনাকে একত্রিত করিয়া মিবারাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। সেই মহতী মোগলসেনা মিবারাভিমুখিনী হইয়াছে শুনিয়া অমরসিংহ ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি পারিষদ্বর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় সিংহাসনাধিরূঢ় রহিয়াছেন, এমন সময় দূত আসিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিল। দ্বাদশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ ভোগ করিয়া রাণা বংশাগত সমর-প্রিয়তা-হারা হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার চিত্ত-শলাকা শান্তি ও সমর—এই সীমাদ্বয়ের মধ্যে দোলায়মান হইতেছে। স্বার্থ-জীবন, সুখ-প্রিয় পারিষদেরা স্বাধীনতা ও জাতীয় গৌরবের বিনিময়ে তাঁহাকে ক্ষত্র-বিগর্হিত শ্রান্তি ও শান্তিময় আলস্য-ক্রয় করিবার জন্য উপদেশ দিতেছে—এবং বিষাক্ত দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিতে প্রায় অধিকাংশ পারিষদ্ উদ্যত হইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া মিবারের সামন্তবর্গ রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রাণাকে শান্তির প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া

আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিলেন। অমর তখনও ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া মহাপ্রাণ স্থবির-শ্রেষ্ঠ চন্দাবত-সামন্ত মৃত্যুকালে প্রতাপ তাঁহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করাইয়া রাণাকে অচিরাৎ যুদ্ধশয্যায় সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। মিবারের মঙ্গলের জন্য—জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবার জন্য—প্রতাপের নিকট তিনি যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন—তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য, সেই স্বজাতি-প্রেমিক দেশহিতৈষী প্রবয়াঃ সামন্ত-প্রবর অমরের অভি-ভাবক-স্বরূপ যেন তাঁহাকে আজ এই আদেশ করিলেন। সক-লেই প্রতাপের উদার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দাসত্বের জাঁকজমকপূর্ণ সুবর্ণময় প্রাসাদ অপেক্ষা স্বাধীনতার কাঠিন্যময় কষ্ট-সঙ্কুল কুটীর তাঁহারা অধিকতর উপাদেয় বলিয়া মনে করিলেন।

কিন্তু তাঁহার সে হিতময় আদেশ বা উপদেশবাক্য রাজার কর্ণে লব্ধ-প্রবেশ হইল না দেখিয়া চন্দাবত-বংশ-তিলক সালুম্ব্রাধিপতি 'কার্পেট্‌-দাসকে' * তুলিয়া কার্পেটের উপর সবেগে প্রক্ষিপ্ত করিলেন, এবং সহসা আসন হইতে উঠিয়া রাজার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন হইতে নামাইলেন এবং জলদগম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"সামন্তগণ! আপ-নারা স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করুন, এবং প্রতাপের পুত্রকে অশ্বোপরি আরূঢ় করিয়া অকীর্ত্তি হইতে রক্ষা করুন"। এই আপাত-দৃশ্যমান রাজমর্য্যাদালঙ্ঘনে পারিষদেরা সালুম্ব্রাধি-পতিকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন, এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার উপর অযথা গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* কাংস অলঙ্কার-বিশেষ। বায়ুবেগে কার্পেট যাহাতে উড়িয়া না যায়, এই জন্য কার্পেটের চারি কোণে ইহার চারিটী রক্ষিত হয়।

কিন্তু তিনি পবিত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ কলঙ্কের ডালি আহ্লাদপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং অটল-অচল-সম হইয়া অর্ব্বাচীনগণের সেই গালিবর্ষণ সহ্য করিলেন। মিবারের গণ্য মান্য সামন্তগণ এক বাক্যে সালুম্ব্রাধিপতির এই অপূর্ব্ব রাজভক্তির অনুমোদন করিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বহস্তে অমরকে রাজকীয় অশ্বোপরি বসাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মিবা-রের রণবীরগণ স্ব স্ব অশ্বে আরূঢ় হইয়া রাজাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন রাগে ও অভিমানে অমরসিংহের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় সেই অশ্বা-রোহী সেনা সৌধমালা-পরিশোভিত অধিক্যতাপ্রদেশ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয় অমরপুরী হইতে দেবরাজ ইন্দ্রকে লইয়া অসুরবিজয়ে বহির্গত হইলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব রাজভক্তি! আজ সালুম্ব্রাধিপতির নিকট প্রতাপ-তনয় ও তদীয় রাজ্য অনন্ত ঋণে আবদ্ধ হইল! আজ আর্য্যজাতি জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইল!

সেই অশ্বসেনা—যেখানে এখন জগন্নাথদেবের মন্দির উঠি-য়াছে, ক্রমে সেইস্থানে গিয়া পৌছিল। এতক্ষণে অমরসিংহ ক্রোধ রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইলেন। অশ্রুস্রোত এতক্ষণ পরে তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রবাহিত হইতে ক্ষান্ত হইল। এতক্ষণে তদীয় কর তদীয় শ্মশ্রুমণ্ডলে পতিত হইল।* এত-ক্ষণে তিনি সামন্তবর্গকে যথাযোগ্য সম্মানসূচক অভিনন্দন করিলেন, এবং সেই কৌলিক অভিনন্দন করিতে যে বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি সালুম্ব্রাধিপতির নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ-পূর্ব্বক ক্ষমা চাহিলেন ও বলিলেন—"আপনি রণস্থলে অগ্রবর্ত্তী হউন্। আপ-

* ইহা [illegible] ও আত্মমানিতা উভয়ই সূচিত হয়।

নাকে পূর্ব্ব রাজার অভাবজনিত শোক আর কখন করিতে হইবেনা।” রাজার এই বাক্যে সকলেরই মনে বীরত্ব ও রাজভক্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত ও নবীভূত রাজভক্তি ও বীরত্ব লইয়া সেই বীরবৃন্দ দেবীর-রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মহাক্ষেত্রে—সেই পবিত্র গিরিসঙ্কটে—এই দ্বিতীয় বার রাজপুত সেনা মোগল-সেনার সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর—সেই ভীষণ নরমেধ যজ্ঞে—বিজয়লক্ষ্মী রাজপুতগণের অনুকূল হইলেন। ১৬৬৪ শকে (১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ দ্বারা অমরসিংহ প্রতাপের উপযুক্ত পুত্র বলিয়া জগতে কীর্ত্তিত হন। শৌর্য্য ও বীর্য্যে তিনি পিতৃসম ছিলেন। মহাপ্রাণতায় পিতার ন্যূন হইলেও প্রতাপের সহচরবৃন্দের হৃদয়-মাহাত্ম্যে সে ন্যূনতা কথঞ্চিৎ পূরিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের গৌরবের প্রধান অধিকারী রাণার খুল্লতাত কর্ণ। অতঃপর কর্ণ হইতে কর্ণাবত বংশ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। মোগলেরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অমর সিংহের নিকট সন্ধি-ভিখারী হইল। এত দিনে প্রতাপের শান্তি-ভিক্ষার প্রায়শ্চিত্ত হইল। অমরসিংহ মোগলদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু সে সন্ধি স্বল্পকাল-মাত্র-স্থায়ী হইয়াছিল। মোগলেরা কেবল আপনাদের অপচিত বল উপচিত করিবার জন্যই এই সময় লইয়াছিল। অবশেষে বল-সঞ্চয় করিয়া তাহারা ১৬৬৬ শকাব্দার বসন্তকালে আবার রাজপুতানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৬৬৬ শকাব্দা বা ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফাল্গুণ তারিখে পবিত্র রণপুর গিরিসঙ্কটে উভয় সৈন্যে ভীষণতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই মহারণে প্রত্যেক রাজপুত যেন, এক এক রুদ্রাবতারে পরিণত হইয়াছিলেন। মোগল-সৈন্য-বনে যেন সহসা শত শত রুদ্রতেজ আবির্ভূত হইয়া ইহাকে মুহূর্ত্ত-

মধ্যে ভস্মস্তূপে পরিণত করিল। মোগল সেনাপতি আব্-দুল্লা ও তদীয় সৈন্যগণ সকলেই রাজপুতগণের করাল অসি-মুখে নিপতিত হইলেন। সংবাদ দিবার জন্য একজনও জীবিত রহিল না। এই মহাসমরে রাজপুতদিগেরও অনেক সেনাপতি নিহত হইলেন। সেই স্বজাতিপ্রেমিক জাতীয় কার্য্যে উৎসৃষ্ট-প্রাণ মহাপুরুষগণের* নাম ও কীর্ত্তি ভারতবক্ষে রুধিরাক্ষরে অনন্তকালের জন্য লিখিত হইল! এই বিজয়ই রাজপুতদিগের সর্ব্বনাশের মূল হইল। তাঁহারা বিজয়দর্পে প্রমত্ত হইয়া সমস্ত মিবাররাজ্যে আনন্দোৎসব করিলেন। মিবারের সমস্ত দুর্গের উপর সুবর্ণসূর্য্যমণ্ডল-পরিশোভিত লোহিত পতাকা স্ফীত বক্ষে উড়িতে লাগিল। যে মিবার তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে জর্জ্জরিত, অসির উপর অসির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া আসিতেছিল, আজ সেই মিবার মহতী মোগলসেনার উপর দুই বৎসরের মধ্যে উপর্য্যু-পরি দুইবার জয় লাভ করিয়াছে—রণপুর গিরিসঙ্কটে সেনা-পতি সহ সমস্ত মোগল-সৈন্যকে বলি দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অত্যা-চারের প্রতিশোধ লইয়াছে; আজ মিবারের প্রকৃত উৎসবের দিন; সুতরাং মিবারবাসীরা উৎসবে প্রমত্ত হইবে না কেন? রাজপুতগণ! তোমরা উৎসব কর তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এখনও যে মোগল শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যতক্ষণ সেই মোগল শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততক্ষণ দুই একটী মোগল সেনাকে পরাজিত ও হত করিলে কি হইবে? বশিষ্ঠের কামধেনুর

* ইহাঁদের মধ্যে দেবগড়ের সঙ্গাবত-বংশধর দাহু, নারায়ণ দাস, সূরজমল, আশাকরণ—এই কয়জন সম্ভ্রান্ত সিসোদীয়; শুক্তাবতংস পুরু; রাঠোর-বংশীয় হরিদাস; ঝালরবংশীয় ভূপৎ; কচ্ছবংশীয় কহীর দাস; চোহান-বংশীয় কৃষ্ণদাস; রাঠোর-বংশীয় মুকুন্দদাস; জয়মল্ল-বংশীয় জয়মল্ট—এই কয়জন প্রধান।

মুখ হইতে যেমন অনন্ত অনীকিনী বিনির্গত হইয়াছিল, সেই-রূপ এই মোগল-শক্তিরূপ-কামধেনু হইতে অনন্ত সেনা নির্গত হইতে থাকিবে। তোমরা একটী সেনাকে নির্ম্মূল করিবে, অমনি শত শত সেনা সে মুখ হইতে উদ্গীরিত হইবে। তাহার কি ভাবিতেছ? দ্বারে শত্রু দণ্ডায়মান, এখনও কি উন্মত্তের ন্যায় উৎসবে প্রমত্ত থাকিবে?

অমরসিংহ! তুমি বহু আয়াসে ও বহু রক্তব্যয়ে যে চিতোর পুনরধিকৃত করিয়াছিলে, ঐ দেখ জাহাঁগীর সেই চিতোর আবার দখল করিয়া লইয়া পিতৃপুরুষগণের সেই অপূর্ব্ব রাজধানীতে তদীয় খুল্লতাত আশ্রিত সুগ্রকে মিবা-রের অধীশ্বর করিয়া পাঠাইলেন। সুগ্র প্রতাপের আধি-পত্য সহিতে না পারিয়া আক্‌বরের শরণাগত হইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি দিল্লীর রাজসভার একজন সদস্যরূপে কাল-যাপন করিতেছিলেন। জাহাঁগীর পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যাহা বলে পারিলেন না, তাহা কৌশলে সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই পুণ্যপুঞ্জময় হলদীঘাট-রণ-ক্ষেত্রে তিনি রাজপুতগণের বীর্য্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। প্রতাপের করাল অস্ত্রমুখ হইতে তিনি কেবল দৈববলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যদিও সেই মহারণে বিজয়লক্ষ্মী তদঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এ ক্ষত্রিয় তেজ সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই ভাবিয়া তিনি বল পরিত্যাগ করিয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন। আশ্রিত ও শরণাগত সুগ্রকে চিতোরের সিংহাসনে বসা-ইলে যদি সমস্ত মিবারবাসী প্রতাপ-তনয় অমরকে পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রের অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে বিনা রক্ত-পাতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি স্বহস্তে সুগ্রকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া সসৈন্যে চিতোর নগরীতে প্রেরণ করিলেন। সুগ্র মোগলসৈন্য-পরিরক্ষিত

হইয়া চিতোরনগরীর ধ্বংসের উপর রাজত্ব করিতে আসি-লেন। কিন্তু জাহাঁগীরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কেহই সেই ক্ষত্রিয়াধমের অধীনতা স্বীকার করিল না। কেহই সেই উদয়-সিংহ-তনয়কে রাজসম্মান প্রদান করিল না। ইহা অপেক্ষা মিবারের রাজপুতগণের অধিকতর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? মিবারের প্রজাবৃন্দ যে প্রতাপের নামে মুগ্ধ! প্রতাপ যে প্রত্যেক মিবারবাসীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! মিবারের প্রত্যেক স্থান যে প্রতাপের কীর্ত্তিকলাপে পূত হইয়া রহিয়াছে! মিবারবাসীরা সুতরাং কোন্ প্রাণে আজ প্রতাপ-তনয় অমরকে পরিত্যাগ করিয়া যবনের ক্রীতদাস সুগ্রের অধীনতা স্বীকার করিবে?

আজ পতিতে পতিতে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! যে প্রতাপ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রিয়,—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিয়া অনাহারে ও অনিদ্রায় কাল-যাপন করিয়াছিলেন, আজ সেই প্রতাপের সহোদর সুগ্র যবনের আশ্রিত দাস হইয়া শত শত স্বাধীন রাজার রাজধানী চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন। আর যে চিতোর একদিন অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, যে চিতোরের অনন্ত মন্দিরশ্রেণী ও অপূর্ব্ব সৌধমালা একদিন গগণতল আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, সেই চিতোর আজ শ্রীভ্রষ্ট ও প্রস্তর-স্তূপে পরিণত! যে চিতোর অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর স্থাপিত হইয়াও শত্রুগণের অলঙ্ঘ্য হইবার জন্য পঞ্চক্রোশী গগণস্পর্শী প্রাকারে পরিবেষ্টিত, যে চিতোরে প্রবেশ করি-বার গিরিগাত্রবাহী চতুর্দ্বারপরিরক্ষিত একটী মাত্র পথ, যে চিতোরে প্রবেশ করিতে একদিন যমও ভয় পাইতেন, সেই চিতোর আজ ব্যাঘ্রাদিরও অধিগম্য হইয়াছে! ঐ দেখ! ইহার শত শত ভগ্ন মন্দিরের চূড়ায় পক্ষিগণ কুলায়

নির্ম্মাণ করিয়াছে! ঐ শুন! ইহার এক লক্ষ প্রস্তরময় ভগ্ন প্রাসাদে সিংহ ব্যাঘ্রাদি গর্জ্জন করিতেছে!

এই ভীষণ স্থানে রাজত্ব করিতে আসিয়া সুগ্রের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! যে রাজধানী এক সময়ে জনাকীর্ণ ছিল, আজ তথায় মানবকণ্ঠধ্বনি প্রায় শ্রুত হয় না! সুগ্র ও তদীয় রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত মোগলসৈন্য ভিন্ন ইহার আর কোন অধিবাসী নাই—মরুভূমির নির্জ্জনতা ইহা অপেক্ষা অল্প ভয়ঙ্কর! এই ভীষণ হইতে ভীষণতর স্থানে সুগ্র মোগলশক্তি-পরিরক্ষিত হইয়া সাত বৎসরকাল এক অপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব রাজত্ব করিলেন। যদিও সুগ্রের হৃদয় প্রতাপ বা তদীয় পুত্রের প্রতি পাষাণসম ছিল, তথাপি তিনি প্রতি পাদবিক্ষেপে অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। চিতোরে এমন উপলখণ্ড নাই, যাহার উপর কোন না কোন রাজপুতবীর ইহার রক্ষার জন্য আত্মবলি দেন নাই! সেই উৎসৃষ্টপ্রাণ বীরবৃন্দের প্রেতময়ী মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের আত্মোৎসর্গের সেই সকল জ্বলন্ত কীর্ত্তিকলাপ তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাহার এই জঘন্য জাতীয় বিশ্বাসহনন-কার্য্যের জন্য তাঁহাকে লজ্জা দিত, ও তাঁহার এই অযোগ্যতার জন্য তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিত! একদিন চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাল-ভৈরব-মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিলেন যে "ওরে ক্ষত্রিয়াধম! তুই অবিলম্বে চিতোর-নগরী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর, নতুবা তুই এই জাতীয় বিশ্বাসহনন-পাপের জন্য অচিরাৎ শমন-সদনে প্রেরিত হইবি!" কালভৈরবের সেই ভীষণ উক্তিতে সুগ্রের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আর চিতোরে থাকিতে সাহস করিলেন না। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবিলম্বে ডাকিয়া পাঠা-

ইয়া তাঁহার হস্তে চিতোর সমর্পণ করিয়া নির্জ্জন পার্ব্বতীয় নগরী কান্ধারে* গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি দিল্লীতে গমন করিলে, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে অতিশয় তিরস্কার করেন। উদয়সিংহের পুত্র সূগ্রের ইহা অসহ্য হইল। তিনি নিজের অসি নিষ্কোশিত করিয়া সম্রাটের সম্মুখেই আত্মবক্ষে প্রোথিত করিলেন। এইরূপে তিনি স্বহস্তে জাতিবিদ্রোহিতা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই যন্ত্রণাময় জীবনের পর্য্যবসান করিলেন। আজ অবিচলিত স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের নিকট রাজশক্তি পরাজিত হইল!

অমরসিংহ সেই পিতৃব্য-পরিত্যক্তা পিতৃপৈতামহিকী রাজধানীর দখল লইলেন বটে, কিন্তু সেই ভগ্নপুরী পরিরক্ষণোপযোগী উপকরণ-সামগ্রীর অভাবে তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। চিতোর—গৌরবের চিতোর—করতলস্থ হইয়াও মিবারের রাজধানী হইতে পারিল না। অমরসিংহ কিছুদিন তথায় উৎসবে যাপিত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ নগরীসকল দখল করিবার জন্য নির্গত হইলেন। ক্রমে ক্রমে অশীতি-সংখ্যক-দুর্গ-রক্ষিত নগরী—তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল বা তদীয় বিজয়িনী সেনার অনিবার্য্য আক্রমণে বলগৃহীত হইল। এই সকল দুর্গরক্ষিত নগরীর মধ্যে অন্তল একটী ঘটনায় চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ইহা দখল করিবার সময় চন্দাবত ও শুক্তাবতবংশে প্রাধান্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। সেই ক্ষত্রিয়-সেনার অগ্রে স্থান পাইবার জন্য উভয়বংশই দাবীদার হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য কে অগ্রে প্রাণ দিবে—ইহা লইয়া আর কোন্ দেশে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া থাকে? স্বজাতি-

* এই নির্জ্জন প্রস্তরময় স্থান—পার্ব্বতী, চম্বল, ও রিন্থম্বর—নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত।

প্রেমের ও স্বদেশানুরাগের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায়? এই অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ আমরা স্বতন্ত্ররূপে বর্ণন করিব।

এই ভীষণ আক্রমণে শুক্তের সপ্তদশ বীরপুত্রের মধ্যে পাঁচ জন, ও চন্দাবতবংশের প্রধান প্রধান কয় জন, ও সেলুম্ব্রা-বংশের তিন জন বীর সমরশায়ী হন। সেই মহাপুরুষগণ স্বজাতির লুপ্ত-প্রায় গৌরব পুনরুদ্ধৃত করিয়া অমর-ভবনে গমন করিলেন। অন্তলদুর্গ-অমূল্য বীররুধিরের বিনিময়ে অধিকৃত হইল। এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গে চন্দাবত, ও শুক্তাবত, উভয়-বংশেরই মহিমা জগতে কীর্ত্তিত হইল! উভয় বংশে-রই চারণগণ উভয় বংশের যশঃ ঘোষণা করিতে লাগিল।

এই সকল উপর্য্যুপরি পরাজয়ে জাহাঁগীর নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি রাণাকে নিষ্পেশিত করিবার জন্য যুদ্ধের বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এবার তিনি স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া আজমীরে সৈন্যাবাস সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন হইল। রাণার পরাজয়-বিষয়ে এবার তিনি এত নিঃসন্দেহ হইলেন, যে আপনার থাকা আর আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি নিজ-পুত্র পর্ভেজকে সৈন্যাপত্যে বরণ করিয়া স্বয়ং রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় পুত্রকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়া গেলেন যে "যদি রাণা কি তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণ তোমার শিবিরে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদার উপযোগী অভ্যর্থনা করিবে, এবং তদীয় রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দের উপর কোন প্রকার উৎপাত করিবে না"।

এদিকে সিসোদীয়াধিপতি অমরসিংহ উপর্য্যুপরি বিজয়-লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগি-লেন। অধীনতা স্বীকারের চিন্তাও এক্ষণে তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি বিজয়োন্মাদিনী মহতী সেনা লইয়া খাম্নোর

গিরিপথে মোগল সেনার সম্মুখীন হইলেন। ভীষণ সমরানলে রণস্থল অগ্নিময় হইয়া উঠিল! রক্তস্রোতে গিরিপথ প্রচণ্ড নির্ঝরিণীর আকার ধারণ করিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই মহতী মোগল-সেনা প্রচণ্ড ঝটিকার সম্মুখে মেঘের ন্যায় যেন কোথায় উড়িয়া গেল। অধিকাংশই সেই সমরাঙ্গনে সমাধি-নিহিত হইল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আজমীরাভিমুখে পলায়ন করিল। মোগল ঐতিহাসিক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে খাম্‌নোরের যুদ্ধের দিন মিবারের সবিশেষ গৌরবের দিন। এই যুদ্ধ ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এই পরাজয় মোগলসেনার পক্ষে সম্পূর্ণ লজ্জাকর। কারণ মোগলসৈন্য সংখ্যায় অনন্ত, ও অস্ত্রশস্ত্রে সবিশেষ সুসজ্জিত ছিল; এবং ইহা মোগল সাম্রাজ্যের বিপুল সম্পত্তির অনুরূপ পরিচ্ছদ ও খাদ্য সামগ্রী দ্বারা সংযোজিত ছিল। তথাপি সেই মহতী মোগল-সেনা-বাহিনী সেই ক্ষুদ্র প্রচণ্ড রাজপুতবাহিনীর নিকট পরাস্ত হইল!

জাহাঁগীর তৎকালে লাহোরে ছিলেন। তিনি পুত্র পর্ভেজকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে—“তুমি নিজ পুত্রকে মহাবেৎ খাঁর অধিনায়কত্বে রাখিয়া স্বয়ং আমার শিবিরে চলিয়া আসিবে।” পার্ভেজ পিতৃ-আদেশ পালন করিলেন। তিনি মহাবেৎ খাঁর অধিনায়কত্বে নিজ পুত্র ও কতিপয় সামন্তকে রাণার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য রাখিয়া নিজে লাহোরাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবান্ হইতে পারেন নাই। তিনি রাণা কর্ত্তৃক রণে পরাস্ত ও হত হইলেন। কিন্তু এ রক্তবীজের বংশ নির্ম্মূল হইবার নহে। এক জন রক্তবীজের রক্তে শত শত রক্তবীজ উৎপন্ন হইতে লাগিল। একটী মোগল বিনষ্ট হইল, অমনি শত শত মোগল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। অমরসিংহ পিতার উপযুক্ত সন্তান। তাঁহা হইতে

পিতার কীর্ত্তি লোপ পায় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মোগলদিগের সঙ্গে সপ্তদশ বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রতি যুদ্ধেই জয়লক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিজয়-মুকুট তাঁহার বীরবৃন্দের রক্তে অভিষিঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে শেলসম হইয়া উঠিল। প্রতি রণক্ষেত্রেই মিবারের বীরচূড়ামণিগণ রণদেবীর নিকট বলি পড়িতে লাগিলেন। অমরসিংহ শূন্য কোষ পূর্ণ করিতে ও হত বীরবৃন্দের স্থানে নব বীরবৃন্দের সংযোজনা করিতে অবসর পাইলেন না। এ দিকে জাহাঁগীর পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সমস্ত মোগল শক্তি সমবেত করিয়া যোগ্যতম পুত্র যুবরাজ খুরম্‌কে মিবারাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। এই খুরম্‌ই ইতিহাসে সাজিহান্ নামে খ্যাত হইয়াছেন। জাহাঁগীরের পর ইনিই দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

আবার রাণা ও তদীয় বীর-পুত্র কর্ণ—মিবারের অধিত্যকা-প্রদেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু নিরন্তর রণে বীরভূমি মিবার বীর-শূন্যা হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সবিশেষ চেষ্টাতেও অতি অল্প-সংখ্যক মাত্র সৈন্য সংগৃহীত হইল। এই নগণ্য সৈন্য লইয়া রাণা বীর-পুত্র সহ সেই অগণ্য মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু বালির বাঁধ কয় দিন সাগরের বেগ ধারণ করিতে পারে? এত দিন যে বীরবৃন্দের সাহায্যে মিবারের বীরচূড়ামণি প্রতাপ ও তদীয় বীরপুত্র অমরসিংহ—মোগল শক্তিকে প্রতিহত করিয়া আসিতেছিলেন, আজ সেই বীরবৃন্দের অভাবে প্রতাপ-পুত্র অনন্ত-কীর্ত্তি অমরকে সেই মোগল শক্তির নিকট নত-শির হইতে হইল! হায়! যে সুবর্ণসূর্য্যমণ্ডল পরিশোভিত লোহিত ধ্বজা অষ্টশতাব্দীর অধিককাল সদর্পে মিবারের স্বাধীন গগনে উড্ডীয়মান হইয়া আসিতেছিল, আজ সেই মিবার-গৌরব লোহিত ধ্বজাকে জাহাঁগীর-পুত্রের নিকট

মস্তক অবনত করিতে হইল! এত দিনে হিন্দু স্বাধীনতা-সূর্য্য যবনরাহুগ্রস্ত হইয়া ভারতকে অনন্ত তিমিরে ভাসাইয়া গেল! হায়! সে সূর্য্য ভারত-গগণে আর উদিত হইল না। যে তামসী নিশি আজ আসিল, তাহা আর পোহাইল না! হায়! এতদিন হইল আজও পোহাইল না!!*

মহাপ্রাণ অমরসিংহ অধীনতায় রাজত্ব করা অপেক্ষা কুটীর-বাসী হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি নিজ পুত্র কর্ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নগরের অদূরে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মৃত্যুকালে পিতা যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, এতদিনে তিনি সেই উপদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। 'দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ ব্যতীত মিবারের স্বাধীনতা রক্ষা হইবে না'—আজ মিবারের স্বাধীনতা-রত্ন হারাইয়া অমরসিংহ পিতার মৃত্যুকালীন এই উপদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রতের ফল তিনি পাইলেন—কিন্তু মিবার পাইল না। দারিদ্র্যব্রতের মোহিনী শক্তিবলে তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষা হইল—কিন্তু ব্রত উপযুক্ত সময়ে আরম্ভ না করায়, মিবার সে ব্রতের ফলে বঞ্চিত হইল। আজ অমরসিংহ এই ব্রতের বলে আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তিনি প্রৌঢ়াবস্থায় পুত্রকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া স্বয়ং যতিবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলেন! ধন্য অমরসিংহ! ধন্য তোমার মহা-প্রাণতা! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ!

---

* ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহ মোগল সৈন্যের নিকট পরাস্ত হন, এবং যুবরাজ খুরমের প্রস্তাবিত সন্ধিতে সম্মত হন।
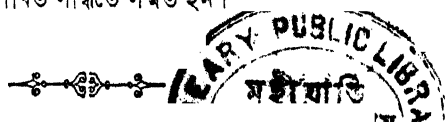
সম্পূর্ণ।

মিলসম্বন্ধে সম্পাদকগণের অভিমতি।

"আমাদের মানসিক বৃত্তিসকলের সম্যক্ অনুশীলন ও সংস্করণই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য। মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল—সুতরাং মিলের জীবন-চরিত মানুষের অদ্বিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিলের জীবনবৃত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত এবং তল্লাভের পথ নির্ব্বাচিত করি। কি পুণ্যাচরণ করিলে এই নবাবিষ্কৃত চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি। * *

"মনোবৃত্তিগুলি দ্বিবিধ—জ্ঞানার্জ্জনী এবং কার্য্যকারিণী। উভয়েরই সম্যক্ অনুশীলনে ও স্ফূর্ত্তি-প্রাপণে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যলোকে এমত অনেক দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের সমুদ্ভব হইয়াছে যে, সে সকল এই সুমহত্তত্ত্বের কাছে গিয়া দিশাহারা হইয়াছে। কেহ কেহ অর্দ্ধেক পাইয়াছে—অর্দ্ধেক পায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক, জ্ঞানেই মোক্ষ স্থির করিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির দমনই উপদিষ্ট করিয়াছেন—এজন্য প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্র মনুষ্যত্বসাধক হয় নাই। আবার পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যত্বের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মও মনুষ্যত্বসাধক হইতে পারে না। আমরা সর্ব্বপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথা বলিব। সেই অনুশীলনের দুইটী উদ্দেশ্য ও ফল—প্রথম, জ্ঞানের অর্জ্জন; দ্বিতীয়, বৃত্তিগুলির পরিপোষণ ও শক্তি-বৃদ্ধি। * * *

মিলের অকালপাণ্ডিত্যের ইতিহাস আজি কালি সকলেই জানেন, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদিগের অনুরোধ—যাঁহারা সে বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত মিলের জীবনবৃত্ত হইতে অধীত করেন। দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষাপূর্ণ।

"তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা। গুরুদত্ত শিক্ষা বীজমাত্র—আত্মশিক্ষাই সকল মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান ভাগ—কাণ্ড ও শাখাপল্লব। মিলের সেই আত্মশিক্ষার বিষয় মূলগ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া অবগত হইতে হইবে। আত্মশিক্ষার অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমরা যাহাদিগের সর্ব্বদা সহবাস করি, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, উপদেশ, তাহাদিগের কথা ও মানসিক গতি, ইহার দ্বারা আমরা সর্ব্বদা আকৃষ্ট, শিক্ষিত ও পরিবর্ত্তিত হই। মিলের জীবনীতে তাঁহার বন্ধুবর্গের সংসর্গের ফল অতি সুস্পষ্ট—জেম্‌স মিলকে ছাড়িয়া দিয়া, বেন্থাম, অষ্টিনদ্বয়, রোবক্ কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা, তাহার অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্ব্বোপরি যিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষে পত্নী, সেই অদ্বিতীয়া রমণীপ্রদত্ত শিক্ষা অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; এবং অতিশয় মনোহর। আমার ইচ্ছা করে, এই টুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহিণীগণের হস্তে সমর্পিত হয়—তাঁহারা দেখুন, কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতির আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা, সে ভাল—কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ, সে আরও ভাল।

"জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনের কথা-সম্বন্ধে মিলের জীবনবৃত্ত অধিকতর সুশিক্ষার আধার। * * * আমরা এই খানে মিলের কথা সমাপন করিব। ভিতরে প্রবেশ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। সেই গ্রন্থের গুণ-দোষ-সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলিব—উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার পর আধিক্য নিষ্প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির দুর্ল্লভ শিক্ষার স্থল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। তার পর, তাহার সঙ্কলন, গ্রন্থন ও বিচারপ্রণালীও প্রশংসনীয়। প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অনুবাদ নহে। মিলের জীবনবৃত্তে যে সকল দুরালোচ্য বিষয়

বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, যোগেন্দ্র বাবু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন, এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। অবতরণিকাটি আদ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচনা করি; এবং ইহা হইতে যুবকগণ শিক্ষালাভ করুক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি।"
[বঙ্গদর্শন; আশ্বিন ও পৌষ, ১২৮৪। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)]

"গ্রন্থখানি মিলের "আত্ম-জীবনবৃত্ত" হইতে সংগৃহীত বা অনুবাদিত বলিলেও হয়, কিন্তু অনুবাদ বলিয়া ইহা মৌলিকতা-শূন্য নহে। ইহার অনেক স্থলে গ্রন্থকারের বহু দর্শন, বহু অধ্যয়ন ও বহু বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষাও সুন্দর হইয়াছে। **

"বঙ্গভাষায় এরূপ জীবনবৃত্ত-প্রকাশের এই একপ্রকার প্রথম উদ্যম এবং এই উদ্যম যে সফল হইয়াছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা আধুনিক রাশীকৃত কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের বিনিময়ে এরূপ এক খানি পুস্তক দেখিতে অন্তরের সহিত অভিলাষ করিয়া থাকি। বাস্তবিক এইরূপ পুস্তকই বঙ্গভাষার সাহায্য ও অলঙ্কার; এবং সংখ্যায় যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল। আমরা আশা করি যে, সাধারণের মধ্যে ইহার পাঠক-সংখ্যা অল্প হইলেও, শিক্ষিতমণ্ডলী ইহার সমাদর করিতে ত্রুটি করিবেন না।"

[ভারত-সংস্কারক; ১২৮৪ সাল।]

OPINIONS OF THE PRESS.

Hindoo Patriot,—January 27, 1879.

We acknowledge with thanks the receipt of John Stuart Mill's Life in Bengali by Babu Jogendra Nath Bandyopadhyaya, M. A. It not only gives a sketch of the Life and career of the great philosopher, but also of his views and theories on political economy, psychology, sociology and

the science of government. It is written in a classic style, and breathes a spirit of thoughtfulness not ordinarily met with among Bengali authors. We have much pleasure in commending it to our reading public.

Bengalee— April 17th, 1880.

Babu Jogendra Nath Bandyopadhyaya, Vidyabhushan M. A., has done a service to his countrymen by publishing a Biographical Account of Joseph Mazzini, the great apostle of Italian unity. The book is written in Bengali, and will commend itself to those who desire to see their native-literature enriched. If there was any man whose character can stand forth as the model for imitation, it is that of Joseph MAZZINI, who lived and died for his fatherland and fought its battles, undaunted by the terrors of the prison, the poniard of the assassin, and the sword of the executioner. The life of such a man, in whatever language it is told, will always be read with the deepest interest. ** * * * * * * One cannot contemplate that change without feeling the utmost reverence for the life and character of Joseph MAZZINI. Nothing is, therefore, to be so much desired as that a people striving to better their political condition should study the life of Joseph MAZZINI, a life at once so instructive and interesting. Looking at the book before us from this point of view. we cannot speak too highly of its importance and usefulness. Regarding its literary merits, we do not presume to say more than that it is written in a pure, chaste and eloquent style, quite worthy of its subject, and that it deserves a very high place among the Vernacular works of the country. We hope the work will be introduced as a text book in our schools.

The Indian Mirror, Friday, April 30, 1880.

THE LIFE OF JOSEPH MAZZINI, Part 1,

(By Jogendra Nath Banerjee, Vidyabhusn, M. A.)

THE LIFE OF JOSEPH MAZZINI of Genoa, who, prompted by an enthusiastic love of liberty, gave up his legal profession, for a political and patriotic life, presents several important features which can be studied with great advantage by the Bengalis of present generation. Babu

Jogendra Nath Vidyabhusan deserves credit for writing in the Bengali language a detailed account of the life and doings of that Italian celebrity, and placing it before the educated Bengalis. Though there are several points in the Life of Mazzini, of which it should be the paramount duty of the natives of India to steer clear, the manliness, the spirit, the maddening passion for doing good to his country, the zeal displayed in carrying out his professions into pratice, the clamness of mind shown under the most trying circumstances and other virtues which he possessed in so eminent a degree, can safely be imitated by such of the Indian races as are wanting in unity, in thought and action, and in the religious veneration for their mother land, which characterised the feelings of their fore-fathers. The best way to instil an idea of patriotism into the minds of the Bengalis is by bringing them into close contact with the biographies of celebrated patriots, and not by pestering the country with the perpetual, meaningless cries of Bharat joy which have become the watch-word of a certain portion of the Native community.

Patriotism and love of unity—moral qualities that depend on one another for their growth and developemnt —are we believe, the chief points which the author is anxious to impress upon the minds of his readers. The language in which the work is written, is Bengali "pure and undefiled," and does credit not only to the taste and education of the author, but to his strong sence of attachment to his mother-language, which he has spared no pains to render acceptable by the clearness and elegance of his diction and by the noblenes of his sentiments.

HRIDAYOCHCHVAS (হৃদয়োচ্ছ্বাস); or Papers on India. By Jogendra Nath Bandopadhyaya, Vidyabhushan, M. A. Compiled by Mahendranath Roy. The nine papers, embodied in the work before us, were originally published by their writer in the columns of the Aryadarsan of which he is the editor. These have now been published as a separate work, partly to give them a permanent stability, and partly to pervent plagiarists from appropriating and using them, as has already been done with some of these papers, as their own. The papers are all on the present and past condition of India and cognate subjects and have been, for the most part, written with marked

ability and with an eye to effect, and though there is much in them with which we may not be prepared to be at one, the fact cannot be denied that they are characterised by a good deal of thoughtfulness, researching powers, and above all, unflinching patriotism.—Indian Mirror April 21, 1881.

আর্য্যদর্শন-সম্পাদক-প্রণীত—হৃদয়োচ্ছ্বাস ১৲

"এখন এক রকম ব্যবসাদার দেশভক্তের দল হইয়াছেন ; যোগেন্দ্র বাবুর দেশ ভক্তি সেরূপ ধার করা ধন নহে । তাঁহার দেশ-ভক্তির হৃদয়-ভাণ্ডার যেরূপ বিশাল ও বিস্তৃত, তাঁহার উচ্ছ্বাস-রত্নও তেমনি অমূল্য ও অফুরন্ত ।

"হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রবাহিনীতে দেশভক্তির তিনটী বিশেষ লক্ষণ আছে। ইহার উদারতা, প্রগাঢ়তা এবং নির্ভীকতা। সামাজিক নিয়মে, নীতি-শাস্ত্রে, ধর্ম্মশাসনে, ব্যবহার ব্যবস্থায়—প্রাচীন ভারতের সকল বিষয়েই উদারতা। যিনি সেই প্রাচীন ভারত ভাল বাসেন—তাঁহার ভালবাসা-ও কাজে কাজেই সেইরূপ উদার প্রকৃতির। আর যোগেন্দ্র বাবুর ভক্তি, বালিকার ভালবাসার মত লীলাখেলার ভাব নহে। প্রবীণার প্রণয়ের মত এই দেশভক্তি প্রগাঢ় ; তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্র, মনের গূঢ় নেপথ্য এবং জীবনের অবলম্বন—এইরূপ উদার এবং প্রগাঢ় বলি-য়াই যোগেন্দ্র বাবুর হৃদয়োচ্ছ্বাসের এত নির্ভীকতা। এই দেশভক্তি বঙ্গ কবির ন্যায় উঠিতে উঠিতে—'ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর ?' বলিয়া ফিরিয়া আসে না—ইহা আপনার বেদীপীঠ চিনিয়া লইয়াছে, সেইখানেই নির্ভয়ে বিচরণ করে—একদিকে যেমন আস্ফালন নাই, অন্যদিকে তেমনই লুকাইতেও জানে না। হৃদয়োচ্ছ্বাসের দেশ-ভক্তি সাগরসমীপ-গতা গঙ্গার মত বিস্তৃতা, গভীরা, অবাধ-ধাবিতা। এই বাহিনীমুখে অদূরে যে কুআশাময় স্থান দেখা যাইতেছে—উহা কি কেবল বালুকাস্তূপ, ভক্তিগঙ্গার গতিরোধ করিতে আসিতেছে ? না যাঁহার কটাক্ষে ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তান নষ্ট হয়, সেই কপিলদেবের পুণ্যাশ্রম ? কে ইহার উত্তর দিবে ?"

সাধারণী—১৪ই ভাদ্র, ১২৮৮ সাল।